রবীন্দ্রমানসের উৎস সন্ধানে

শচীন্দ্রনাথ অধিকারী

পরিবেশক—
আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৫নং চিন্তামনি দাস লেন,
কলিকাতা—৯

উৎসর্গ

স্বর্গগতা মাতৃদেবীকে

পরিবেশকের নিবেদন

রবীন্দ্রমানসের উৎস তাঁর গভীর মানবতাবাদ। রবীন্দ্রকাব্য ও সাহিত্যের বিভিন্ন তত্ত্ব, দর্শন ও ব্যাখ্যা আলোচনায় শুধু বাংলাভাষায় নয় পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাতেও বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু গভীর মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের প্রকৃত পরিচয়, অর্থাৎ তাঁহার অলোকসামান্য প্রতিভার মূল উৎস আজও জনসাধারণের অজ্ঞাত। লেখক শ্রীশচীন্দ্রনাথ অধিকারী তাঁর পূর্ব-প্রকাশিত তিনখানা গ্রন্থে এই সম্বন্ধে নিজের দেখা ও সুদূর পল্লীঅঞ্চলে বিক্ষিপ্ত বহু অজ্ঞাত তথ্য জনসাধারণের নিকট পরিবেশন করেছেন, এবং তাঁর লিখিত সত্যকাহিনীগুলি যে রবীন্দ্রসাহিত্যানুরাগী জনসাধারণের কাছে বিশেষ সমাদৃত হয়েছে, তাঁর গ্রন্থ ক'খানার পরপর কয়েকটি সংস্করণেই প্রমাণিত। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সাময়িক পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত লেখকের ইতস্তত বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধ ও কাহিনীগুলি সংকলনে আমাদের এই প্রচেষ্টা রবীন্দ্রচর্চায় যথেষ্ট আলোকপাত করবে আশা করা যায়। রবীন্দ্রজীবনীর নূতন উপকরণ হিসাবেও এই সত্যকাহিনীগুলি যথেষ্ট মূল্যবান।

এই রচনাগুলি আনন্দবাজার পত্রিকা, দেশ, মাসিক ও দৈনিক বসুমতী, শিক্ষাব্রতী, শিশুসাথী, দীপিকা প্রভৃতি পত্রিকায় ও লেখকের "সেকালের রবীন্দ্রতীর্থ" পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছিল। গ্রন্থাকারে প্রকাশের অনুমতির জন্য উক্ত পত্রপত্রিকাদির কর্তৃপক্ষকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

রচনাগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পত্রিকায় লিখ্‌বার জন্য মাঝে মাঝে পুনরুক্তি দোষ ঘটেছে। আশা করি সে ত্রুটি রসগ্রহণে বাধা হবে না।

কথা সূচী

"দুঃখ সুখ দিবস রজনী
মন্দ্রিত করিয়া তোলে জীবনের মহামন্ত্রধ্বনি।
শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ-পরে
—ওরা কাজ করে।"

ফিরে চল মাটির টানে

পল্লী সংগঠনের প্রথম পর্ব

আজ থেকে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। তখন আমার বয়স তেরো চৌদ্দর বেশী হবে না। উনিশ শ সাত কি আট খ্রীষ্টাব্দে, যখন আমাদের দেশে "পল্লীসংগঠন" কথাটার স্থান শুধু অভিধানের মধ্যেই ছিল এবং শিক্ষিত মহলে ঐ বিষয়টা একটা কথার কথামাত্র ছিল, সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ নিজস্ব সুচিন্তিত প্রণালীতে নিজের জমিদারীতে পল্লীসংগঠনের কাজে হাত দিয়েছিলেন। আমি যতদূর অনুসন্ধান করেছি, তা থেকে মনে হয় শিলাইদহে আমাদের মত কিশোরদের নিয়ে তাঁর প্রথম পল্লীসংগঠনের পরীক্ষার আরম্ভ ১৯০৭ কি ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে। এই প্রচেষ্টার পর ১৯১৫ সালে তাঁর কালীগ্রাম জমিদারীতে যে বিরাট প্রচেষ্টা সেটা এর দ্বিতীয় পর্ব।* তার পূর্বে ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ ও বাঙালীর স্বদেশী আন্দোলন সফল করবার জন্য শিলাইদহে বিরাট আকারে একটা সংগঠনের প্রণালীবদ্ধ আয়োজন করেছিলেন। তার প্রধান অঙ্গ ছিল গ্রামে গ্রামে তাঁতের প্রচলন ও কাপড় ইত্যাদি বোনা, শরীর চর্চা, স্বদেশী মেলায় পল্লীশিল্পের বিরাট আয়োজন ইত্যাদি। এইভাবে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা দানা বেঁধে উঠলো কয়েক বছর পরে সুচিন্তিত প্রণালীবদ্ধভাবে শ্রীনিকেতনে ১৯২২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে। তাঁর এই প্রচেষ্টার একটা ধারাবাহিক ইতিহাস তৈরী করা যেতে পারে। যাই হোক—তাঁর এই কর্মযজ্ঞের অঙ্কুর তিনি রোপণ করেন শিলাইদহে ১৯০৭ কি ১৯০৮ সালে।

১৮৯০ সালে তিনি মহর্ষিদেবের আদেশ ও উপদেশে পৈত্রিক জমিদারী পরিদর্শনের ভার গ্রহণ করেন। তাই সেই সময় থেকে তাঁকে বাংলার বহু পল্লীতে ভ্রমণ করতে হয়েছিল পল্লীবাসীদের সত্যিকার সুখদুঃখের সাথে মিশতে হয়ে-

*এ সম্বন্ধে যাঁরা আগ্রহশীল তাঁরা ১৩৪৮ সালের আশ্বিন সংখ্যা এবং পরবর্তী কয়েক সংখ্যায় "শনিবারের চিঠিতে" (রবীন্দ্রজীবনীর নূতন উপকরণ) খানিকটা বিবরণ পাবেন। এই কর্মযজ্ঞের নেতা ছিলেন শ্রীঅতুল সেন আর তাঁর সহকারী শ্রীউপেন্দ্র ভদ্র ও বিশ্বেশ্বর বসু প্রভৃতি। পাবনা প্রাদেশিক সম্মিলনীর সভাপতির ভাষণ (১৯০৮) ও 'স্বদেশী-সমাজ' বক্তৃতার বাস্তব রূপায়নের এইগুলিই প্রথম প্রচেষ্টা মনে হয়। ক্রমশ তাঁর কলমের সঙ্গে কাজের প্রসারলাভ করে এবং শ্রীনিকেতনের জন্ম হয়। পল্লী ও সমাজ-সংগঠনের বহু মূল্যবান প্রবন্ধ পরে প্রকাশিত হয়।

ছিল। তখন তাঁর বয়স প্রায় ত্রিশ। তাঁর কবিসুলভ কল্পনা ও প্রতিভা সেই সময় থেকেই বাংলার মৃতপ্রায় পল্লীগুলিকে নতুন করে গড়ে তুলবার জন্যে নানা পথের সন্ধান করছিল; নিজের জমিদারীর মধ্যে পল্লীস্বরাজ প্রতিষ্ঠার নানা পরীক্ষানিরীক্ষার আয়োজন করেছিলেন। কবিতা ও প্রবন্ধে দেশবাসীদের এ বিষয়ে সজাগ করতে না পেরে নিজের সাধ্যমত গ্রামীণ বাংলার নূতন প্রাণশক্তি জাগ্রত করবার জন্য "এবার ফিরাও মোরে" কবিতাকে বাস্তব রূপায়নের এইটিই প্রথম প্রচেষ্টা। রবীন্দ্রনাথের যে জীবনচরিত প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে সেই সমস্ত জ্ঞাতব্য বিবরণ পাওয়া যায় না। ১৯০৭ সালে তিনি শিলাইদহে আমাদের মত কিশোরদের নিয়ে পল্লীসংগঠনের যে কর্মধারা প্রবর্তনের প্রয়াস করেছিলেন, সেই কথাটাই আজ বলব। শিলাইদহের সেই কিশোর ব্রতী বালকদলে আমি নিজে এই কাজে হাতেখড়ি দিয়েছিলাম।

আমরা তখন শিলাইদহের মাইনর ইস্কুলে পড়তাম। রবীন্দ্রনাথ আমাদের গ্রামের জমিদার। তাঁকে ভয় ও সম্ভ্রম মিশ্রিত দৃষ্টিতে দেখতাম। জমিদার বলে তাঁকে ভয় করতাম খুব আবার মাঝে মাঝে তাঁর সাথে মিশবার সুযোগও খুঁজতাম।

তাঁর বজরা তখন প্রায়ই আমাদের 'হানিফ চাচার' ঘাটে বাঁধা থাকতো। আমরা বোটের কাছাকাছি নদীর তীরে ছোট্ট চরে হাডু-ডু খেলতাম, কিন্তু তিনি আমাদের খেলা দেখতে বোট থেকে নামতেই আমরা ভয়ে পালিয়ে যেতাম। কোনদিন হঠাৎ ধরা পড়ে গেলে তাঁর সামনেই আমাদের হাডু-ডু খেলতে হত। এই সময় একদিন এক অসমসাহসিক ব্যাপারে আমরা তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম।

পদ্মায় তখন ভীষণ ভাঙন চলছে। আমরা একদিন কয়েকজন মিলে নৌকাভ্রমণে বেরিয়ে পড়লাম। প্রায় মাঝ গাঙে এসে পদ্মার ভীষণ স্রোতে নৌকা সামলানো অসম্ভব হল, এদিকে পিছন থেকে একখানা আড়াইতলা ষ্টীমার আমাদের এই অবস্থা দেখে হুইসিল্ দিতে আরম্ভ করলে আমরা প্রাণরক্ষার জন্য প্রাণপণে চিৎকার শুরু করলাম। হঠাৎ জলের ঘূর্ণীর মধ্যে প'ড়ে ঘুরতে ঘুরতে ভেঙেপড়া একটা বাঁশের ঝাড়ে আমাদের নৌকা আটকে গেল, যেন ভগবানের কৃপায় আমরা সে যাত্রায় বেঁচে গেলাম। ষ্টীমার পদ্মার জলে পাহাড়প্রমাণ ঢেউ তুলে পাশ দিয়ে চলে গেল। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বোটের ছাদে দাঁড়িয়ে আমাদের এই অসমসাহসিক কাণ্ড দেখে আমাদের উদ্ধারের জন্যে একখানা 'জালিবোট' বরকন্দাজদের দিয়ে পাঠিয়ে

দিলেন। আমরা বরকন্দাজ আসতে দেখে ঐ বিপদে ধরা পড়বার ভয়ে ঘাবড়িয়ে গেলাম। কোনমতে তীরে নেমে নিকটবর্তী আম-বাগানের মধ্যে এসে লুকিয়ে সবাই জঙ্গল ডিঙিয়ে প্রাণপণে পলায়ন ক'রে তাঁর দৃষ্টি এড়ালাম বটে, কিন্তু তিনি আমাদের বেশ চিনে রাখলেন।

আর একদিন ঐখানেই বোটের কাছে তাঁর কাছে ধরা পড়ে গেলাম, পলায়নের সুযোগ পেলাম না। তিনি হাসতে হাসতে আমাদের অনেক উপদেশ দিয়ে বললেন, "তোমরা তো সোজা ছেলে নও। ঐ মাঝপদ্মায় কী বিপদটা ঘটতো, বল তো। খবরদার, ঐরকম ছেলেখেলা আর কখনো করবে না। বরং আমার সঙ্গে একটা ভালো কাজে মন দাও দেখি। আমি তোমাদের মত একটা সাহসী ছেলের দল চাই—গ্রামের কাজের জন্যে। কাল তোমরা সবাই মিলে সকালে কুঠীবাড়িতে আমার সঙ্গে দেখা করবে। আমি তোমাদের নিয়ে একটা দল গড়বো।"

আমরা এমন নিমন্ত্রণ পেয়ে আনন্দে আটখানা। পরদিন যথাসময়ে বারো-চৌদ্দজন কুঠীবাড়িতে গিয়ে হাজির; আরো কয়েকখানা গ্রামের লোক ছিল সেখানে। একটা সভা হল। তিনি আমাদের নৌকাবিহারের নিন্দা করে আমাদের মনের মত একটা গ্রামোন্নতির কাজের প্রণালী বুঝিয়ে দিলেন। কী চমৎকার বলবার ভাষা, কী অপরূপ ভঙ্গি। আমরা ছেলেমানুষ, কতটুকুই বা বুঝি, আমরা মুগ্ধ হয়ে গেলাম, অপূর্ব উৎসাহ উদ্দীপনায় মন নেচে উঠলো, নতুন জীবনের সন্ধান পেয়ে গেলাম। আমরা পল্লীসেবার কাজ করব—এ একটা অদ্ভুত উদ্দীপনা!

তার পরের দিন আমাদের কাজ আরম্ভের দিন। সেদিনও আমাদের দলকে তিনি স্বয়ং আমাদের পল্লীসেবার কার্যপ্রণালী বুঝিয়ে দিলেন আর আমাদের অধ্যক্ষ করে দিলেন শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র রায় ও অনঙ্গমোহন চক্রবর্তীকে। তাঁরা দুজনেই ঠাকুর-জমিদারীর কর্মচারী ছিলেন.—গতানুগতিক জমিদারী-সেরেস্তার কূটনীতিজ্ঞ আমলা নন, প্রজা-সাধারণের কল্যাণকর অনেক কাজই তাঁদের কর্তব্যের অঙ্গ ছিল।

আমাদের সে-বয়সে রবীন্দ্রনাথের কর্মপ্রণালী ও পদ্ধতি ভালো রকম বুঝতে না পারলেও তাঁর কথাগুলোর মধ্যে এমন উৎসাহ উদ্যম ও নবজীবনের সন্ধান পেলাম যে আমরা বেশ স্বাভাবিকভাবে নতুন স্ফূর্তি নিয়ে এই কাজে মেতে উঠলাম। পল্লীর সেবা বললেই আজকাল 'ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো'র একটা বিকট দায়িত্বের কল্পনায় মনটা মুসড়ে পড়ে। আমাদের আদৌ সে রকম হল না। আমাদের ইস্কুলের সেকেন্ড মাস্টার ছিলেন শ্রীরাজেন্দ্রনাথ

বন্দ্যোপাধ্যায়; (ইনিও সেকালের শান্তিনিকেতনের একজন কর্মী ছিলেন); তাঁকে ডেকেও রবীন্দ্রনাথ ইস্কুলের ছেলেদের এই কাজে উৎসাহিত করবার জন্যে উপদেশ দিলেন।

আমাদের কর্ম-ধারা ছিল প্রধানত তিনটি :—(১) হাতে কলমে কৃষি শিক্ষা, (২) আদর্শ গ্রাম তৈরী, (৩) ব্রতী বালকদল গঠন।

প্রত্যহ ইস্কুল ছুটির পর আমাদের স্বেচ্ছাপ্রণোদিত একঘণ্টা করে কাজ করতে হত। শনি ও রবিবারে কাজ ছিল অবশ্যকরণীয় (Compulsory) বেলা ২টা থেকে ৬টা পর্যন্ত। খেলা শেষ হতে অনেকদিন সাতটা বেজে যেত।

আমাদের প্রথম কাজ ছিল শিলাইদহ কুঠীবাড়ির ফুলের বাগানে। গাছের যত্ন করা, গাছ বুনতে শেখা, জল দেওয়া, নিড়ানো. সার দেওয়া ইত্যাদি। আমাদের নাম লিখে প্রত্যেককে পাঁচটি করে গোলাপ গাছের ভার দেওয়া হয়েছিল। ফুলের গাছ বাদেও, কুঠীবাড়ির পাশের জমিতে, চিনেবাদাম, আলু, মটরশুঁটি, পেঁয়াজ, কপি ইত্যাদির যে বাগান ছিল তার পরিচর্যাও আমাদের হাতে কলমে করতে হত। আমরা সেখানে এবং আমাদের প্রত্যেকের বাড়িতে নানারকম তরিতরকারী উৎপন্ন করেছিলাম এবং এসব কাজে বেশ দক্ষ হয়ে উঠেছিলাম। বেশ মনে আছে, পুকুর থেকে বাঁকে করে গাছের জন্য জল তুলতে তুলতে ঘাড়ে ব্যথা হ'ত, কোদালে ক্ষেত কুপিয়ে হাতে ফোস্কা পড়ে যেত; কিন্তু আমরা মোটেই দুঃখিত হতাম না, বরং হাত ও ঘাড় শক্ত হবে ব'লে গর্ব প্রকাশ করতাম। গোবর, খইল আর পাতা পচিয়ে সার তৈরী করতে আমাদের প্রতিযোগিতা চলতো। শুকনো গোবর কুড়িয়ে কে কত বেশি গুঁড়ো করেছে তাই নিয়ে রীতিমত প্রতিযোগিতা চলতো এবং প্রাইজও পেতাম।

আমাদের দ্বিতীয় কাজ ছিল কুঠিবাড়ির পাশেই ছোট্ট একখানা গ্রামের (কোমরকাঁদি গ্রাম) সংস্কার করা। এর নাম ছিল "আদর্শ গ্রাম তৈরী।" আমরা কর্মী ছিলাম প্রায় চব্বিশজন, তার মধ্যে নিয়মিত কাজ করতাম ১৬জন। গ্রামখানিতে ছিল নিরক্ষর চাষীদের বাস। আমাদের প্রত্যেকের ভাগে পাঁচখানা করে গৃহস্থের বাড়ি দেওয়া হয়েছিল।

আমাদের কাজ ছিল, (১) ঐ বাড়িগুলোর বুড়োগুঁড়ো সবাইকে অ আ ক খ শেখানো আর কুঠীবাড়িতে স্থাপিত প্রাইমারী ইস্কুলে ঐসব বাড়ির ছেলেমেয়েদের পাঠানো, আর (২) তাদের জনস্বাস্থ্যের উন্নতির জন্য উপদেশ দেওয়া। তারা আমাদের উপদেশ না শুনলে নিজেরাই দা কোদাল কুড়ুল নিয়ে তাদের বাড়ির অগাছা জঙ্গল সাফ করতাম, সে জায়গা কুপিয়ে লঙ্কা বেগুন ইত্যাদি বোনার ব্যবস্থা করতাম। এতে তাদের

কর্মপ্রবণতা ও উৎসাহ বাড়তো। রবীন্দ্রনাথের উপদেশ ছিল “গ্রামের বুড়োরা হয়তো তোমাদের কথা শুনতে চাইবে না; তখন তোমরা নিজেরাই দা কোদাল নিয়ে তাদের কাজ করে দেবে। তাদের বাড়ির রোগীদের হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার জন্য কুঠিবাড়িতে নিয়ে আসবে, আর কঠিন রোগীদের সরকারী ডাক্তারখানায় পাঠাবার ব্যবস্থা করবে। খবরদার, ঝাড়-ফুঁ করাতে দেবে না। তাহলেই দেখবে, বুড়োরা তোমাদের মত শিশুকর্মীদের কথা নিশ্চয়ই শুনবে। তোমাদের কাছে তারা সত্যিকার ভালবাসা পাবে, আর তোমাদের মানবে না—এও কি কখনো হয়?” সত্যিই তাই, আমাদের প্রত্যেকের নির্দিষ্ট চাকলার বাড়ির মালিকেরা প্রথমে আমাদের ছেলেমানুষ বলে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করত, কিন্তু আমাদের সারল্য ও নিষ্ঠা দেখে তারা সত্যিসত্যিই আমাদের বেশ মান্য করত। শুধু তাই নয়, তারা সময়ে সময়ে যত্ন করে দুধচিড়ে দিয়ে সরের গুড় (টাটকা ফ্যানাওয়ালা গরম আখের গুড়) খাওয়াতো, ওই জিনিষটা আমরা বাড়িতে পেতাম না।

সে সময়ে শিলইদহে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পুণ্যনামে “মহর্ষি দাতব্য চিকিৎসালয়” রবীন্দ্রনাথই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। বহু অর্থব্যয়ে ঐ অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত এতবড় ডাক্তারখানা আর ছিল না। তা বাদেও শিলাইদহ কুঠি-বাড়িতে হোমিওপ্যাথি ঔষধ রেখে রবীন্দ্রনাথ নিজে বহু রোগীকে চিকিৎসা করতেন। তাঁর হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক চিকিৎসায় বিশেষ অভিজ্ঞতা ছিল। আমাদের আদর্শ পল্লীর রোগীদের জন্য রবীন্দ্রনাথ নিজেই ঔষধ দিতেন। কুইনিন্ না দিয়েও ম্যালেরিয়া সারে কিনা তা পরীক্ষা করবার জন্য তাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। আমাদের মধ্যে যেদিন যাদের ‘ডিউটী’ থাকতো, তারা রোগীদের শিশি পরিষ্কার করে তাতে ফিল্টার করা জল পুরে সারি সারি তাঁর সামনে রাখতে হত। তিনি রোগী পরীক্ষা করে নিজ হাতে ঔষধ দিতেন।

আমাদের তৃতীয় কাজ ছিল শরীর চর্চা। প্রত্যেক শনি রবিবারে আমরা নূতন ধরণের একটা খেলা খেলতাম—এটা শিখিয়েছিলেন ভূপেশবাবু। খেলাটা জাপানী যুযুৎসুর মত, খানিকটা যুদ্ধের কায়দায়, আবার খানিকটা হাডু-ডু খেলার মত। দু'দলের একদল হত রাশিয়া, আর এক দল জাপান। সেনাপতি, জেলখানা, বন্দী ইত্যাদি এবং আক্রমণের নিয়মকানুন, জয়পরাজয় ইত্যাদি ব্যাপার ভারী চমৎকার ও অভিনব। গ্রামের লোকরা হাঁ করে এই নতুন খেলা দেখতো আর আনন্দ পেতো। খেলাটা খুব আমোদের আর এর আকর্ষণও ছিল প্রচণ্ড। যে ছেলেরা নিয়মিত আসতো না, তারাও এই খেলার

জোডে নিয়মিত আসতে লাগলো। ক্রমে আমাদের ব্রতী বালকের দল বেশ পুষ্ট হয়ে উঠল।

আমরা আমাদের ইস্কুলে আমাদের সেকেণ্ড-মাস্টার শ্রীরাজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছেও অনেক জিনিষ শিখতাম, তার মধ্যে কবিতা আবৃত্তি ও অভিনয় প্রধান। রাজেনবাবুর ঋষির মত চেহারা, উন্নত শিক্ষাপ্রণালী, সস্নেহ ব্যবহার ও নিষ্ঠা আমাদের চরিত্রের উপর গভীর রেখাপাত করেছিল।

আমাদের ঐ তিনটি কাজের সঙ্গে অন্যান্য আয়োজনও ছিল, সেগুলো করতেন আমাদের অধ্যক্ষেরা, অনেকটা আমাদেরই সাহায্যে। সে কাজটা হচ্ছে গ্রামের বাসিন্দাদের একটা বিবরণ সংগ্রহ করা, প্রতেক বাড়ির মালিকের নাম, পরিবারসংখ্যা, জাতি, বয়স, স্ত্রীপুরুষ বালকবালিকাদের সংখ্যা, চাষের জমি, আয়ের উপায় ও পরিমাণ, গরু বাছুর মহিষের সংখ্যা, রোগের বিবরণ, জন্ম মৃত্যু ইত্যাদি বিবরণ আমরা সংগ্রহ করতাম; অধ্যক্ষেরা তাই লিখে পড়ে নিয়ে রবীন্দ্রনাথকে দেখাতেন। পরবর্তীকালে পল্লীসংগঠনের কাজে শ্রীনিকেতনে রবীন্দ্রনাথ যে বিধিবদ্ধ কর্মপ্রণালী অনুসরণ করতেন তার সঙ্গে আমাদেব এই পল্লীতথ্য সংগ্রহের আয়োজনের অনেকখানি মিল আছে।

প্রতি রবিবারে আমাদের ফলার হত কুঠীবাড়িতে। কলার পাতায়, চিড়ে-মুড়ি, নারকেলকোরা, কলা, পেঁপে, গুড়,—কোনদিন আবার দই আসতো তারণ ঘোষের বাড়ি থেকে। আমরা পুরস্কারও পেতাম,—দা, কোদাল নিড়ানী, ছুরি-কাঁচি। এগুলো বানিয়ে দিত আমাদের গাঁয়ের শ্যামা কামার।

মাঝে মাঝে মিটিং হত আমাদেব। গ্রামের ও পাড়ার ম্যাপ, বাংলা দেশের ম্যাপ, নদীনালার নক্সা,—এই সবের সাহায্যে অধ্যক্ষেরা আমাদের দেশের অনেক তথ্য শেখাতেন। রবীন্দ্রনাথ নানা কাজে নানা স্থানে ঘুরতে খুব ব্যস্ত থাকতেন, তবু সময় পেলেই নানা কথা, নানা বিচিত্র কাহিনীতে আমাদের উৎসাহিত করতেন। আমরা তাঁকে পেলেই নিজ নিজ ভাগের গোলাপ গাছের সেরা ফুলটি তাঁকে উপহার দিতাম, তিনি সেগুলো হাতে নিয়ে আবার আমাদেরই ফিরিয়ে দিতেন, সকলের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ ক'রে বলতেন, "এই ছেলেরা দুষ্টুমীও করতে জানে, আবার কাজও করতে পারে কেমন সুন্দর—দেখ অনঙ্গ।"

কী যে আমোদ, আনন্দ উৎসাহ নিয়ে আমরা নেমেছিলাম গ্রামের কাজে তা মনে হলে ভাবি, আমাদের ছেলেরা এখন কি শিখছে—? তোতাপাখির মত গতানুগতিক বই পড়া; আর আনন্দহীন কিশোরজীবন সারল্য ও নিষ্ঠাহীন চরিত্র,—এরা মানুষ হবে কেমন করে?

আমাদের বাড়িতে তরকারীর বাগান করতে হ'ত। এত গঠনমূলক কাজ করেও আমরা লেখাপড়ায় পেছিয়ে পড়তাম না। সবাই দল বেঁধে কাজ করবার মধ্যে যে কী একটা মহৎ প্রেরণা, অপার আনন্দ, নিষ্ঠা ও উৎসাহ ছিল—তাই ভাবি, আর সেই হারিয়ে যাওয়া সোনার দিনের অরুণ প্রভাতে যাঁর অদ্ভুত প্রেরণা পেয়েছিলাম, তাঁর সেই ভাস্বর আনন্দময় চেহারাখানা চোখের উপর ভেসে ওঠে। তখন রবীন্দ্রনাথ বিশ্বকবি, সারাবিশ্বের সম্মানের মুকুটে বিশ্বজয়ী হন নাই, তিনি ছিলেন, পল্লীর দরদী, পল্লীবাসী মানুষের কবি : এই অনগ্রসর দেশে আনলেন নবজীবনের প্রভাত। আমাদের কাছে তিনি সেদিনকার কবি ও জমিদার মাত্র। আমরাও মুখস্ত করতাম "পঞ্চনদীর তীবে,—বেণী পাকাইয়া শিরে" "কোশল নৃপতির তুলনা নাই" কবিতাগুলি।

আমাদের এই কর্মব্রত প্রায় একবৎসরের মধ্যেই বন্ধ হয়ে যায়। কোন একটা পরিকল্পনা দীর্ঘকাল চালাবার মত অবস্থা তখন রবীন্দ্রনাথের ছিল না। তাই এইসব মহৎ প্রচেষ্টার শুভ পরিণতি লক্ষ্য করা যেত না। এইসব দেশ ও সমাজ সংগঠনমূলক নিষ্ঠাপূর্ণ কর্মযজ্ঞের পুরোধা হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অবদান কতখানি গুরুত্বপূর্ণ সে বিষয়ে আজও আমাদের শিক্ষিত সমাজ অজ্ঞ। তাঁর বিশাল বিচিত্র সাহিত্যসৃষ্টির উৎসসন্ধানে কারও আগ্রহ দেখ্‌তে পাই না। মানুষ রবীন্দ্রনাথকে আজও আমরা চিন্‌তে পারি নাই। সস্তা "রবিয়ানার" উৎকট আভিজাত্য আর পাণ্ডিত্যপূর্ণ রবীন্দ্র-কাব্যবিলাসিতার হেঁয়ালী আজও জনসাধারণের দৃষ্টি আচ্ছন্ন করে রেখেছে। তাঁকে হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ না করে বুর্জোয়া শৌখীন্ ভাববিলাসী কবি বলে দূরে সরিয়ে রেখেছে। বড়লোকের রংমহলে নৃত্যগীতের জল্‌সায় সহরের কোলাহলেই আজ তাঁব দর্শন মেলে।

আমাদের আদর্শ ছিল পল্লীর সর্বাঙ্গীন সংগঠন। মনে করতাম কোমর কাঁদি গ্রামকে একটা 'আদর্শ গ্রামে' প্রতিষ্ঠা করবো : আমরাই পল্লীস্বরাজ আনবো। কুঠীবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমাদেবীর চেষ্টা, যত্নে ও পরিশ্রমে "প্রতিমা বালিকা বিদ্যালয়" নামে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল, বিদ্যালয়টি এখনও বেঁচে আছে। কোমরকাঁদির কালীবাড়ির খড়ের চালায় একটা বয়স্ক-শিক্ষা বিদ্যালয়ও বসতে থাকে, চাষীরা সেখানে রাত্রে পড়তে আসতো। আমাদের গ্রামের মাইনর ইস্কুলেও ঠাকুর জমিদারের কাছ থেকে বহু বৎসর মাসিক সাহায্য পেয়ে এসেছে।

আমরা এই ব্রতী বালক সংগঠনের অনেক বিষয়ে উপদেশ পেতাম কিন্তু অভিনয় করবার সুযোগ পেতাম না। যাত্রা আর গ্রামের থিয়েটারের অভিনয়

দেখে আমরা বড় ছুটির দিনে কোন পোড়ো বাড়িতে অভিনয় করতাম। গায়ে রঙিন জামা, মাথায় লাল সালু বেঁধে হাতে বাখারির তৈরী তলোয়ার নিয়ে সদর্পে আবৃত্তি করতাম—

"মারাঠা দস্যু আসিছেরে ঐ, কর কর সবে সাজ"

তীর ধনুক, গদা ইত্যাদি বানিয়ে 'কর্ণবধ' পালায় গলা ফাটিয়ে বক্তৃতা করতাম। যুদ্ধে কর্ণ মরে যাবে আর অর্জুন জিতবে, শেখানো ছিল, কিন্তু কর্ণ যুদ্ধ করতে করতে কিছুতেই হারতে চাইবে না—মাটিতে শুয়ে পড়বে না,—এই নিয়ে মহা ঝগড়া বেধে যেত। সে যে কী আনন্দ, এখন মনে হলে হাসি পায়।

আনন্দের, সংগঠনের, বলিষ্ঠ চিন্তার এই প্রেরণা আমরা পেয়েছিলাম সেই সোনার শৈশবে আমাদের কবি, আমাদের জমিদার, আমাদের বাবুমশাই রবীন্দ্রনাথের কাছেই।

জমিদারী পরিচালনা

রবীন্দ্রনাথ সহস্রচিত্ত মানুষ। সমালোচকগণ তাঁকে কবি, সাহিত্যিক, ঔপন্যাসিক, সমালোচক, সংস্কারক, দার্শনিক, শিক্ষাবিদ, সঙ্গীতবিদ, নাট্যকার, নট, চিত্রশিল্পী বক্তা, ঋষি ইত্যাদি বহু বিশিষ্ট বিশেষণে বিশেষিত করেছেন। কিন্তু সাধারণ মানুষের পর্যায়ে তাঁর স্থান কত উচ্চে তার পরিচয় কেউ দেন নাই। সাধারণ মানুষ থেকেই তিনি অসাধারণত্বে উপনীত হয়েছিলেন। জীবনব্যাপী কঠোর তপস্যা বলেই তিনি অসাধারণ হতে পেরেছিলেন. তাই সাধারণ জন-চিত্ততে উদ্বোধিত করে নানা কণ্ঠে নানা ইতিহাসে তাঁর অভয়বাণী শুনতে পাই—

> "ওরে ভীরু, ওরে মূঢ়, তোলো তোলো শির,
> আমি আছি, তুমি আছ, সত্য আছে স্থির।"

রবীন্দ্রনাথ দেশের জন্য এত অধিক অবদান রেখে গেলেও আজ পর্যন্তও তিনি জনচিত্তের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে আছেন কেন, তা ভাববার বিষয়। তিনি অলোকসামান্য হলেও এই বাঙলা দেশের মাটির সঙ্গে, বাঙালীর রক্তমাংসের সঙ্গে, নাড়ির সঙ্গে তাঁর অবিচ্ছেদ্য যোগ ছিল। তাঁর সাহিত্যে জীবনের গান বেজে উঠেছে নানাসুরে। তিনি যে মানুষের কবি, জগতের কবি—তার সত্য পরিচয়, গভীর রহস্য যে কত দুঃখমন্থনের ফল, তা আজও জনচিত্তে উদ্ঘাটিত হল না। তাঁর সাহিত্যের মধ্যে দুঃখজয়ের এই যে বাণী এর পরিচয়টি বড় সহজ নয়।

রবীন্দ্রনাথের জীবনব্যাপী সাধনার অনেক বাস্তব তথ্য তাঁর জীবনী-রচয়িতারা প্রমাণ-প্রয়োগ সহকারে পান নাই। এসব বিবরণের পাথুরে প্রমাণ পাওয়া দুর্ঘট; যা ছিল কাগজপত্রের মধ্যে তার অধিকাংশই আমাদেরই অবহেলায় কৈবল্যপ্রাপ্ত হয়েছে। লুপ্তপ্রায় কোন কোন কাগজপত্র ও স্থানীয় প্রত্যক্ষদর্শীর বিশ্বাসযোগ্য তথ্য থেকে সংগৃহীত তাঁর অখ্যাত জীবন-কাহিনীর কয়েকটি অধ্যায় বিবৃত করবার চেষ্টা করব।

১৯১৫ সালের কথা, রবীন্দ্রনাথের বয়স তখন ৫৫ বৎসর। সে বয়সেও তাঁর প্রৌঢ়ত্ব আসেনি, তখনও ছিল তাঁর উৎসাহ উদ্যমপূর্ণ যৌবন ও সৃষ্টিধর্মী মন। তখন থেকেই তাঁর "ভাব পেতে চায় রূপের মাঝারে অঙ্গ।"

একটা আদর্শ পল্লী সৃষ্টি তাঁর বহুকালের সাধ—এসব সাধ সেকালে কোনো জমিদারের মগজে আসতোই না। এই সময়েরও কিছুদিন পূর্বে শিলাইদহ জমিদারীর দক্ষিণে ইস্টার্ণ বেঙ্গল রেলওয়ে বা ই বি আর (তখন এই নাম ছিল) কুষ্টিয়ার নিকট গোরাই নদীর উপরে রেলওয়ে ব্রীজ তৈরীর ব্যবস্থা করেন। সেই সময়ে গোরাই নদীর শাখা কালীগঙ্গা (বা কালী নদী) ও তার পার্শ্ববর্তী মৌজা লাহিনী রবীন্দ্রনাথের জমিদারীভুক্ত। রেল কর্তৃপক্ষ কালীগঙ্গার বুকের উপর দিয়েই রাস্তা বেঁধে গোরাই নদীর প্রস্তাবিত ব্রীজ পর্যন্ত রেল লাইন চালাতে মতলব করলেন। রেল কোম্পানীর এই কার্যে রবীন্দ্রনাথ তীব্র প্রতিবাদ জানালেন সুদীর্ঘ লেখনী-চালনার মাধ্যমে।

কালীগঙ্গা গোরাই নদীর শাখা হিসাবে বহু গ্রামের বহু কৃষকের মনের আনন্দ ও ক্ষুধার খাদ্যের উৎস। রবীন্দ্রনাথ এই নদীর উপরে বাঁধ তৈরী না করে রেল লাইন অন্যদিক দিয়ে গোরাই নদীর কাছে নেবার জন্য পরামর্শ দিলেন, সে কাজে কিছু অর্থব্যয় হলেও একটি স্রোতস্বতীর অপমৃত্যু হত না। কিন্তু রেল কোম্পানী তাতেও রাজী হল না। শেষে রবীন্দ্র-নাথ গোরাই ব্রীজের মতো কালীগঙ্গাতেও আব একটি ব্রীজ তৈরী করে রেল চালানোর জন্য পরামর্শ দিলেন। রেল কোম্পানী খরচ বৃদ্ধির অজুহাতে রবীন্দ্রনাথের এই পরামর্শও গ্রহণ করলেন না। এ বিষয় নিয়ে শিলাইদহ কাছারীতে প্রকাণ্ড একটা ফাইল আমি দেখেছি; তার নাম ছিল 'গোরাই সেতু—কালীগঙ্গা' ফাইল। তার মধ্যে রবীন্দ্রনাথের ও রেল কোম্পানীর বহু ইংরাজী চিঠিপত্র, নক্সা ইত্যাদি ছিল। সে ফাইলটা অনেক-দিন হল নষ্ট হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ রেল কোম্পানীর এই ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হলেন কিন্তু কল্পনাপ্রবণ সৃষ্টিধর্মী মন বাধা পেলো না। তিনি নূতন পথের সন্ধান করতে লাগলেন।

যেখানে লাহিনী গ্রামে কালীগঙ্গাকে শৃঙ্খলিত করে রেল কোম্পানী বাঁধ বেঁধে ফেললো সেইখানে ৪০।৫০ বিঘা জমির উপরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরি-কল্পিত আদর্শ পল্লী রচনায় মনোযোগ দিলেন। শুধু তাই নয়, প্রস্তাবিত উপনিবেশের সঙ্গেই রেল লাইন ও নদীর ধারেই একটা বাজার বসিয়ে বিভিন্ন পল্লীর মধ্যে সংযোগ-স্থাপনের একটা প্ল্যান তৈরী করলেন এবং সে উদ্দেশ্যে পুনরায় রেল কোম্পানীর সঙ্গে বহু লেখালেখি করলেন যে, লাহিনীর ঐ জায়গায় একটি ছোট রেল স্টেশন তৈরী করা হোক। বাজারের উন্নতির সঙ্গে স্টেশনেরও ভবিষ্যৎ উন্নতির সম্ভাবনা কতখানি তাও লিখলেন। এদিকে রেল কর্তৃপক্ষ ব্রীজ এপ্রোচ স্টেশন হিসাবে গোরাই-এর অপর পারে চড়ুইখোল

মাঠের মধ্যে স্টেশন তৈরী করবার মতলব করে ফেলেছে। বহু পত্র বিনিময়ের পর রবীন্দ্রনাথের এই পরিকল্পনা ও প্রস্তাবও রেল কোম্পানী অগ্রাহ্য করে বসল। রবীন্দ্রনাথ বারবার তিনবার বিফলমনোরথ হলেন; কিন্তু নিজ সঙ্কল্পচ্যুত হলেন না। তাঁর শুভ সঙ্কল্পকে দৃঢ়ভাবে রূপায়িত করতে লাগলেন।

কালীগঙ্গা তীরবর্তী আদর্শ পল্লীর (লাহিনী) সার্ভে হয়ে নক্সা তৈরী হল। ইস্কুল, সমবায় ডাক্তারখানা, রাস্তাঘাট, পাড়া বিভাগ ইত্যাদি এবং বাজার নিয়ে একটা চমৎকার প্লান তৈরী হল এবং কিছু কাজও আরম্ভ হয়ে গেল। বসতি স্থাপনের জন্য গৃহস্থ, চাকুরে, চাষী, তাঁতী, কুমোর, কর্মকার, জেলে প্রভৃতির জন্য প্লট তৈরী হয়ে গেল। কিন্তু এই বিচ্ছিন্ন পল্লীর জন্য বাজার তৈরীর কাজই প্রথমে ধরা হল পরীক্ষামূলকভাবে।

এইবার তাঁকে আবার এক যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হল নলডাঙ্গার রাজার সঙ্গে। কুষ্ঠিয়া মোহিনী মিলের পশ্চিমে নলডাঙ্গা রাজার বহুদিনের সুবিখ্যাত "রাজারহাট" রবীন্দ্রনাথের সংকল্পিত লাহিনীর বাজারের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে, এই আশঙ্কায় নলডাঙ্গারাজ রবীন্দ্রনাথকে প্রতিবাদ জ্ঞাপন করলেন। আইনের বিধানে লাহিনীতে নূতন বাজার স্থাপনে কোন বাধা নাই এবং লাহিনীর সংকল্পিত বাজার সুবিখ্যাত "রাজারহাটের" কোন ক্ষতিই করবে না—এই কথা রবীন্দ্রনাথ জানালেন। কিন্তু নলডাঙ্গারাজ সে কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না; তাঁরা কুষ্টের তদানীন্তন ইউরোপীয়ান ম্যাজিস্ট্রেটের শরণাপন্ন হলেন। কুষ্টের ম্যাজিস্ট্রেট অপ্রকাশ্যভাবে নলডাঙ্গারাজের পক্ষাবলম্বন করলেন। এর ফলে ছোটখাটো গুটিকতক মামলাও হয়ে গেল। ঠাকুর জমিদার লাহিনীর বাজার বসাবার জন্য কয়েকখানা ঘরও তৈরী করে ফেললেন। রবীন্দ্রনাথ এই নবসংগঠনের ব্যাপারে পদে পদে সমস্ত দেখাশুনা করছেন।

বাধাবিঘ্ন উদ্বেগ যতই বাড়ছে রবীন্দ্রনাথ ততই তাঁর সঙ্কল্প দৃঢ়তর করছেন।

হঠাৎ এক গভীর রাত্রে ঠাকুর জমিদারের লাহিনীর বাজারে অগ্নিকাণ্ড ঘটে গেল। দুই প্রবল জমিদারের মধ্যে প্রবল রেষারেষি প্রবলতর হয়ে উঠলো। এই সংবাদ টেলিগ্রামে কলিকাতায় রবীন্দ্রনাথকে জানান হল। প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ টেলিগ্রামে ম্যানেজারকে জানালেন—তিনি ঐ দিনই আসছেন রাণাঘাট স্টেশনে যেন ম্যানেজার তাঁর সঙ্গে দেখা করেন। স্টেশনেই ম্যানেজার উত্তেজিত রবীন্দ্রনাথের আদেশ পেলেন ঐ অগ্নিদগ্ধ বাজারের ফটোগ্রাফ আনতে। রবীন্দ্রনাথ রাণাঘাটে অপেক্ষা করতে লাগলেন, ঐ রাত্রিতে বাজারের ফটোসহ

তিনি কৃষ্ণনগর চলে এলেন। তখন রবীন্দ্রনাথের আবাল্যবন্ধু লোকেন্দ্র পালিত মহাশয় কৃষ্ণনগরে ম্যাজিস্ট্রেট। রবীন্দ্রনাথ এই ব্যাপার কৃষ্ণনগরে গবর্ণমেণ্ট কর্তৃপক্ষকে জানালেন। কথিত আছে এই ব্যাপারে কুষ্টের ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বদলীর হুকুম টেলিগ্রামে জানান হয়েছিল। (সত্য মিথ্যা জানা কঠিন)।

রবীন্দ্রনাথ পরদিনই লাহিনীতে এসে অগ্নিদগ্ধ বাজার দেখে খুব মর্মাহত হলেন। বাজারের সঙ্কল্প তাঁকে পরিত্যাগ করতে হল। কিন্তু অন্য ব্যাপার নিয়ে নলডাঙ্গার রাজার সঙ্গে ঠাকুর জমিদারের দীর্ঘকালব্যাপী মোকদ্দমা আরম্ভ হল। প্রায় দু'বছর পরে এই মোকদ্দমায় ঠাকুর জমিদার জয়লাভ করলেন এবং লাহিনী গ্রামে প্রায় ৪০ বিঘা জমিতে ঠাকুর জমিদার-পক্ষ দখল পেলেন। প্রায় তিন চার বৎসর রবীন্দ্রনাথ তাঁর দৃঢ় সঙ্কল্প সাধনের জন্য লড়ে বিরক্ত হয়ে পড়লেন। ঐ আদর্শ পল্লীর ইতিহাস এখন সকলেরই অজ্ঞাত, কারণ কোন প্রামাণিক কাগজপত্রের অস্তিত্ব নাই। ঐ সংক্রান্ত একখানা দরখাস্তের প্রতিলিপি আমার 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথের' ৪৮ পৃষ্ঠায় পাওয়া যাবে।* এই দীনু ঘোষের জমি পরে স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মোহিনী মিলের কর্তৃপক্ষ স্বর্গত রমাপ্রসন্ন চক্রবর্তী মহাশয়দের কাছে বিক্রী করেন। রমাবাবু এই জমির ইতিহাস জানতেন। তিনি এই জমির উপরে কুষ্টে মোহিনী মিলের উপনিবেশ তৈরী করেন এবং এই পল্লীর প্রধান রাস্তার নাম দেন "ঠাকুর এভিনিউ।"

প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর পূর্বে শিলাইদহ কাছারী ও কুঠীবাড়ি থেকে শিলাইদহ ভদ্রপল্লীতে যাতায়াতের বিশেষ রাস্তা ছিল না। রবীন্দ্রনাথ এজন্য দুটি রাস্তা এবং গোপীনাথদীঘির পশ্চিমে বাজার ইস্কুল ও পূজা মন্দিরের জন্য গ্রামবাসীকে জমি দেবার জন্য উৎসাহিত করেন; কিন্তু গোঁড়া গ্রাম প্রধানগণ জমি দিতে স্বীকৃত হলেন না। কঠোর হস্তে রবীন্দ্রনাথ কাজে নামলেন। তাঁর উপদেশে ম্যানেজার স্বর্গত বিপিনবিহারী বিশ্বাস বলে এবং কৌশলে যে দুটি সুন্দর রাস্তা ও বাজার তৈরী করলেন তার জন্য গ্রামের পরবর্তী বংশধরগণ আজও কৃতজ্ঞ। রবীন্দ্রনাথ কর্তব্যে কঠোর, তাই তাঁর দুর্নাম রটনা করা সহজ ছিল।

জমিদারীর মধ্যে মণ্ডলী প্রথা প্রবর্তনের ব্যাপারেও তাঁর সুদৃঢ় কর্তব্য-নিষ্ঠা ও অবিচল অধ্যবসায়ের পরিচয় পাওয়া যায়। এই নূতন ব্যবস্থা

*আসল দরখাস্তখানা বিশ্বভারতী রবীন্দ্র-ভবনে আছে। শিলাইদহ সদর কাছারির চিঠিপত্রের বহু ফাইল ও নক্সা ইত্যাদি পরবর্তীকালে কোর্ট অব ওয়ার্ডসের ম্যানেজার পুড়িয়ে ফেলে দেন। সেজন্য প্রামাণ্য চিঠিপত্র ও নক্সার নকল দেওয়া সম্ভব হল না।

যখন তিনি জমিদারীতে প্রবর্তন করলেন, তখন কর্মচারীদের মধ্যে অপ্রকাশ্য বিদ্রোহ দেখা দিল; প্রধান কর্মচারী ম্যানেজার জানালেন এই নূতন প্রথা কার্যকরী হবে না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তাঁর সঙ্কল্পে অটল; পরিকল্পনায় তাঁর অসীম বিশ্বাস। অনেকবার ম্যানেজার তাঁর প্রতিকূল আচরণ করেছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে অনুধাবন করবার যথেষ্ট সময় দিলেও ম্যানেজার তাঁর মত পুরোপুরি গ্রহণ না করায় রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বরখাস্ত করেন। এ ব্যাপারেও তিনি কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছিলেন।

জমিদারী প্রথা ও ব্যবস্থার বহুদিনের দুর্নাম ও কলঙ্ক মোচনের জন্য তিনি অবিচলিতভাবে দৃঢ়হস্তে যে সংস্কার ও সংগঠনের আয়োজন করেন, সে বিষয়ে সেকালে কোন জমিদার চিন্তাও করতেন না। অনগ্রসর দেশে এই সমস্ত অভাবনীয় ব্যবস্থার জন্য রবীন্দ্রনাথ বহুলোকের নিন্দা ও কঠোর সমালোচনা সহ্য করেন।

ম্যানেজারের প্রতিকূল আচরণের মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ জমিদারীতে মণ্ডলী গঠন ও তার কার্যপদ্ধতির সংস্কার ও প্রচলন বিষয়ে নিম্নস্থ কর্মচারীদের কিভাবে উপদেশ দিচ্ছেন তা নিম্নলিখিত চিঠি ক'খানায় জানা যাবে—

সে সময়কার মণ্ডলীর (বিভাগের) ম্যানেজার সতীশচন্দ্র ঘোষকে লিখছেন—

আশিসঃসন্তু—

ডাক নজর অনুসারে জলির নজর খাজনা আদায়ের বৎসর এ নহে। প্রজাদের অবস্থা ও উৎপন্ন ফসলের পরিমাণের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই আদায় তহশীল করা শ্রেয়। এ সম্বন্ধে ম্যানেজারকে পত্র লিখিয়াছি। তুমি তাঁহার সহিত পরামর্শ করিয়া কিরূপ ব্যবস্থা করা কর্তব্য আমাকে জানাইবে।

সর্বতোভাবে প্রজাদের সহিত ধর্মসম্বন্ধ রক্ষা করিয়া তাহাদের পূর্ণ বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে হইবে। আমরা যে সর্বপ্রকারে প্রজাদের হিত ইচ্ছা করি, তোমাদের ব্যবহারে তাহা প্রতিপন্ন করিতে হইবে। তোমার অধীনস্থ মণ্ডলের অন্তর্গত পল্লীগুলির যাহাতে সর্বপ্রকারে উন্নতিসাধন হয় প্রজাদিগকে সেজন্য সর্বদাই সচেষ্ট করিয়া দিবে। নূতন ফসলের প্রবর্তনের জন্যও বিশেষ চেষ্টা করিবে। ইতিপূর্বে তোমাদের প্রতি যে মুদ্রিত উপদেশ বিতরণ হইয়াছে তদনুসারে কাজ করিতে থাকিবে।

প্রজাদের প্রতি যেমন ন্যায় ধর্ম ও দয়া রক্ষা করিবে, তেমনি অধীনস্থ কর্মচারীদিগকে বিশেষভাবে কর্মের শাসনে সংযত করিয়া রাখিবে। কর্মচারী-দের কোন প্রকার শৈথিল্য বা নিয়মভঙ্গ আমি কখনই মার্জনা করিব না। যাহাতে তোমার অধীনস্থ তোমার আমলাগণ প্রশ্রয় পাইতে না পায় এ সম্বন্ধে

তোমাকে অত্যন্ত কঠিন হইতে হইবে। তুমি স্বয়ং যেরূপ অবিচলিত নিষ্ঠার সহিত কাজ করিবে, তাহাদের নিকট হইতেও তেমনি করিয়া বিনা ওজরে কাজ পুরাপুরি আদায় করিয়া লইবে। কর্মচারিগণ সম্পূর্ণ মনে প্রাণপণ পরিশ্রমে কাজ করিতেছে জানিতে পারিলে তাহারা পুরস্কৃত হইবে। ইতি—২২শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩১৫।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

ম্যানেজারের ব্যবস্থা সম্বন্ধে এই কর্মচারী আরও গুরুতর কিছু অভিযোগ করায় পুনরায় লিখছেন দশদিন পরেই কর্মচারীকে উৎসাহিত করবার জন্য—

আশিসঃসন্তু—

তুমি তোমার কর্তব্য পালন করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিবে না। যাহাতে প্রজাদের হিতকার্য করা হয় এই দিকে একমাত্র লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করিবে।

আদায় তহশীলের কার্যে যদি অতিরিক্ত লোকের আবশ্যক হয় তবে রিপোর্টের দ্বারা আমাকে জানাইলেই তাহাব প্রতিকার হইবে।

তোমার বেতনের যে অংশ কাটা গিয়াছে এবারকার মত তাহা মাপ করিয়া দেওয়া হইবে।

শরৎ সরকারকে মণ্ডলীর সেরেস্তা গঠনের জন্য পাঠানো গিয়াছে। যেভাবে কাজ করিতে হইবে শরৎ তাহার উপদেশ দিবে এবং কার্যনির্বাহের জন্য যেরূপ ব্যবস্থা করা আবশ্যক সে সম্বন্ধে সে রিপোর্ট করিবে। যাহাতে জমা, সুমার ব্যবস্থা প্রভৃতি সকল কর্মই মফঃস্বল সেরেস্তায় সম্পন্ন হইতে পাবে সেই রকম বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ইতি—২রা আষাঢ়, ১৩১৫।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পুনরায় বাধাপ্রাপ্ত কর্মচারীকে কঠোরভাবে উপদেশ দিচ্ছেন—

আশিসঃসন্তু—

তোমার সাধ্যমত এবং উচিত মত কাজ করিবে। শৈথিল্যও করিবে না, অন্যায়ও হইতে দিবে না। ইহাতে অসন্তোষের কোনো আশঙ্কা করিও না।

উজির ও ছাবের বরকন্দাজদিগকে যেরূপ শাস্তি দিয়াছ, এবার তাহাদের শিক্ষার পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। ভবিষ্যতে এরূপ ঘটিলে তাহাদিগকে বরখাস্ত করা কর্তব্য হইবে।

যদি খয়রাতুল্যাকে কাল্লীগ্রামে আনিয়া কালোয়া মণ্ডলীকে অন্যান্য মণ্ডলীর মধ্যে বিভক্ত করিয়া দেওয়া হয়, তবে তোমার অংশে কালোয়া ও রঘুনাথপুর

লইতে পারিবে কিনা লিখিবে। এ প্রস্তাব সম্বন্ধে কেহ যেন কিছু না জানিতে পারে। ইতি—১৯শে শ্রাবণ, ১৩১৫।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

নিজ জমিদারী মামুলী-সর্বস্ব পুরোনো প্রথার আমূল সংস্কার করতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কঠোর হস্তে এই মণ্ডলী প্রথার প্রবর্তন করেন। এ প্রথা অনেকটা পঞ্চায়েৎ প্রথার মত, জমিদারীর প্রধান কর্মকেন্দ্রের কাজ পল্লীগুলির মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া। এর দ্বারা প্রজা ও জমিদারের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হতে পারে, জমিদারীর কাছারী শুধু খাজনা আদায়ের যন্ত্র বিশেষ না হয়। এই নূতন প্রথা প্রচলন করতে রবীন্দ্রনাথকে অবিচলিত নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের সঙ্গে আমলা কর্মচারীদের বহু জটিল প্রশ্নের মীমাংসা করতে হয়েছিল এবং দৃঢ়হস্তে এই নূতন সংস্কারকে বহুদিন পর্যন্ত পরিচালিত করতে হয়েছিল। কিন্তু এর শুভ ফল পাবার আগেই এই নূতন প্রথা বন্ধ করতে হয়েছিল—অতিরিক্ত ব্যয়-বাহুল্যের জন্য। এর পর রবীন্দ্রনাথ জমিদারীর কাজ ছেড়ে দেন। এ সম্বন্ধে তাঁর মনের ভাবটি "রায়তের কথার" (প্রমথ চৌধুরী প্রণীত) ভূমিকায় সুন্দরভাবে প্রকাশ করেছেন।

সৃষ্টি ও সংস্কারকার্যে রবীন্দ্রনাথের দুর্দান্ত সাহস সুদৃঢ় নিষ্ঠা ও অধ্যবসায়ের পরিচয় রবীন্দ্র চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্য।

স্বদেশী মেলা

১৩১১ সালে রবীন্দ্রনাথ বক্তৃতা করলেন "স্বদেশী সমাজ" তখনকার মিনার্ভা রঙ্গমঞ্চে। বাঙালীকে আত্মস্থ হতে আহ্বান করলেন, সমাজকে পুনর্গঠন করতে পরামর্শ দিলেন, পরানুবাদ পরাণুকরণ ছাড়তে বললেন; দেশের নাড়ির সঙ্গে সবাইকে মিলতে বললেন। বক্তৃতা করেই কর্তব্য শেষ করলেন না। 'স্বদেশী সমাজের' নিয়মাবলী ছাপালেন, বন্ধুবান্ধবের মধ্যে প্রচার করলেন, সভা করলেন,—সভ্য জোটালেন প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে। বক্তৃতায় হাততালি পেয়েই খুসী হয়ে আত্মতৃপ্তি পেলেন না,—যেমন আজকাল হয়েছে। লোকের দ্বারে দ্বারে গিয়ে প্রচার করলেন, দেশ সংগঠনের পথের সন্ধান করে দিলেন। তথাকথিত বড় লোকেরা শুধু বাহবাই দিলেন, কাজে এগোলেন না। পরিশ্রান্ত কবি তবু বিরক্ত হলেন না,—গাইলেন—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে,
তবে একলা চলরে।"

দেশের বড় বড় সমস্যা নিয়ে যুবক রবীন্দ্রনাথ কথায় ও কাজে কী বিরাট আন্দোলন তুলেছিলেন তা অবনীন্দ্রনাথের "ঘরোয়া" বইতে পাওয়া যাবে। কবি ও কর্মবীর একসঙ্গে এক দেহে রবীন্দ্রনাথ, চিরকালই—তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত। পাবনা কনফারেন্সে আহ্বান জানালেন—আবেদন নিবেদন ছেড়ে কাজে লেগে যাও, গ্রামে যাও, জাতির ভিত্ পাকা করে গাঁথো,—হিন্দু-মুসলমান এক হও, মাতৃভাষায় সভাসমিতি করো, নইলে কোটি কোটি নিরক্ষর লোকের প্রাণে তোমার উপদেশ পৌঁছুবে কেন? শুধু তাই নয়; নাটক লিখলেন "প্রায়শ্চিত্ত"। নিজে "ধনঞ্জয় বৈরাগীর" ভূমিকা অভিনয় ক'রে প্রজার শক্তি কোথায়—কিসে সে শক্তি জাগবে, 'সত্যাগ্রহ' মন্ত্রের প্রথম আহ্বান জানালেন। এ সমস্ত অগ্নিমন্ত্রের কল্পনাও তখন কেউ করেন নি।

"স্বদেশী সমাজের" রূপ দিতে তিনি কি রকম মেতে উঠেছিলেন, তা আমি জানি। নিজের প্রত্যক্ষ জানা গল্প বলছি—

কবি জমিদার মাথা ঘামাচ্ছেন শিলাইদহে খুব প্রকাণ্ড একটা মেলা করতে হবে। পল্লীর আমোদ-প্রমোদ কুটির শিল্প, শরীর চর্চা, আনন্দ আর শিক্ষা হবে তার অঙ্গ। আমার বাবা (সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী) কুঠীবাড়িতে

তাঁর ছেলেমেয়েদের পড়াতেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রসঙ্গে কারো কাছে বিশেষ সাড়া পান না। তিনি বাবাকে বললেন—"গাঁগুলো মরে গেছে, জাগাতে হলে বেশ বড় একটা মেলা করা দরকার।" বাবা অপ্রত্যাশিতভাবে একথা শুনে লাফিয়ে উঠলেন। তিনিও তরুণ। রবীন্দ্রনাথ সব প্ল্যান বুঝিয়ে দিলেন; বাবা একেবারে উৎসাহে মেতে উঠলেন। তখন তিনি গ্রামের ইস্কুলের হেড মাস্টার, গ্রামের প্রেসিডেণ্ট পঞ্চায়েত ও অধিকারী পরিবারের কর্তা। রবীন্দ্রনাথ ঝোপ বুঝে কোপ মেরেছেন।

পাঁজি পুঁথি শাস্ত্র পুরুৎ-ঘেঁটে কিছু হলো না। দারুণ উৎসাহ, দেরি হলে হয়তো জুড়িয়ে যাবে। ভেবে চিন্তে ঠিক হলো "কাত্যায়নীর" মেলা হবে। মা দুর্গাই কাত্যায়নী। শীত পড়েছে, কিন্তু মা দুর্গার মতই প্রতিমা তৈরী হলো 'কাত্যায়নীর'। সে যে কী বিরাট বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনা,–কি বলবো। গোপীনাথ মন্দিরের সামনে "খোলাটে" প্রকাণ্ড মণ্ডপ তৈরি হলো, প্রতিমা তৈরি হলো। সময়ের অভাব, তাই রাত্রে গ্যাস লাইট জ্বালিয়ে গাঁয়ের মুরুব্বি, ছেলে বুড়ো সবাই খাটছেন। আহার নিদ্রা ভুলে গেছেন। যাত্রা, থিয়েটার, পাঁচালী, কবি, তরজা, কীর্তন, বাউল ইত্যাদির বিরাট আয়োজন সাতদিন ধরে। মেলা দীর্ঘদিন চালাবার জন্যে কেউ বললেন মেলার নাম হোক "করোনেশন মেলা"।* রবীন্দ্রনাথের ঘোর আপত্তিতে নাম হলো "কাত্যায়নীর মেলা"। কামার, কুমোর, ছুতোর মিস্ত্রী, জোলা সবাইকে ডাকা হলো তাদের শিল্পসম্ভারে মেলা সাজাতে। লেঠেল, কুস্তীগিরদের আনা হলো তাদের কসরৎ দেখাবার জন্যে। এইভাবে বিরাট মেলা হলো পর পর তিন বছর। শেষ বছরে আমার বাবা মারা গেলেন ঠিক সেই সময়ে যখন প্রতিমার রং দেওয়া হচ্ছে।

"কাত্যায়নীর মেলা" গেল উঠে; রবীন্দ্রনাথের মাথার মধ্যে ঐ স্বদেশী মেলার নানা কল্পনা তখনও জাল বুনছে। দু'তিন বছর যেতেই আবার তাঁর প্রস্তাব, আবার অন্যখানে অন্য নামে মেলা হবে,—এবার হলো—"রাজরাজেশ্বরীর মেলা"। তখন ম্যানেজার ছিলেন বিপিন বিশ্বাস, অদ্ভুত মানসিক শক্তিতে শক্তিমান পুরুষ। তিনি একাই একশো। দশমহাবিদ্যার 'ষোড়শী' মূর্তি তৈরি হলো। নতুন করে প্রকাণ্ড পাকা মণ্ডপ তৈরি হলো। জমিদারীর মধ্যে যত প্রকার পল্লীসুলভ আমোদ-প্রমোদ ছিল—সমস্ত দলকে আনা হলো, পল্লী-শিল্পীদের আনা হলো, তারা ভারে ভারে তাদের পণ্যসম্ভার নিয়ে মেলা

*সম্ভবত ১৯০১ কি ১৯০২ সালে ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের করোনেশন উৎসব স্মরণীয় করবার জন্যই গ্রামবাসীরা এই নামকরণের প্রস্তাব করেছিলেন।

সাজালো, এবারে কলকাতা থেকে ত্রৈলক্যতারিণী আর প্রসন্ন নিয়োগীর যাত্রার দল আনা হলো। লেঠেল, কুস্তীগিরদের আনা হলো।

মেলা হলো পনেরোদিনব্যাপী। নিয়োগীর যাত্রা দলের "দেবযানী" অভিনয় এখনো আমার চোখের উপর ভাসছে; আমি ঐ দলের ম্যানেজারের সঙ্গে খুব ভাব করে নিয়েছিলাম। কাত্যায়নীর মেলা ও রাজরাজেশ্বরীর মেলা উপলক্ষে রবীন্দ্র-বন্ধু আচার্য জগদীশচন্দ্র ও নাটোররাজ জগদিন্দ্রনাথ এসেছিলেন; এঁদের ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের আত্মীয়-স্বজন অনেকে এসেছিলেন; কৃষ্ণনগর কুষ্টে থেকেও হোমরাচোমরা হাকিমরা এসেছিলেন।

একটা মজা এই যে, এই সব বিরাট অনুষ্ঠানের কর্তা ও উৎসাহদাতা রবীন্দ্রনাথ কিন্তু নেপথ্যে থাকতেন। এ সমস্ত অনুষ্ঠানের কর্তৃত্ব ছিল গ্রামের লোকদের হাতে। উদ্দেশ্য, গ্রামের লোক আত্মবিশ্বাসে, আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে উঠুক। ঐ দুই মেলায় বিখ্যাত শিবু সাহার কীর্তন হয়েছিল একাদিক্রমে ৫।৬ দিন ধরে। লালন ফকিরের শিষ্যদের বাউল গানও হয়েছিল কয়েকদিন। লাঠি খেলা নিয়ে লেঠেলদের মধ্যে বিবাদ হওয়ায় রাজরাজেশ্বরীর মেলায় খুব গোলমাল হয়, সেজন্য রবীন্দ্রনাথ খুব বিরক্ত হয়েছিলেন। সেদিনের কথা মনে হলে ভাবি—

> "কে জাগিবে আজ, কে করিবে কাজ.
> কে ঘুচাতে চাহে জননীর লাজ।"

এই রকম সুপরিচালিত স্বদেশী মেলা গ্রামে গ্রামে, এমনকি সহরেও প্রচলিত হলে এই নিরানন্দ অবজ্ঞাত দেশ গ্রামীণ সংস্কৃতির পথে কতখানি সঞ্জীবিত ও উৎসাহিত হতে পারে সে বিষয়ে তিনি বহু কবিতা ও প্রবন্ধ লিখেছেন। এমনকি প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের স্মৃতিরক্ষার জন্য তাঁদের মর্মরমূর্তি প্রতিষ্ঠা, ইস্কুল কলেজ, সভাসমিতি বা লাইব্রেরীর চেয়েও তাঁদের স্মরণার্থ বার্ষিক মেলার প্রচলনকে শ্রেষ্ঠ ও স্বাভাবিক উপায় বলে পরামর্শ দিয়েছেন তাঁর "স্মৃতিরক্ষা" প্রবন্ধে—

"মেলায় যে স্মৃতি প্রচারিত হয়, তাহা চিরদিন নবীন, চিরদিন সজীব, এককাল হইতে অন্যকাল পর্যন্ত ধনী দরিদ্রে, পণ্ডিতে মূর্খে মিলিয়া তাহাকে বহন করিয়া লইয়া যায়। তাহাকে কেহ ভাঙিতে পারে না—ভুলিতে পারে না। তাহার জন্য কাহাকেও চাঁদার খাতা লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হয় না, সে আপনাকে আপনি অতি সহজে রক্ষা করে।

দেশের শিক্ষিত-সমাজ এই কথাটা একটু ভাবিয়া দেখিবেন কি? রাম-

মোহন রায়, বিদ্যাসাগর, দেবেন্দ্রনাথের স্মৃতিকে বিদেশি উপায়ে খর্ব না করিয়া, ব্যর্থ না করিয়া, কেবল নগরে কয়েকজন শিক্ষিত লোকের মধ্যে বদ্ধ না করিয়া দেশ-প্রচলিত সহজ উপায়ে সর্বকালে এবং সর্বসাধারণের মধ্যে ব্যাপ্ত করিবার চেষ্টা করিবেন কি?"

রবীন্দ্রস্মৃতিরক্ষার জন্য যাঁরা আজ বিশাল বিরাট আয়োজনে মাথা ঘামাচ্ছেন, তাঁদের কাছেও আমি এই প্রশ্ন তুলছি।

ম্যানেজার এডওয়ার্ড সাহেব

নামটি ছিল তাঁর এডওয়ার্ড সাহেব, পুরো নামটি কি তা জানতে পারা যায় নাই। তিনি শিলাইদহে এসেছিলেন যখন আমাদের বয়স নয় দশ বছর অর্থাৎ আন্দাজ তেরশো দশ কি এগারো সালে, লরেন্স সাহেবের মত রথীন্দ্রনাথের ইংরাজীশিক্ষক হিসাবে নয়,—রবীন্দ্রনাথের জমিদারীর ম্যানেজাররূপে।*

এডওয়ার্ড সাহেব তাঁর মেম ও ছেলে নিয়ে শিলাইদহে কুঠীবাড়িরই একতালাতে বাসা বাঁধলেন। আমরা তখন যেতাম কুঠীবাড়িতে ফুলের বাগান দেখতে, ফুলের রাণী নানান রূপের নানান রংএর গোলাপ-সুন্দরীদের দেখতে। কোন্ ফুলটি কুঁড়ি, কোন্‌টি আধফুটন্ত, কোন্‌টি ফুটে রূপের গরবে হেসে বাতাসে ডালের উপর ঢলে পড়ে রংএর জৌলুষে চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে; কোন্‌টি গোলাপী, কোন্‌টি গাঢ় লাল, কোন্‌টি ফিকে লাল, কোন্‌টি হলদে, কোন্‌টি ধবধবে সাদা, কোন্‌টির থোপায় থোপায় কতটি কুঁড়ি, কোন্‌টি ঝ'রে পড়ে কাঁদছে, পাঁপড়ীগুলো মা'হারা ছেলের মত কেয়ারীর উপর পড়ে করুণ নয়নে চেয়ে আছে! এইসব সোনার ছবি মনের মধ্যে এঁকে রাখতুম। দিনরাত ঐ ফুলপরীদের লীলা দেখে বিহ্বল হয়ে স্বপ্ন দেখতুম। সাহেব বাগানে এলে পালিয়ে যেতুম। সুযোগ পেলে দু'একটা ফুল চুরিও করতুম তা বলাই বাহুল্য।

সাহেব জমিদারীর ম্যানেজারী করতেন কিনা জানি না। আমরা দেখতুম তাঁর হাতে থাকত প্রায়ই বন্দুক। হাফ্‌প্যাণ্ট পরা, রোদের সময় মাথায় টুপি, সেকালের পাড়াগাঁয়ে অদ্ভুত গৌরাঙ্গ অবতার। তিনি যে সাহেব ম্যানেজার তা তাঁর কাজকর্মে আদৌ বুঝা যেতো না। যেন তিনি শিকারী সাহেব।

প্রায়ই সাহেব শিকারে যেতেন। সঙ্গে থাকতো শিকারী বরকন্দাজেরা আর বুনো প্রজাদের কেউ কেউ। তখন শিলাইদহের বিখ্যাত শিকারী বিশ্বনাথ পরলোকে। চামরু খুব বুড়ো। চামরুর ভাইপো সাধু বুনো তখন বুনো-পাড়ার বন্দুকধারী শিকারী এবং সাহেবের সঙ্গী।

*এমন এক সময় ছিল যখন ধনী অভিজাত জমিদারদের মধ্যে কেউ কেউ সাহেব ম্যানেজার রাখবার পক্ষপাতী ছিলেন। বিখ্যাত মেদিনীপুর জমিদারী কোম্পানী লিমিটেড-এর মালিক ও পরিচালকবর্গ ছিলেন ইউরোপীয়ান। তাঁদের শাসন সংরক্ষণের খুব খ্যাতি ছিল।

শিলাইদহে তখন বাঘ ছিল না। 'জঙ্গল,' অবশ্য ছিল। তবে রবীন্দ্রনাথের "ছেলেবেলায়" যে জঙ্গলে শিলাইদহের বর্ণনা পাওয়া যায় তার চেয়ে অনেক সভ্যভব্য। সাহেবের শিকারের ঠ্যালায় অনেক শুয়োর ভবলীলা সম্বরণ করেছিল। শুয়োর বাদেও 'বাঘডাঁসা,' বনবেরাল, খাটাস্, কোন কোন বছরে নবাগত গোবাঘা দু'চারটি সহেবের বন্দুকের গুলিতে দমাদ্দম্ প্রাণ হারাতো। আমরা বলতাম, "শুয়োর-মারা সাহেব" কারণ সাহেব প্রায়ই দলবল নিয়ে বন্দুক হাতে বনে জঙ্গলে ঘুরতেন। লোকে বলতো, সাহেব নাকি হাঁসের ডিম, মুরগীর ডিম আর কচ্ছপের ডিম খেতেন রাক্ষসের মত। তাঁর চাকর-বাকর হরেক রকম ডিম যোগাড় করে হয়রাণ হয়ে যেতো।

তিন চার মাস পরে কুঠীবাড়িতে গিয়ে দেখি, সেখানে সাহেব নেই, মেমও নেই, বন্দুকও নেই, শিকারীর দলও নেই, তাঁর ঘোড়াও নেই। শূন্য কুঠী-বাড়ি। আমরা নির্ভয়ে বাগানে বাগানে বেড়াতে লাগলুম। জলজ্যান্ত সাহেবটা সত্যিই সপরিবারে কোথায় উধাও হলেন? শুয়োররা বাঁচলো?

এর অনেক পরে সাহেবের ম্যানেজারীর গল্প শুনেছিলাম। কি ভেবে যেন সাহেব ঠাকুর বাবুদের জমিদারীর ম্যানেজার হয়ে আসেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথই তখন জমিদারী দেখাশুনা করতেন।

রবীন্দ্রনাথ তখন শিলাইদহে এসে বোটেই থাকতেন। তিনি সাহেব ম্যানেজারকে জমিদারীর কাজকর্ম সম্বন্ধে নানারকম প্রশ্ন করতেন। সাহেব নাকি জমিদারীর অবস্থা দেখে হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, "আপনার জমিদারীর অর্ধেকের বেশি প্রজা গরীব। অথচ জমিদারীর এত কাগজ যে সেগুলো কোথাও সরাতে হলে রীতিমত মালগাড়ি ভাড়া করতে হয়। আর এত খরচ ক'রে জমিদারীর মুনাফা পাবেন কি করে?"

রবীন্দ্রনাথ সাহেবের কথা শুনে প্রথমে অবাক্ হলেন তারপর হাসলেন।

ম্যানেজারের নিম্নস্থ আমলাদের অর্থাৎ এ্যাসিস্ট্যাণ্ট ম্যানেজার, পেশ্কার, সার্ভেয়ার, ইনস্পেক্টর ইত্যাদির কাছে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "ব্যাপার কি? ম্যানেজার কাজ করতে পারবে তো?" তাঁরা সবাই বললেন—সাহেবের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল জমা-ওয়াশীল-ভীতি। তিনি 'জমা-ওয়াশীল বাকী'র কাগজ কিছুতেই বুঝতে পারেন না। বলেন, "এই ঝামা-ওশীল্ হামাকে পাগল করবে!"

শুধু তাই নয়। জমিদারী সেরেস্তায় সেকালের অতি প্রয়োজনীয় বড় বড় নিকাশী কাগজ সাহেব একেবারেই পছন্দ করতেন না, শুধু বুঝতেন, প্রজাদের কাছ থেকে টাকা আদায় করবার নানা রকমের উপায়। সেই জন্য মহালে মহালে

ঘোড়ায় চড়ে খুব ঘুরতেন, তাতে প্রজারা খুব ভয় পেতো, ভাবতো সাহেব বুঝি রেগে বন্দুক দিয়ে তাদের গুলি করবেন। বড় বড় জমিদারী কাগজ দেখলেই সাহেব "মাইগড্" বলে মাথায় হাত দিতেন। "জমা-ওয়াশীল বাকীর" কাগজকে তিনি ভয় করতেন বাঘের চেয়েও বেশি। বলতেন এক এক মহালের 'জমা-ওয়াশীল' কাগজ এক গাড়ি। এই রকম ক'রে যদি বছরের পর বছর ঐ সাংঘাতিক বাঘা কাগজ জন্মলাভ করে তবে আদায়-ওয়াশীল কাজ বন্ধ করতে হবে আর ঐ দুশমন কাগজ রাখবার জন্য একটা বড় বাড়ি বানাতে হবে।

সেকেলে জমিদারী সেরেস্তার "জমা-ওয়াশীল বাকীর" যে ফরম ছিল তা সত্যিই খুব জটিল আর বহু-ব্যাপক একটা বিশিষ্ট নিকাশী কাগজ। ফরমটাও একটা তক্তপোষ জোড়া বিরাট। প্রত্যেক প্রজার জমি-জমার বিস্তারিত পরিচয়, তার খাজনার পরিমাণ, কমবেশির বিবরণ, আদায়ের বিবরণ ও বাকীর রকমারী পরিচয়ে প্রায় দু'শো কলমে সম্বলিত বিরাট নিকাশী কাগজ। তা দেখলেই সাধারণ লোকের মাথা ঘুরে যায়। তাতে বিদেশী সাহেবের চক্ষু চড়ক্‌গাছ হবে, তাতে আর বিচিত্র কি!

রবীন্দ্রনাথ সাহেবকে একা কাছে ডেকে নিয়ে ঐ মারাত্মক কাগজ আর জমিদারীসংক্রান্ত অনেক বিষয় আলোচনা ক'রে হতাশ হয়ে পড়লেন। তিনি দেখলেন, সাহেব খাজনা সেলামী আর বাকী বকেয়া টাকা কড়ায় গণ্ডায় ক'সে আদায় করাটাই বেশি বোঝেন। তিনি চান শুধু ইনকাম্ বা মুনাফা, তা ভিন্ন আর যেকোন কার্জ আছে তা তিনি বড় একটা বুঝেন না।

তারপরে তিনি অন্যান্য আমলাদের সামনে সাহেবকে নিয়ে জমিদারীর কাজকর্ম সম্বন্ধে আলোচনা করতে লাগলেন। সাহেব কলম কামড়াতে কামড়াতে উত্তর দিতে লাগলেন। এমন সময়ে একজন আমলা জমিদারীর একটি স্বত্তের মামলার একগাদা দলিল দস্তাবেজ বস্তাবন্দী ক'রে এসে হাজির। কাগজের বহর দেখেই সাহেবের মুখচোখ রাঙা হয়ে উঠলো। তিনি মাথায় হাত দিয়ে হতাশ ভাবে বললেন—"এই কাগজগুলো পড়তেই একজন লোক বুড়ো হয়ে যাবে, মামলা করবে কখন?"

রবীন্দ্রনাথ হো হো করে হেসে বললেন—"সাহেব, এটা বাংলা দেশের জমিদারী, এটা ইউরোপের কোন ফার্ম নয়। এখানে প্রজা আছে, তাও গরীব প্রজা, আমরা নানা উপায়ে তদের গরীব করেই রেখেছি। তদের জমিজমা, খাজনার হিসাবপত্র, আদায় উসুল, জরিপ জমাবন্দী, তাদের সুবিধা অসুবিধার মীমাংসা, মামলা মোকদ্দমা, এই সব নিয়েই তো আমার জমিদারী। গরীব

প্রজাও চাই, আবার তার হিসেব কিতেবের কগজপত্রও চাই। আমরা তো আর প্রিন্স নই, আমাদের ইনকাম্ যা আছে, তাতেই আমরা খুশি। আয় বাড়াবার যে-সব উপায় হতে পারে তা আমাদের দেশে কল্পনার অতীত। এই সব নিয়েই আমার জমিদারী। তোমাকে তারই ম্যানেজ্‌মেণ্ট করতে হবে প্রজাকে আর জমিদারকে বাঁচিয়ে।"

সাহেব মাথা চুলকিয়ে খানিক ভেবে বললেন, "এ জমিদারীর ম্যানেজ্‌মেণ্ট করা আমার কর্ম নয়। এ বড় কঠিন কাজ, আমার ধাতে সইবে না।"

সাহেব তার পরেই ম্যানেজারী ছেড়ে দিয়ে তল্‌পীতল্‌পা গুটিয়ে চলে গেলেন শিলাইদহ থেকে। আবার কুঠীবাড়ি নিস্তব্ধ হয়ে রইলো। রবীন্দ্রনাথ একজন বিচক্ষণ বুদ্ধিমান পুরোনো কর্মচারীকে ম্যানেজার পদে নিযুক্ত করলেন।

সাহেব শিলাইদহ ছেড়ে যাবার সময় আমলাবাবুদের করমর্দন ক'রে বিদায় অভিবাদন জানিয়ে বলেছিলেন, "পোয়েট টেগোরের জমিদারীটা মোটেই তাঁর কবিতার মত নয়। এ বড় বিষম ঠাঁই, এখানে কবিকে খুব ভুগতে হবে। তাঁর আইডিয়া, তিনি জমিদারীকেও কবিতা বানিয়ে ফেলবেন; কিন্তু তা পারবেন না; তাঁকে অনেক ঠকতে হবে। আমি তাঁর কাজ করতে পারলাম না; খুব দুঃখের সঙ্গে কাজে ইস্তাফা দিয়ে চলে যাচ্ছি। থাকতুম আরও কিছুদিন তাঁর আইডিয়া বুঝবার জন্যে কিন্তু তোমাদের ঐ ঝামা-ওশীল আমায় তাড়ালে—"

সাহেব নিজে হেসে সবাইকে হাসিয়ে শিলাইদহ ত্যাগ করলেন।

তাঁতের কারখানা

১৯০৫ সালের ১৬ই অক্টোবর, বাংলা ১৩১২ সালের ৩০শে আশ্বিন তারিখে বৃটিশ শাসনের কর্জনী আমলে বঙ্গব্যবচ্ছেদএর আদেশ ঘোষিত হল। বাঙালী সদম্ভে সে পার্টিসন অস্বীকার করে বসল। বাংলার তথা ভারতের ইতিহাসে স্বাধীনতা সংগ্রামের নবযুগ,—নূতন প্রভাতের উদয় হল। সেই গৌরবদীপ্ত ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন।

বঙ্গ ব্যবচ্ছেদের ফলে পদ্মার ঢেউএর মত সারাদেশে আন্দোলনের পর আন্দোলনের তরঙ্গ বয়ে চলল। কিন্তু আন্দোলনের সাফল্যের জন্য এই মৃতপ্রায় দেশ, জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র, কৃষি, শিল্প, বাণিজ্য, শিক্ষা প্রভৃতি সংগঠনের কোন চেষ্টা দেখা গেল গনা। এর জন্যে রবীন্দ্রনাথের মনে একটা প্রস্তুতির ক্রিয়া চল্‌ছিল অনেকদিন ধরে। রাজা রামমোহন, বিদ্যাসাগর, বঙ্কিমচন্দ্রের পর রবীন্দ্রনাথই জাতির সামগ্রিক সংস্কার ও সংগঠনের স্বপ্ন দেখ্‌ছিলেন; ১৮৯৩ সালে সুবিখ্যাত কবিতা "এবার ফিরাও মোরে" রচনার পর দেশ ও জাতিগঠনের উদ্দেশ্যে আরও প্রবন্ধ কবিতা রচনা করলেন। ১৯০৪ সালে জুলাই মাসে "স্বদেশী মেলা" প্রবন্ধ পাঠ ও তার জন্য সক্রিয় আন্দোলনও তিনি কম করেন নাই। বিলাতী বর্জন আন্দোলনে বিলাতী বস্ত্রের বহ্ন্যুৎসব হয়ে গেল। কিন্তু ম্যাঞ্চেষ্টারের কাপড় না হলে আমাদের স্বদেশের লজ্জা নিবারণের কী ও কতটুকু ব্যবস্থা আছে, সে বাস্তব অবস্থাটা দেশনেতারা কতটুকু চিন্তা করেছেন? এইরকম সংগঠনমূলক বহু সমস্যা তাঁর চিন্তারাজ্যে আলোড়ন তুলেছিল। কাগজে কলমে বক্তৃতায় এই সমস্ত সমস্যার সমাধানের সন্ধান না পেয়ে দেশজোড়া আন্দোলনের উপর আস্থা হারিয়েছিলেন এবং দেশনেতাদেরও বাস্তব অবস্থায় সংগঠনের কোন চেষ্টা না দেখে নিজের একায়িক সাধ্য ও শক্তির উপর নির্ভর করে যে সমস্ত সংগঠনের কাজে সক্রিয়ভাবে নেমেছিলেন—তার একটি হচ্ছে নিজ জমিদারীতে বয়ন বিদ্যালয় বা তাঁতের কারখানা প্রতিষ্ঠা ও কলকাতায় স্বদেশী শিল্পের দোকান প্রতিষ্ঠা। রবীন্দ্রজীবনীতে এই সমস্ত বিষয়ের সামান্য উল্লেখ আছে—কারণ এবিষয়ে কোন প্রামাণিক তথ্য অনুপস্থিত।

এই তাঁতের কারখানা আমি দেখেছি যখন আমার বয়স আট বৎসর। বাল্যের সেই স্মৃতি আজও ভুলি নাই। তাঁতের কারখানার কয়েকজন তাঁতী-

শিক্ষক পূর্ববঙ্গবাসী যুবক আমাদের বাড়িতে খেতেন ও থাক্‌তেন। তাঁদের একজন ছিলেন যদুবাবু বা যদুমাষ্টার আমাদের প্রাইভেট্‌ পড়াতেন আর আমার ভাগে নরেন্দ্র মজুমদারকে "নলিভরা" শেখাতেন। আমরাও বাড়িতে চরকায় নানা রংএর সুতোর "ছিক্‌লি" গুছিয়ে দিতাম। এই বিষয়ে প্রত্যক্ষদর্শী একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোকের বিবরণ দিচ্ছি।

ঢাকা বিক্রমপুর নিবাসী শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় অতি শৈশবেই মামলা মোকর্দ্দমায় পৈত্রিক সম্পত্তি হারিয়ে পিতার যাজন ব্যবসায়ে সাহায্য করতেন ও গ্রাম্য পাঠশালায় পড়তেন। তাঁর পিতা ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত মানুষ, যজমানের দান ও দক্ষিণায় অতিকষ্টে সংসার চালাতেন। সেজন্য যোগেশবাবু প্রতিকূল ঘটনায় লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে পিতার সাহায্যকারী হিসাবে যজমানবৃত্তি গ্রহণ করলেন। তবুও বাংলা বই পেলেই পড়ে নিতেন। ইস্কুলকলেজের বিদ্যালাভের দুরাশা ত্যাগ করে প্রকৃতির পাঠশালাতেই তাঁর শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা বাড়তে লাগল। আবার দুই বৎসরের মধ্যেই পিতার মৃত্যুর পর দারুণ অভাবের মধ্যে সংসার প্রতিপালনের জন্য নানাস্থানে কাজের সন্ধান করতে করতে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপনে পড়লেন যে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর জমিদারী শিলাইদহে তাঁতের কারখানা খুলেছেন. সেখানে কাজের জন্য কারিকর ও শিক্ষার্থী প্রয়োজন। তিনি রবি ঠাকুরের কবিতা পেলেই পড়ে মুগ্ধ হয়ে অনেক কবিতা ও গান মুখস্ত করে ফেল্‌তেন। "যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—তবে এক্‌লা চলরে" গানটিতে ঐ দুর্দিনে উদ্দীপনার আলোক শিখার সন্ধান পেলেন।

এই অবস্থায় পূর্ববঙ্গে কয়েকটি বন্দরে পাটের আড়তে কাজ করবার পর বিরক্ত হয়ে তিনি তাঁতের কাজ শিখ্‌বার জন্য রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহের তাঁতের ইস্কুলে ভরতি হবার আশায় দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়লেন।

সতেরো বছরের অসহায় বালক। ট্রেনে কুমারখালী ষ্টেসনে নামলেন শেষরাত্রে। বিদেশ বিভূঁই,—কিছুই চিনেন না—ছেলেমানুষ! অগ্রহায়ণ মাসের শীত পড়েছে। কুমারখালী থেকে লোকের মুখে শুন্‌তে শুন্‌তে শিলাইদহ অভিমুখে রওনা হলেন।

বেলা ক্রমশ বেড়ে গেল। অপরিচিত পরিবেশ। শিলাইদহ গ্রামে পৌঁছে শ্রান্তক্লান্ত দেহে শুন্‌তে পেলেন—পাশেই গোপীনাথদেবের মন্দির থেকে কাঁশর ঘণ্টা বাজ্‌ছে। কয়েকজন প্রসাদ-প্রার্থীর কাছে শুন্‌লেন—এখনই গোপীনাথের প্রসাদ বিলি হবে; অতিথিরাও প্রসাদ পেয়ে থাকেন। ক্ষুধার্ত বালক গোপনীনাথে প্রসাদ পেলেন। মন্দিরের ছায়াস্নিগ্ধ শান্ত প্রাঙ্গণে বসে

তৃপ্তির নিঃশ্বাস ছেড়ে খানিক বিশ্রাম করে শিলাইদহ কাছারীর দিকে রওনা হলেন।

শিলাইদহ কাছারীর মাঠে কারোগেট টিনের প্রকাণ্ড দোচালা তাঁতের ইস্কুল। বেলা ১২টা। "টানাপোড়েনের" সুতো খাটানো রয়েছে; তিন চার জন তাঁতীও কাজ করছে। ইস্কুল খুল্‌বে আবার বেলা তিনটায়। তাঁতীদের সঙ্গে আলাপে জান্‌তে পারলেন—রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে নেই। বেলা তিনটায় ম্যানেজার বামাচরণ বসুর সঙ্গে কথাবার্তা বল্‌লে তাঁতের ইস্কুলে ভর্তির ব্যবস্থা হবে। যথাসময়ে যোগেশবাবু ম্যানেজার বামাচরণবাবুকে তাঁর আবেদন পেশ করলেন। অনেক দূর থেকে শিক্ষার্থী বিজ্ঞাপন পড়ে শিলাইদহে এসেছে। তিনি কাজ শিখ্‌বার ব্যবস্থা করে দিলেন। "পেট্‌খোরাকী" পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা ঠিক হল। প্রথমে শিখ্‌তে হবে সুতোর কাজ।

তাঁতের ইস্কুলের অধ্যক্ষ তাঁতীর নাম ভগবান তাঁতী, বেশ অভিজ্ঞ কারিকর। তাঁর অধীনে তিনজন শিক্ষক তাঁতী রয়েছেন। যোগেশবাবুর মত শিক্ষার্থীও কুড়ি পঁচিশজন। তার মধ্যে দশবারোজন বিদেশী, বাকী ক'জন স্থানীয় যুবক। অনেকেই বেশ কাজ শিখে ফেলেছেন। যোগেশবাবুও খুব মন দিয়ে সুতোর কাজ শিখ্‌তে লাগ্‌লেন। আটদশদিন পরে তাঁকে "নাটাই গুঠানো" আর "টানাহাঁটার" পরীক্ষা দিতে হল। পরীক্ষায় হেড্‌ তাঁতী ভগবান বেশ সন্তুষ্ট হলেন। সেই থেকে যোগেশবাবুর একটা পারিশ্রমিকের ব্যবস্থা হয়ে গেল কিন্তু শিলাইদহ কাছারীর মেস বা কুঠীবগাড়ীর তাঁতীদের মেসে আহারের চার্জ তাঁর এই পারিশ্রমিক থেকে কুলোবার কোন সম্ভাবনা দেখ্‌লেন না। তিনি রবীন্দ্রনাথকে পেয়ে এইজন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থার আবেদন জানালেন। সমস্ত ব্যাপার শুনে রবীন্দ্রনাথের আদেশে ম্যানেজার বামাচরণবাবু গোপীনাথবাড়িতে যোগেশবাবুর দুবেলা প্রসাদ পাবার ব্যবস্থা করে দিলেন। এইভাবে দু'মাস অতীত হতে চল্‌ল।

এদিকে শিক্ষার্থীর সংখ্যা বাড়ছে, তাঁতের সংখ্যাও বাড়ছে কাজও পুরোদমে চল্‌ছে। যোগেশবাবু গামছা বোনার তাঁতে কাজ পেলেন প্রাথমিকভাবে, কাজে বেশ আনন্দও পেলেন। ভগবান তাঁতীর কাছে তাঁতের 'কায়দা-কলম' শিখ্‌তে শিখ্‌তে, ভগবান বল্‌লেন—"ভদ্দরলোকের ছেলে, কাজ শিখে কী করবে বলতো? নিজের তাঁত চালাতে পারবে কি?" কথায় কথায় ভগবান বল্‌লেন তিনি হেড্‌ তাঁতী। মাইনে পান মাসে পঁচিশ টাকা আর একবেলার খোরাকী। ওস্তাদ হেড তাঁতীর এই উপার্জন শুনে তরুণ যোগেশবাবু ঘাব্‌ড়ে গেলেন। একটু ভাবনায় পড়ে গেলেন।

ঠিক এইসময় যোগেশবাবু তাঁর বিশিষ্ট পিতৃবন্ধু শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মশাইএর এক পত্র পেলেন। তিনি লিখেছেন—তাঁর পাটের কারবারের জন্য সিরাজগঞ্জে বিশ্বাসী লোকের বিশেষ প্রয়োজন হয়েছে। তিনি যোগেশবাবুকে পেলে কাজ দিতে পারেন। যোগেশবাবু চিন্তায় পড়লেন। তখন শিলাইদহের অনুরূপ আর একটি তাঁতের কারখানা ঠাকুরবাবুদের কুষ্টে কুঠীবাড়িতে খোলা হবে ঠিক হয়েছে। শিলাইদহ অধিকারী বাড়িতেও দুখানা তাঁত বস্‌বে। কিন্তু এই তাঁতের কারখানা কতদিনে স্বাবলম্বী হবে, তার কোন পথ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না; ঠাকুরবাবুদের খরচ বাড়ছে এবং লোকসানের পরিমাণই বেশী পড়ছে। যোগেশবাবু অনেক চিন্তার পর পিতৃবন্ধু শরৎবাবুর উপদেশমত তাঁর পাটের কারবারে সিরাজগঞ্জে যোগদান করলেন।

প্রায় পাঁচ ছ'বছর পাটের কারবারে অভিজ্ঞতার ফলে তিনি সিরাজগঞ্জের আড়তের চার্জ পেয়ে দেখ্‌লেন—ব্যবসাটা আগাগোড়া অসাধু উপায়ে চল্‌ছে; আদর্শভ্রষ্ট না হ'লে একাজ করে উন্নতির আশা নেই; কিন্তু তিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্যপাঠে এতই অনুপ্রাণিত হয়েছেন, যে অসাধু পথে অর্থোপার্জন তাঁর আদর্শের প্রতিকূল। পাটের ব্যবসায় ছেড়ে কলকাতা চলে এলেন—নূতন কাজের—নূতন উপায়ে অর্থোপার্জনের সন্ধানে। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে একবার দেখা করবার ইচ্ছাও তাঁর মনে প্রবল। কিন্তু তিনি তাঁর বাসনা চরিতার্থ করবার উপায় পেলেন না। এদিকে একজন কাষ্ঠব্যবসায়ী তাঁকে চাক্‌রী দেবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

কাঠের কারবারে নাম্‌লেন যোগেশবাবু। কাঠের মিস্ত্রীর কাজ শিখ্‌তে এক বৎসর লেগে গেল; নানারকম কাঠের ফারনিচার তৈরী, কাঠ চেনা,—দরদস্তুর ইত্যাদি কাজে আশাতীত অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলেন। নিজে কাঠের আস্‌বাবের এক কারখানা খুল্‌লেন। হঠাৎ এক শুভ মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর দেখা হয়ে গেল জোড়াসাঁকো বাড়িতে। এদিকে যোগেশবাবু রবীন্দ্রনাথের কবিতা ও সাহিত্য ও অন্যান্য লেখকের বহু গ্রন্থ অবসর সময়ে পড়ে ফেলেছেন। মাঝে মাঝে কবির সঙ্গে দেখা হয়; তাঁর শিলাইদহের তাঁতের কারখানার স্মৃতি মনে করিয়ে দেন যোগেশবাবু, কৃতজ্ঞতা ও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক আশীর্বাদ পেলেন নিজের ব্যবসায়ে কৃতিত্বের জন্যে। যোগেশবাবুর একমাত্র মন্ত্র—

"যদি তোর ডাক শুনে কেউ না আসে—
তবে এক্‌লা চলরে।"

এরপর অসাধারণ অধ্যবসায়, সততা ও পরিশ্রমে যোগেশবাবুর কাঠের কারবারে উত্তরোত্তর উন্নতি হতে লাগল। কলকাতার অনেক বিশিষ্ট নেতা ও কর্মীর সঙ্গে পরিচয় ঘনিষ্ঠ হল। শেষে ১৯৪০ সালে ১১শে এপ্রিল তিনি বর্তমান চিত্তরঞ্জন এ্যাভিনিউতে নিজস্ব ভবন নির্মাণ করলেন—ব্যবসায়ের প্রসারের জন্য। এই ভবনের উদ্বোধনের জন্য তিনি রবীন্দ্রনাথকে আমন্ত্রণ করতে শান্তিনিকেতন গেলেন এবং কবির অসুস্থতাসত্ত্বেও এই শুভানুষ্ঠানের উদ্বোধনে তাঁর সম্মতি পেলেন। সেই সময়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁর যৌবনকালের দেশের সংগঠন ব্রতের একজন কর্মী হিসাবে যোগেশবাবুকে আশীর্বাদ করেন ও তাঁর নূতন ট্রাস্ট হাউস, কলিকাতা ল্যাণ্ড ট্রাস্ট লিঃ ভবনের উদ্বোধন করেন বিশেষ সমারোহে। মহাকবির আশীর্বাদে ও পবিত্র করস্পর্শে যোগেশবাবুর এই প্রতিষ্ঠানটি কলিকাতা মহানগরীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রতিষ্ঠানে পরিণত হল। ট্রাস্ট হাউসের উদ্বোধন উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথের আশীর্বাণী সম্বল করে যোগেশবাবু আজ দেশের মধ্যে অন্যতম ব্যবসায়ে কৃতী সন্তানরূপে সুপরিচিত।*

যোগেশবাবুর বিবরণ থেকে বুঝা যায়, শিলাইদহে তাঁতের কারখানা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৫ সালের স্বদেশী আন্দোলন, বিদেশী বর্জন ও বয়কট আন্দোলনের দুই তিন বছর আগে। ঠাকুরবংশেই স্বাদেশিকতার প্রথম সূচনা লক্ষ্য করা যায় ১৮৬৭ সালের চৈত্রমেলা বা হিন্দুমেলায়। পরবর্তী কয়েক বছরে গণেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও ঠাকুরবংশের সন্তানগণের চেষ্টায় স্বদেশী আন্দোলনের বীজ নানাভাবে অঙ্কুরিত হতে থাকে। ঐ অঙ্কুর ন্যাশন্যালিজম্-এর সার পেয়ে পুষ্ট হতে থাকে। ১৮৮৪ সাল থেকে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের অদম্য উৎসাহ ও আত্মত্যাগে পাটের কারবার নীলের চাষ, ইংরেজ কোম্পানীর সঙ্গে পাল্লা দিয়ে জাহাজ চালানো (Flotila Co.) দেশলাই ও তাঁতের কারখানা, স্বদেশী শিল্পের দোকান প্রভৃতি হাতেকলমে স্বদেশী প্রচলনের ধারাবাহিক চেষ্টা চলতে থাকে। পরে ১৮৯৫ সালে ভারতের মুষ্টিমেয় কয়েকটি কাপড়ের কলের উপর নূতন নূতন করভারে ভারতের শিশু বস্ত্রশিল্পকে গলা টিপে মারবার চেষ্টা হয়। এজন্য দেশের তাঁতীদের সংঘবদ্ধ ও শিক্ষার্থী-সংগ্রহ করে উন্নত কুটীরশিল্প হিসাবে তাঁতশালা প্রতিষ্ঠা করলেন জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে। তখনও মোহিনীমোহন চক্রবর্তী কুষ্টিয়ায় মোহিনী মিল প্রতিষ্ঠা করেন নাই। জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সংগঠনী আদর্শে তাঁর হাতে-গড়া রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সুযোগ্য উত্তরসাধক।

*শ্রীযোগেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের মৌখিক বিবরণ অনুসারে লিখিত।

এসো কবি অখ্যাত জনের

অজ্ঞাতবাসের সঙ্গী

খুব ঘনিষ্ঠভাবে বাস্তব অনুভূতির সাক্ষাৎ না পেলে সাহিত্যশিল্পীরা সার্থক কথাসাহিত্য রচনা করতে পারেন না একথা সর্বজনস্বীকৃত। রবীন্দ্র-নাথের কাব্যেও এরকম বাস্তব চরিত্রের ছবি বড় কম নাই। কথা ও কাহিনীর পুরাতন ভৃত্য, দুই বিঘা জমি, বিসর্জন, দেবতার গ্রাস প্রভৃতিতে ও পলাতকা, খাপছাড়া এবং ছড়ার ছবির অনেক কবিতায় তাঁর সংবেদনশীল বাস্তব চরিত্র অধ্যয়নের অনেক নমুনা মেলে। তাঁর "গল্পগুচ্ছের" অনেক গল্পের নায়ক-নায়িকার সন্ধান বিশেষ অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যায়। কবির জীবনেতিহাসের প্রথম অধ্যায়ের অধিকাংশ কেটেছে তাঁর অজ্ঞাতবাসের নিভৃত পল্লীগুলিতে সেখানকার স্নিগ্ধ-শান্ত আবেষ্টনের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনেতিহাসে সহরবাসের সংবাদই বেশী মেলে; পল্লীবাসের বিবরণ বেশী না হলেও তাঁর পল্লীবাসের অভিজ্ঞতার ছাপ সুদূরপ্রসারী ও অনেক কাহিনী ও গল্পে সুস্পষ্ট।

গ্রামে গাঁথা বাংলার নিভৃত পল্লীপ্রকৃতির ক্রোড়ে পদ্মা, গোরাই, আত্রাই, ইছামতী, নাগর নদী ও চলন বিলের উপরে তিনি দীর্ঘকাল বজরায় বাস করেছেন। পদ্মাকে তিনি "সাক্ষী করি পশ্চিমের সূর্য অস্তমান, তোমারে সঁপিয়াছিনু আমার পরাণ" ব'লে সম্ভাষণ করেছেন। সে যেন তাঁর মানস-সুন্দরীর কাছে গোপন অভিসারের পালা; কোলাহলমুখরিত খ্যাতির প্রাঙ্গণ ছেড়ে, সহরবাসের উত্তাপ উত্তেজনা থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা অজ্ঞাতবাসের জীবন। প্রকৃতির স্নিগ্ধ ক্রোড়ে নিভৃত মানসলোকে বিজন সাধনা চলছিল। সেটা তাঁর বিশাল সাহিত্যসৃষ্টির প্রস্তুতি। "ছিন্নপত্রে" কবিমানসের ও মানবাদর্শের এই সঙ্গীহীন নিভৃত তপস্যার বিচিত্র অভিব্যক্তিগুলির পরিচয় পাওয়া যায়। গুরুগোবিন্দের বাণীর মধ্যেই নিজের এই দীর্ঘ অজ্ঞাতবাসের পরিচয় প্রচ্ছন্ন রেখেছেন,—যেন "দিবানিশি শুধু ব'সে ব'সে শোনা আপন মর্মবাণী"। সেখানকার "নীরব ভাবনা আর কর্মবিহীন বিজন সাধনায়" তাঁর অনেক কাল কেটেছে—দেশের নাড়ীর গভীর পরিচয়টি প্রাণভরে নেবার জন্য। সাধনার এই দিব্য উপলব্ধির সম্ভাবনা নগরীতে ছিল না। তাই অন্তরের রহস্যটি প্রকাশ করেছেন—

"এম্‌নি কেটেছে দ্বাদশ বরষ
আরো কতদিন হবে;
চারিদিক হ'তে অমর জীবন
বিন্দু বিন্দু করি আহরণ
আপনার মাঝে আপনারে আমি
পূর্ণ দেখিব কবে!"

কবে এই নিভৃত অজ্ঞাতবাস ছেড়ে সিদ্ধতাপস তাঁর স্বদেশকে ডেকে বলবেন—

"কবে প্রাণ খুলে বলিতে পারিব—'পেয়েছি আমার শেষ।'
আমার জীবনে লভিয়া জনম জাগো রে সকল দেশ।"

সেই দীর্ঘ নিভৃত অজ্ঞাতবাসে বসে তাঁর হৃদয়ের গোপন মর্মবাণীটি শুন্‌বার সময়ে যাঁরা তাঁর সঙ্গী ছিলেন,—যাঁদের সঙ্গে তাঁকে উঠতে বসতে হয়েছে, তাঁরা আদৌ সর্বজনমান্য কবি, সাহিত্যিক, দার্শনিক, রাজনীতিক ছিলেন না; তাঁরা ছিলেন নিরক্ষর সহজ সরল অতিসাধারণ গ্রাম্য নরনারী। তাঁদের মনোরাজ্যের খবর রবীন্দ্রনাথ্ রাখতেন তাঁদের অজ্ঞাতসারেই। তাঁরা শুধু পেতেন তাঁর সংবেদনশীল মনের খবরটিমাত্র। এইখানেই কবি অনুভব করেছেন—"জীবনে জীবনে যোগ করা. না হলে কৃত্রিম পণ্যে ব্যর্থ হয় গানের পসরা।" সেইখানেই কবি এই মহাসত্য আবিষ্কাব করেছেন—

"সে অন্তরময়,
অন্তর মিশালে তবে তার অন্তরের পরিচয়।"

এই সব পল্লীবাসী নরনারীর কাছ থেকে বিন্দু বিন্দু আহরণ করে কবি অমরজীবনের অধিকারী হয়েছেন। এদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কবির জীবনে কত বড় অমূল্য ধন তা বুঝবেন অনুভবী মানুষমাত্রেই। এঁদের অখ্যাত পরিচয় কেউ জান্‌বে না, কোন রবীন্দ্রজীবনীরচয়িতা এঁরা রবীন্দ্রমানসকে কতখানি ফুটিয়েছিলেন, তার উল্লেখ করবেন না; কারণ রাজার যুদ্ধজয়ের কাহিনী ছাড়া প্রজার বেদনা ও আত্মাহুতির কথা ইতিহাসের পাতায় স্থান পায় না। পল্লীর এই সমস্ত অখ্যাত বৈষ্ণব, বাউল, কবিয়াল, চাষী, গৃহস্থ, শিক্ষক—এদের নিভৃত সাহচর্য নব নব সাহিত্য, সঙ্গীত, শিল্পকলার অজস্র সৃষ্টি ও মানবতার সাধনায় রবীন্দ্রনাথের অবদানের মধ্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছে তা না জানলে রবীন্দ্রপ্রতিভার পূর্ণ দর্শনলাভ হতে পারে না। প্রকৃতির গোপন অন্তঃপুরের নানা ঐশ্বর্যে যাঁরা কবির সৃষ্টিকে মাধুর্যমণ্ডিত করেছিলেন তাঁদেরই স্মরণ করে বিশ্ব ভ্রমণ করে বিশ্বকবি গেয়েছিলেন—

"বহুদিন ধরে' বহু ক্রোশ দূরে
বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে
দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা
দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।
দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া
ঘর হ'তে শুধু দুই পা ফেলিয়া
একটি ধানের শিষের উপরে
একটি শিশির বিন্দু।" (৭ই পৌষ, ১৩৩৬)

যে মাটির গাছে গাছে রবীন্দ্রনাথ সারা জীবন ধরে অজস্র ফুল ফুটিয়ে গেছেন, সেই মাটি এ'রাই তৈরী করেছিলেন। হৃদয়ের আনন্দবেদনার রসে সেই মাটির সৃষ্টিশক্তি এ'রাই এনে দিয়েছিলেন। এ'দের মধ্যে অনেকে রবীন্দ্রসাহিত্যের মধ্যেই আত্মগোপন করে আছেন। যে কয়জন এইরকম পল্লীর নরনারীর কথা বলব, তাঁদের নিবিড় সান্নিধ্য কবির অন্তরের কত গভীরে প্রবেশ করেছিল তা এ'দের কাহিনী থেকেই বোঝা যাবে। পল্লবগ্রাহী মানুষ হয়তো এ'দের আমলই দিত না, কিন্তু স্রষ্টার মন এ'দের নিভৃত অন্তরের পরিচয়ে অপূর্ব প্রেরণায় ভরে উঠেছিল। আমার স্মৃতিলোক থেকে টেনে এনে এই কয়জন অখ্যাত মানবমানবীকে বিশাল রবীন্দ্রসাহিত্যের দরবারের এককোণে বসিয়ে দিলাম সসঙ্কোচে; অনুভবী পাঠক এ'দের প্রতিও একটু শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন।

১। **সর্বখেপী**—এক রহস্যময়ী নারী চরিত্রের সৃষ্টি হয়েছে রবীন্দ্রনাথের "গল্পগুচ্ছে" 'বোষ্টমী' গল্পে। গেরুয়া শাড়ি পরে এক আঁচল ফুল নিয়ে এই বৈষ্ণবী দুপুরবেলা খঞ্জনী বাজিয়ে যখন মাঠের আল দিয়ে "গৌর গৌর" গান গেয়ে যেতেন, তখন প্রায়ই আমার সঙ্গে দেখা হ'ত। এই পরিচয়হীনা বৈষ্ণবীটির সঙ্গে অভিজাত জমিদার রবীন্দ্রনাথের যে ঘনিষ্ঠতা দেখেছি, তাতে আশ্চর্য হবারই কথা। আমরা এর নাম সর্বখেপী বলেই জানতাম; রবীন্দ্রনাথ গল্পে এ'র নাম দিয়েছেন 'আনন্দী'। এ'র প্রকৃত জীবন কাহিনী হয়তো রবীন্দ্রনাথই জানতেন, আমরা জানতাম না। এ'র যৌবনের অপূর্ব কাহিনী যা রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন তা হয়তো কবির কল্পনাপ্রসূত। কারণ সে বিষয় সর্বখেপী কাউকেই কিছু বলতেন না। আমরা তাঁর প্রৌঢ় জীবনের সঙ্গেই পরিচিত। সে কাহিনীটুকুও অপূর্ব ও অদ্ভুত। গ্রামের ভদ্রপাড়ায় ইনি কারও সঙ্গে মিশতে পারতেন না, কারণ এ'র সহজিয়া ধর্মমত ও ক্রিয়াকাণ্ড আমাদের গ্রামের ভদ্রসমাজের অসহ্য ছিল। এ'র গুরু কে ছিলেন তাও জানতাম না; তবে ঐ

অঞ্চলে এ'র বারো-চৌদ্দজন শিষ্য ছিল তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে। ইনি হঠাৎ কবে যেন শিলাইদহে এসে বসাকদের এ'দো পুকুরের ধারে জঙ্গলের মধ্যে এক বিশাল তমালগাছের তলায় কুটীর বাঁধলেন, সকাল-বিকাল নামগান করেন খঞ্জরী বাজিয়ে, শিষ্যদের সঙ্গে আলাপ করেন। কিছুদিন পরে তাঁর বাড়ীর সামনে জঙ্গল পরিষ্কার করে অষ্টপ্রহর মহোৎসবের অনুষ্ঠান করেন, পার্শ্ববর্তী কয়েকখানা গ্রামের অনেক বৈষ্ণব-বৈষ্ণবী দলবল নিয়ে ঐ মহোৎসবে কীর্তন গেয়েছিলেন; মহোৎসবের ভুরিভোজনও সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। গ্রামের ভদ্রসমাজ এ নিয়ে খুব জল্পনা-কল্পনা আরম্ভ করেন, "খ্যাপাখেপীর কান্ড,—ভিক্ষে করে খায়, এত টাকা পায় কোথায়?" তাঁরা একেবারে খেপীকে গ্রামছাড়া করে তবে ছাড়লেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এ'র গভীর অন্তরঙ্গতায় এ'রা খুব মাথা ঘামান। খেপী তখন জাহেদপুর গ্রামে তাঁর এক শিষ্যের জমিতে নিজ আশ্রম নির্মাণ করেন,—সেখানেও দিবারাত্রি কীর্তনানন্দ। শিষ্যসংখ্যাও ক্রমে বেড়ে যেতে থাকে। জনসাধারণের বিশ্বাস, রবীন্দ্রনাথ এ'র জীবিকানির্বাহের জন্য নাকি কুড়ি-বাইশ বিঘা জমি দিয়েছিলেন বিনা নজরে। জাহেদ্‌পুরে এ'র আশ্রমের উপরেও আমাদের গ্রামের সমাজ-পতিদের খরদৃষ্টি পড়ে। তাঁদের অনেক কৌশলে খেপী তাঁর জাহেদপুরের কুটীরও তুলে দিয়ে জানিপুর গ্রামে চলে যান। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে থাকাকালে ইনি দু'বেলা শিলাইদহ কুঠীরবাড়ীতে যেতেন এবং তাঁর পাতের প্রসাদ পেতেন। এইসব বর্ণনা 'বোষ্টমী' গল্পের সঙ্গে হুবহু মেলে। ইনি ফুল ভালবাসতেন, সব সময়েই এ'র গেরুয়া আঁচলে দেখতাম একরাশ গন্ধরাজ ফুল; এ'র আশ্রমেও চমৎকার ফুলের বাগান ছিল। কারও বাগানে ফোটা ফুল দেখলেই সেই ফুল তুলে নিয়ে আঁচল ভরতেন। ফুলের মালা গে'থে নিয়ে যেতেন কুঠীবাড়ীতে রবীন্দ্রনাথের জন্য। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উঠলেই ইনি ভক্তিতে "গৌর গৌর" বলে মাথায় হাত ঠেকিয়ে প্রণাম করতেন, আবার গুন্‌গুনিয়ে গাইতেন—"গৌরসুন্দর মোর"। আমাকে ইনি খুব ভালবাসতেন; আমি তখন এগারো-বারো বছরের বালক। আমায় কোলে করতেন, খাওয়াতেন। আমার টো টো করে ঘোরা অভ্যাস ছিল; এ'র সস্নেহ ব্যবহারে মুগ্ধ হয়ে যেতাম; বাড়ীর অভিভাবকদের শাসনের মধ্যেও সুযোগ পেলেই এ'র সেই তমালতলার কুটীরে চলে যেতাম। সকলে বলত—"খেপী জাদু জানে, খবরদার ওর কাছে যাস্‌নে।" আমি খেপীকে "বাবুমশায়ের" কাছে নিয়ে যাবার জন্য খুব ধরতাম। বলতেন "নিয়ে যাব একদিন, কিন্তু টের পেলে বিহারী বাবু আমাকে লাঠিপেটা করবে।" আমার সঙ্গেও কথা বলতেন স্নেহগদগদভাবে গানে—'ওরে ও কালসোনা'।

জাহেদপুর থেকে চলে যাবার পর আমরা কেউ আর তাঁর কোন সন্ধান পাইনি। সে সময় এ'র বয়স আন্দাজ পঞ্চান্ন।

২। **শিবনাথ সাহা**—এ'র বাড়ী ঠাকুর জমিদারীর কমলাপুর গ্রামে বিখ্যাত গঞ্জ জানিপুরের (খোক্সা স্টেশন) পূর্বে গোরাই নদীর তীরে। এককালে মনোহরসাঁই কীর্তনগানে ইনি ঐ অঞ্চল মাতিয়ে তুলেছিলেন। যৌবনে রবীন্দ্রনাথ জানিপুর মহাল পরিদর্শনে গেলে স্থানীয় জনসাধারণ মহাসমারোহে তাঁর অভ্যর্থনা করেন। ঐ সভায় প্রশস্তি পাঠ, বক্তৃতাদি ছাড়াও শিবু সা'র কীর্তন হয়। তখনই রবীন্দ্রনাথ শিবু সা'র কীর্তনের উপর আকৃষ্ট হন। সে সময়ে বামাচরণ বসু ঠাকুর এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন; তিনি ছিলেন সুপণ্ডিত, পরম বৈষ্ণব ও বিচক্ষণ ম্যানেজার। ঐদিন রাত্রে বামাচরণবাবু ও শিবু সা'র সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে 'বৈষ্ণব রসতত্ত্ব' ও ভক্তিশাস্ত্র নিয়ে আলোচনা হয়। জানিপুরে গেলেই রবীন্দ্রনাথ শিবু সা'কে ডাকিয়ে এনে কীর্তন শুনতেন। শিলাইদহ কাছারীতে প্রতি বছর পুণ্যাহ ও অন্যান্য অনুষ্ঠানে শিবু সা'র কীর্তন গান হত। রবীন্দ্রনাথ এ'কে বিনা নজরে অনেক জমি বন্দোবস্ত দেন। শিবু সা'র কীর্তন সে সময় হিন্দুদের যাবতীয় অনুষ্ঠানের অঙ্গ হয়ে দেশময় কীর্তনানন্দ বিতরণ করে। গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মাতৃ-বিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথ সদলবলে শিবু সাহাকে কলকাতা ঠাকুর ভবনে নিয়ে আসেন। গগনেন্দ্রনাথ ও ঠাকুর পরিবারের সকলেই শিবু সা'র কীর্তন গানে মুগ্ধ হন। স্বর্গীয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের বাড়ীতে শিবু সাহা বহুবার কীর্তন গান করেন। তার পরে মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর গৃহে, নাটোর ও পাইক-পাড়ার রাজবাড়ীতে কীর্তন গেয়ে শিবু সাহা কলিকাতাবাসী অভিজাতবর্গকে মুগ্ধ করেন। সমস্ত বঙ্গদেশে এ'র খ্যাতি রটে যায়। স্বর্গত দীনেশচন্দ্র সেন ১০।১২ বছর পূর্বেকার আনন্দবাজার পত্রিকায় "কলিকাতায় কীর্তনের আদর" নামে এক প্রবন্ধে এ'র বিস্তারিত পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত "মুক্তাচুরি" গ্রন্থেও এ'র উল্লেখ আছে। এমন একদিন ছিল যেদিন শিবু সা'র অপূর্ব কীর্তনানন্দে বাঙলার আকাশবাতাস মুখরিত হত। এ'র ফুলমালাশোভিত সুঠাম দেহে কীর্তনানন্দের যে সুমধুর অভিব্যক্তি প্রকাশিত হ'ত তা এখনও আমাদের কানের ও চোখের ভিতর দিয়া রসপ্রবাহের সৃষ্টি করে।

৩। **বামাচরণ বসু**—ইনি যখন রবীন্দ্রনাথের এস্টেটের ম্যানেজার ছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ পুরাদস্তুর জমিদার। ক্ষুরধার বৈষয়িক বুদ্ধি ও প্রবীণতার সঙ্গে আধুনিক শিক্ষা ও বৈষ্ণবশাস্ত্রজ্ঞানের অসাধারণ মিলন এ'কে রবীন্দ্রনাথের

নিবিড় সান্নিধ্যে এনে দেয়। শিলাইদহ কাছারীতে একবার পদকীর্তনের আসরে ইনি স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ, জগদীশচন্দ্র ও নাটোররাজ জগদিন্দ্রনাথকে কীর্তন শোনান। শ্রীরাধার বিরহের বিশেষ বিশেষ অবস্থা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ এঁকে অনেক কঠিন প্রশ্ন করেন; ইনি বহু বৈষ্ণব গ্রন্থের সহায়তায় তাঁর সমস্ত প্রশ্নের সদুত্তর দেন। কবির সেই সময়কার অধিকাংশ কবিতা ছিল এঁর কণ্ঠস্থ। ইনি "ভানু সিংহের পদাবলীর" অনেক গান নিজে গাইতেন। এঁর আমলে শিলাইদহ সদর কাছারীতে প্রতি সপ্তাহে পদকীর্তনের আলাপ হত এবং শিবু সাহা ও অন্যান্য শ্রেষ্ঠ কীর্তনীয়াদের ইনি আমন্ত্রণ করে আনতেন। বৈষ্ণব সাহিত্যের কয়েকখানা গ্রন্থও ইনি লিখেছিলেন। গ্রামে নগরসংকীর্তন বের হলে ইনি ম্যানেজারের পদমর্যাদা ভুলে দলের পুরোভাগে নৃত্যগীতে মেতে উঠতেন। এঁর আমলে জমিদারীর অনেক বিষয়ে উন্নতি হয়। সেই সময়ে ঠাকুর এস্টেটে খাজনা বৃদ্ধির (নিরিখ বৃদ্ধি) কঠিন সমস্যাকে কার্যে পরিণত করে ইনি রবীন্দ্রনাথের হাত থেকে সোনার ঘড়িচেন উপহার পান; কিন্তু কিছুদিন প্রজাসাধারণের কাছে অপ্রিয় হন। পরে ইনি মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র নন্দীর জমিদারীর ম্যানেজার হয়ে সুবিখ্যাত বৈষ্ণব জমিদারের সান্নিধ্যলাভ করে বহুদিন যশের সঙ্গে কাজ করেন। এঁর এক পুত্র (নলিনী-মোহন বসু) দীর্ঘকাল অবিভক্ত বাংলার ডেপুটী ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। বৈষ্ণব-শাস্ত্র অনুশীলনের জন্য ইনি কয়েকটি আশ্রমও রচনা করেছিলেন।

৪। **সন্তোষকুমার রায়**—ইনি শিলাইদহ (খোরসেদপুরে) মধ্যইংরেজী স্কুলের পণ্ডিত ছিলেন। অল্পবিদ্যা গ্রাম্য পাঠশালার পণ্ডিত হলেও সন্তোষ পণ্ডিত বাঙলা গদ্য পদ্য রচনায় ক্ষিপ্র ও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। বিবাহের প্রীতি-উপহার ও বিদায়-অভিনন্দনাদি ইনি যে কত লিখেছেন তার ইয়ত্তা নেই। আশপাশের বহু গ্রামের লোক এঁর কাছে 'বিয়ের পদ্য' 'শোকোচ্ছ্বাসা'দি লেখাতে আসতেন। ইনি রবীন্দ্রনাথের জমিদারীতে 'অভিষেক' উৎসবের সময়ে স্বরচিত চমৎকার একটি কবিতা পাঠ করেন। রবীন্দ্রনাথ ঐ অখ্যাত পল্লীকবির কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হন। সেই থেকে ইনি প্রায়ই স্বরচিত লেখা রবীন্দ্রনাথকে দেখাতেন এবং সংশোধিত করে নিতেন আর সেই সংশোধিত খাতা বন্ধুবান্ধবদের গর্বের সহিত দেখাতেন। শিলাইদহে ইনি একটি ক্ষুদ্র সাহিত্যগোষ্ঠী সৃষ্টি করেন। শিলাইদহ কাছারীর কর্মচারী হরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়* ও খোরসেদপুর স্কুলের হেডমাষ্টার সতীশচন্দ্র অধিকারী

*এঁর পুত্র শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় সুলেখক ও গ্রন্থকার।

(আমার দাদা) ঐ গোষ্ঠীর অন্যতম ছিলেন। এই সাহিত্যগোষ্ঠীর সভ্যেরা সন্তোষবাবু ও হরেন্দ্রবাবুকে “কবিরঞ্জন” উপাধি দিয়ে এই উপাধি রবীন্দ্রনাথের অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করেন। আমি সন্তোষ পণ্ডিত মশাইয়ের ছাত্র ছিলাম। সে সময়কার বাঙলা গদ্য পদ্য রচনার বাল্যাবস্থাতেও এঁর রচনাশক্তির খ্যাতি ছিল খুব। ইনি প্রথম হেডমাষ্টারের যে বিদায়-অভিনন্দনের কবিতা রচনা করেন তার প্রথম ক'টি লাইনের নমুনা দিচ্ছি—

“অকস্মাৎ একি শুনি ভীষণ বারতা,
পশিল শ্রবণ-পথে অশনি সমান,
নাশিল কায়িক বল প্রাণের ধীরতা
দহিল আশার বাসা অঙ্গার প্রমাণ।”

এঁরই চেষ্টায় ঐ অঞ্চলের কয়েকজন মরমী কবির (গোঁসাই গোপাল জোয়ারদার) তত্ত্বসঙ্গীত ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়। ইনি ক্লাসে এসে বাঙলা রচনার দিকে খুব বেশী মনোযোগ দিতেন। বলতেন, যে কোনও বিষয়ে রচনা লিখতে হলেই আগে ভগবান স্মরণ করা প্রয়োজন। তার নমুনা—“পরমপিতা পরমেশ্বরসৃষ্ট এই বিশাল জগতীতলে মানুষকে তিনি যতগুলি গুণে বিভূষিত করেছেন, তাহার মধ্যে ক্ষমাগুণই শ্রেষ্ঠ।” এটা হল ‘ক্ষমা’র উপরে রচনা। আমরা তাই যে কোন রচনাতেই পরমপিতা পরমেশ্বরের প্রশস্তি দিয়ে আরম্ভ করতাম, তা না হলে রচনা জাতে উঠত না। ইনি যেমন স্নেহময় ছাত্রহিতার্থী ছিলেন তেমনি বেত মারায় ছিলেন সিদ্ধহস্ত। রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে ইনি দাড়ি রেখেছিলেন,—রবীন্দ্রনাথের কবিতা ছিল এঁর মুখস্থ। এঁর বাড়ী ছিল জানিপুরের নিকট গোরাই নদীর পর পারে আজইল গ্রামে।

৫। **রামগতি জোয়ারদার**—শিলাইদহের একজন বর্ধিষ্ণু ধনী ব্রাহ্মণ। ইনি প্রায়ই থাকতেন কলকাতায়, একটা পাটের আপিসের ছিলেন বড়বাবু। বহু আত্মীয়স্বজন ইনি প্রতিপালন করতেন। ইনি ছিলেন কবির লড়াইয়ের একজন নিষ্ঠাবান ভক্ত। তখনকার এঁর পরিচালিত শিলাইদহের কবির দলের খুব নাম ছিল, এর জন্য অজস্র ব্যয় করতেন। কুমারখালি দলের কবিয়াল ছিলেন ‘দধি মাষ্টার’ নামে একজন বিখ্যাত সঙ্গীতরচয়িতা। একবার এঁরই বাড়ীতে এই দুই দলে কবির লড়াইয়ের বিরাট আয়োজন হয় এবং রবীন্দ্রনাথ বিশেষভাবে শ্রোতা হিসাবে আমন্ত্রিত হন, কিন্তু বিশেষ কাজে কলকাতা চলে আসতে হয় বলে ঐ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারেননি। শুনেছি, ঐ কবির লড়াইয়ে নামজাদা কবিয়াল দধিমাষ্টর পরাজিত হন এবং জয়গৌরবে শিলাইদহ কুঠীবাড়ীতে এক সঙ্গীতোৎসব হয় রবীন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে।

সন্তোষ পণ্ডিত, হরেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ম্যানেজার বামাচরণবাবু, আমার পিতা সুরেন্দ্রনাথ অধিকরী এই অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেছিলেন। এঁদের "সখী-সংবাদের" দলও প্রসিদ্ধি লাভ করে। পরে এঁদের চেষ্টায় একটা যাত্রার দল গড়ে ওঠে।

৬। গগনচন্দ্র দাম—

"আমার মনের মানুষ যে রে, আমি কোথায় পাব তারে।
হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশবিদেশে বেড়াই ঘুরে।
কোথায় পাব তারে।"

এই বিখ্যাত মরমী গানের রচয়িতা গগন দাম ছিলেন জাতিতে কায়স্থ। এঁর রচিত আরও বহু তত্ত্বসংগীত আছে; কিন্তু সেগুলি অনেকেরই অজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথ "হারামণিতে" (প্রবাসী) এঁর কয়েকটা গান সংগ্রহ করে প্রকাশ করেছিলেন। ইনি ছিলেন শিলাইদহ পোষ্টাপিসের পিওন। তাই "গগন হরকরা" নামেই ইনি বেশী পরিচিত ছিলেন। পোষ্টাপিসের চিঠি বিলির কাজে গাঁয়ে গাঁয়ে এঁকে ঘুরতে হত। সে সময় মাঠের মধ্যে, নদীতীরে ইনি প্রাণের আনন্দে মরমী সঙ্গীত গেয়ে শান্ত প্রকৃতিকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করে দিতেন, পল্লীর কুটীরে কুটীরে রসতরঙ্গ জেগে উঠত। চিঠি বিলি করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের কাছে প্রায় প্রত্যহই এঁকে যেতে হত, সেখানে চলত রসালাপ,—গানের পর গান,—সুরতরঙ্গ। অনেকদিন সন্ধ্যার পর নির্জনে বোটের ছাদে বসে রবীন্দ্রনাথ এঁর গীতসুধা পান করতেন। ইনি আমার পিতার (সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী) অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। পিতা যখন যাত্রার দল ভেঙ্গে থিয়েটারের দল করলেন, তখন তাঁরই অনুরোধে গগনকে সম্প্রদায়ের সঙ্গীতাচার্য হতে হয়। গগন গান নিয়েই মশগুল থাকতেন। পিতা ধরে বসলেন, "গগন শুধু গান নিয়ে থাকলে চলবে না, তোমায় একটা পার্ট করতে হবে।" গগন কিছুতেই রাজী নন, শেষে অনেক অনুরোধে "প্রহ্লাদচরিত্রে" নরসিংহের পার্ট গ্রহণ করলেন। পিতা বললেন—"তোমায় কথাবার্তা কিছু বলতে হবে না, তোমাকে ভীষণাকার নরসিংহ সাজিয়ে দেব। হিরণ্যকশিপু বেশে আমি যখন পিস্‌বোর্ডের স্তম্ভে ঘা মারব, তখন তুমি বিকট শব্দ করে অট্টহাস্যে আমাকে কোলের উপর ফেলে, পেটের উপরকার পোষাক ছিঁড়ে রং-লাগানো ন্যাকড়াগুলো টেনে বের করে মুখে পুরবে।" গগন রাজী হয়েছিলেন এবং তাঁর অভিনয়ও নাকি খুব হৃদয়গ্রাহী হয়েছিল। এঁর বাড়ীর আমবাগান ছিল বিখ্যাত। এঁর মৃত্যুর পর এঁর বংশধরগণ অত্যন্ত দরিদ্র হয়ে পড়েন। ইনি মুখে মুখে গান বাঁধতেন, আমার পিতা সেগুলি লিখে রাখতেন। সে লেখার কোন সন্ধান পাই নাই।

৭। **অছিমদ্দি সর্দার**—এ লোকটি রবীন্দ্রনাথের চর অঞ্চলের (রাধাকান্ত-পুরের) একজন মুসলমান প্রজা। লোকটি অশিক্ষিত, কবির দলের সর্দার। এর গানের কোনই বিশেষত্ব ছিল না; উতোর চাপান সবই নিম্নস্তরের, কিন্তু লোকটা ছিল চমৎকার গাল্পিক। ঘণ্টার পর ঘণ্টা রবীন্দ্রনাথ হাঁ করে অছিমদ্দির গল্প শুনতেন; এর গল্পের নিষ্ঠাবান শ্রোতা একমাত্র রবীন্দ্রনাথ। এইটেই ছিল আশ্চর্য। রবীন্দ্রনাথ যখন কিছুদিন ধরে চরের উপর বোট লাগিয়ে সাহিত্যসাধনায় নিমগ্ন থাকতেন, তখনই প্রায় প্রতি সন্ধ্যায় অছিমদ্দি এসে জুটত বোটে, আর বিনা বাধায় অবিরাম বকে যেত। এর গল্পের মধ্যে রবীন্দ্র-নাথ কী পেয়েছিলেন, তিনিই জানতেন; অশিক্ষিত চরের চাষী কি মন্ত্রবলে যে কবিকে এতক্ষণ ধরে মুগ্ধ করে রাখত, সে একটা প্রহেলিকা বটে। রবীন্দ্রনাথ তাকে প্রশ্নও করতেন অনেক, আর অছিমদ্দি জবাবের পর জবাব দিয়ে তার গল্পের ভাণ্ডার খুলে দিত। নমুনাটা এইরকম—"দেখুন হুজুর, ম্যানেজার-বাবু আমার পর "অনুরাগ" করে আমার এতদিনের চষা জমিটার জন্যে নালিশ করে বসলেন, ব্যাটাপুৎ না খেয়ে মরে, তাই কি হুজুরের এলাকা ছেড়ে যাব? করলাম হুজুরে দরখাস্ত; তাইতো হুজুর 'এনছাপ্' করে দিলেন। আল্লার কুদর্‌তে অছিমদ্দি সদ্দার কাউকে ডরায় না।" শুনতে পাই অছিমদ্দি আমলা-বাবুদের গুহ্য কথা বাবুমশাইকে প্রকাশ করে দিত। অথচ বাবুমশাই অছিমদ্দির গল্পের ভক্ত। অছিমদ্দির ভাই আফাজদ্দি মাঝে মাঝে বোটে এসে কবিকে গান শোনাত। সে পরে জারী গানের দল গড়ে এবং অছিমদ্দি চর মহালের বরকন্দাজের পদ পায়। আমলারা কিন্তু অছিমদ্দিকে খুব সমীহ করে চলতেন।

৮। **মৌলবী কামালউদ্দিন**—এঁর সম্বন্ধে একটা কৌতুকপ্রদ গল্প আমি লিখেছি। ইনি সেকালের শিলাইদহ জমিদারীতে "মৌলবী সাহেব" নামেই সুবিখ্যাত। ইনি বাঙালী নন, পাঞ্জাবী মুসলমান, সুদর্শন, সুবক্তা ও পার্শিতে সুপণ্ডিত, প্রায়ই পার্শি বয়েৎ ঝাড়তেন। বাঙলাদেশে কি কারণে তিনি সপরিবারে বাস করতেন, তার কারণ অজ্ঞাত। রবীন্দ্রনাথ এঁর খুব গুণগ্রাহী ছিলেন। অনেক কাজে এঁকে ডাকতেন, পরামর্শ নিতেন, পার্শি-কবিদের বাণী শুনতেন। কালক্রমে ইনি নানা কাজে রবীন্দ্রনাথের অপ্রীতিভাজন হয়ে পড়েন, কারণ এঁর ক্ষমতাপ্রিয়তা জনসাধারণের অসন্তোষের কারণ হয় এবং রবীন্দ্রনাথও এঁকে শূন্যগর্ভ মৌলবী বলে জানতে পারেন। অনেক কাজেই ইনি অন্যায় হস্তক্ষেপ করতেন রবীন্দ্রনাথের গুণগ্রাহিতার খাতিরে। কিছুদিন পরে শিলাইদহেই এঁর স্ত্রীবিয়োগ হয় এবং তিনি স্বদেশে চলে যান। সে

সময়টা ১৮৯১ সাল। এঁর উপরে কবি অনেকবার বিরক্তি প্রকাশ করেছেন। 'ছিন্নপত্র' দ্রষ্টব্য।

৯। মেছের সর্দার—বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে যখন শক্তিচর্চা ও আত্মরক্ষার জন্য দেশময় সাড়া জেগেছিল, সেই সময় এই অদ্ভুত-চরিত্র মুসলমান লাঠিয়ালকে রবীন্দ্রনাথ আবিষ্কার করেন তাঁর জমিদারী কুমারখালীর অন্তর্গত খয়েরচারা গ্রাম থেকে।

মেছের সর্দারের কাহিনী পৃথকভাবে পরে বল্‌ছি।

১০। সধরচাঁদ সন্ন্যাসী—ইনি প্রথমে ছিলেন বৈষ্ণব। পরে হয়ে যান সহজিয়া ভাবের ভাবুক। এঁর গৃহস্থাশ্রমের নাম সতীশচন্দ্র সরকার। বিভিন্ন মত নিয়ে ইনি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং শেষে রবীন্দ্রনাথের ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে বহুবার তাঁর উপদেশ গ্রহণ করেন। "বৈরাগ্য-সাধনে মুক্তি সে আমার নয়"—রবীন্দ্রনাথের এই অপূর্ব কবিতায় এঁর ধর্মবিশ্বাস এক নূতন খাতে বইতে থাকে। ইনি পল্লীতে এবং কলকাতাতেও আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন এবং জনসাধারণের মধ্যে কীর্তন শিক্ষার নানা আয়োজন করেন। "রসরাজ" নামে একখানি মাসিক পত্রিকাও ইনি বহুদিন পরিচালনা করেন। ইনি বহু দেশ পর্যটন করে ধর্মমত সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করেন। শেষে এঁর ধর্মমতের কোন স্থিরতা ছিল না। আশ্রম চালাবার জন্য অর্থভিক্ষায় ইনি বাঙলার নেতাদের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ান। এঁর শেষ জীবনের কোন সংবাদই আমাদের জানা নাই।

১১। সাধনচন্দ্র সন্ন্যাসী—এঁর বাড়ী রবীন্দ্রনাথের জমিদারীভুক্ত জানিপুরের মধ্যে দশকাহনিয়া গ্রামে। ইনি অনেক সময়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন ও দীর্ঘকাল তাঁর সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন। ইনি জাতিতে কাপালী এবং সমৃদ্ধ গৃহস্থ ছিলেন। ইনি সুরসিক ও সুপণ্ডিত বলে সকলেরই শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন। এঁকে কখনও দেখি নাই, এবং এঁর অন্য কোন বিবরণও আমার জানা নাই।

১২। লালন সাঁই—

"আমি একদিনও না দেখিলাম তারে
আমার বাড়ীর কাছে আরসিনগর
তাতে এক পড়শী বসত করে।"

এইরকম বহু মরমী সঙ্গীতের মুর্ছনায় যিনি একদিন বাঙলার আকাশ-বাতাস মুখরিত করে রেখেছিলেন সেই লালন ফকিরের আস্তানা (আশ্রম) ছিল রবীন্দ্রনাথের জমিদারীর সীমানায় কুষ্ঠিয়ার উপকণ্ঠে গোরাই নদীতীরে

ছেঁউড়িয়া গ্রামে। লালন প্রথম জীবনে হিন্দু কায়স্থ ছিলেন, তাঁর নাম ছিল লালন চন্দ্র কর। বাড়ী কুষ্ঠিয়ার নিকটেই ভাঁড়ারা গ্রামে। ইনি ১১৬ বছর বয়সে দেহত্যাগ করেন। (১১৮১-১২৫৭ সাল)। এঁর জীবনকাহিনী উপন্যাসের মত। সে সময়ে রেল হয়নি। প্রথম যৌবনে ইনি বেরোন তীর্থ-ভ্রমণে শ্রীক্ষেত্রে। পথে বসন্তরোগে আক্রান্ত হলে এঁর সঙ্গীরা পরিত্যাগ করে চলে যান। সিরাজ সাঁই নামে একজন বিখ্যাত বাউল ফকির এঁকে কুড়িয়ে পান এবং পালন করেন। ইনি সেখানে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়ে মুসলমান ধর্মের মর্মকথা শিক্ষা করেন। কিছুকাল পরে স্বগ্রামে ফিরে এলে ইনি হিন্দুসমাজ ও আত্মীয়স্বজন থেকে পরিত্যক্ত হন। ইনি লেখাপড়া না জানলেও এঁর রচিত অসংখ্য মরমী, তত্ত্ব ও বাউল সঙ্গীতে হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মর্মকথা ধ্বনিত হয়েছে এবং জাতিভেদের ঊর্ধ্বে বিশ্বমানবতার মহিমা ও মানবধর্মের শ্রেষ্ঠ বিভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর পরিচয় ছিল কিনা তার বিশেষ বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রাচীনেরা বলেন,—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে এঁর আলাপ হয়েছিল, কিন্তু সেকথা বিশ্বাসযোগ্য নয়। তবে রবীন্দ্রনাথ এঁর রচিত অনেকগুলি সঙ্গীত সংগ্রহ করেন ও কিছু কিছু গান মাসিক পত্রিকাদিতে প্রকাশ করেন। তাঁর কাব্য রচনা ও রসসাধনায় বিখ্যাত লালন ফকিরের প্রভাব অনেক স্থানে সুস্পষ্ট। ছেঁউড়িয়াতে এঁর আস্তানায় কবিজমিদার একটি সমাধি-মন্দির তৈরী করে দেন।

১৩। **দ্বারিকানাথ মজুমদার**—ইনি রবীন্দ্রনাথের জমিদারীর কয়া গ্রামের একজন শিক্ষিত বর্ধিষ্ণু জোতদার। ইনি বহুকাল থেকে ঠাকুর এস্টেটে অনেক জমির মালিক ছিলেন, সেজন্য জমিদার সরকারে অনেক টাকা মালগুজারী করতে হত। এঁর পুত্র-পৌত্রাদিরা আছেন। এঁকে দেখি নাই। রবীন্দ্রনাথ 'ছিন্নপত্রে' এঁর এক সরস কৌতুহলোদ্দীপক বর্ণনা দিয়েছেন। সেইটি পড়লেই সকলে এঁর পরিচয় পাবেন। সেই পত্রেই মৌলবী সাহেব ও "একটি গেরুয়া-বসন ও তিলকধারী দীর্ঘশ্মশ্রু বিরলকেশ উচ্চললাট প্রসন্ন প্রশান্ত-মূর্তি ব্রাহ্মণের" চমৎকার বর্ণনা আছে, যা পড়ে হাস্য সংবরণ করা কঠিন। এইরকম অদ্ভুত-চরিত্র বহু প্রজার পাল্লায় তাঁকে পড়তে হত। সেই পত্রেই দ্বারিক মজুমদারের যে বর্ণনা আছে সেটি হুবহু তুলে দিলাম:

" * * সে বোটের বার হতে না হতে দ্বারী মজুমদার ব'লে এই বিরাহিমপুরের একটি সুবিখ্যাত বক্তা এসে উপস্থিত। আমি বক্ষের উপর দুই হস্ত আবদ্ধ করে চৌকিতে হেলান দিয়ে কঠিন প্রস্তরমূর্তির মত আড়ষ্ট হয়ে ব'সে রইলুম। সে প্রথমে আরম্ভ করে দিলে—মহারাজ, পুরাকালে যুধিষ্ঠিরের হিষ্টিরিয়া

(হিষ্ট্রি) পাঠ ক'রে অনেকেই অবিশ্বাস করে থাকেন। তাঁরা বলেন—এতদূর কি কখনও সম্ভব হতে পারে? কিন্তু এতকাল পরে আপনাকে চাক্ষুষ দেখে যুধিষ্ঠিরের কীর্তিকলাপের প্রতি তাঁদের সন্দেহভঞ্জন হয়েছে—এইরকমভাবে চললো। আমি তখন তাঁকে বললুম—এইবার তুমি কাচারীতে বিশ্রাম করোগে; সে বললে—আজ আর আমার বিশ্রাম কিসের! আজ কতদিন পরে হুজুরের দর্শন পেয়েছি; আজ প্রায় সাত-আট-ন'মাস অপেক্ষা করে অবশেষে শ্রীচরণ দেখতে পেলুম—দেখতে যে পাবো সে আশা কি আর ছিলো? বলতে বলতে তার কণ্ঠস্বর কম্পিত এবং রুদ্ধ হয়ে এল, বার বার শুষ্ক চক্ষু চাদরে মুছতে লাগলো,—ক্রমে তার প্রতি তার পূর্বপ্রভু জ্যোতিদাদার যে অসীম স্নেহ এবং বিশ্বাস ছিল তাই মনে পড়ে তার চিত্ত উত্তরোত্তর অধিকতর উদ্বেলিত হয়ে উঠতে লাগলো।...সে কি কাজ করেছিল, কি কি ঘটনা ঘটেছিল, তার মনিবরা কি কি কথা বলেছিল, এবং সে তার কি কি উত্তর দিয়েছিল, তার কোনটাই বাদ না দিয়ে সমস্তই আনুপূর্বিক বলে যেতে লাগলো। সূর্য অস্ত গেল, সন্ধ্যা হল, পাখীরা নীড়ে, গাভীরা গোষ্ঠে, চাষারা কুটীরে ফিরে গেল,—দ্বারী মজুমদার বোট থেকে নড়ে না। এমন সময় কুষ্ঠিয়া থেকে আর একটি দর্শন-প্রার্থী যখন এল, তখন সে "কাল প্রাতঃকালে" বাকি কথাগুলো বলতে আসবে ব'লে আমাকে সান্ত্বনা করে চলে গেল। এখনো সে আসেনি, কিন্তু তারই সমান বক্তা একজন এসে আমার পার্শ্ববর্তী বেঞ্চে বসে বক্তৃতার অবসর প্রতীক্ষায় আছেন।" —(শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবীকে শিলাইদহ থেকে লিখিত—৬ই জুলাই, ১৮৯৪ সালের চিঠি। বিশ্বভারতী পত্রিকা, বৈশাখ-আষাঢ়, ১৩৫২, পৃঃ ২২৬-২৭)

এইরকম অনেক অদ্ভুত প্রজার সরস বর্ণনা আছে তাঁর "ছিন্নপত্রে"। "দেবীযুদ্ধ" প্রণেতা শরৎচন্দ্র চৌধুরী রবীন্দ্রনাথের বিশেষ প্রিয়পাত্র ছিলেন। হিন্দুর শাস্ত্র ও দেবদেবী সম্বন্ধে তাঁর সঙ্গেও কবির আলোচনা চলত। জানিপুরের ডাক্তার শ্রীশরৎচন্দ্র চৌধুরীও রবীন্দ্রনাথকে স্বরচিত কবিতা শুনিয়েছেন এবং তাঁর জমিদারীর আমলাদের অন্যায় আচরণের জন্য অভিযোগও উপস্থিত করেছেন। কবিজমিদার যথাসাধ্য তার প্রতিকার করেছেন। মনুষ্যচরিত্রের ভালমন্দ, আনন্দবেদনা ও বিচিত্র সম্ভাবনার প্রত্যক্ষ অনুভূতি পাবার জন্য এই সমস্ত গ্রাম্য-চরিত্রের সংস্পর্শে আসবার তাঁর বিশেষ প্রয়োজন ছিল। অখ্যাত ব্যক্তিরা খ্যাতিমানদের দর্শনসৌভাগ্য থেকে চিরদিনই বঞ্চিত। কিন্তু জমিদারীর প্রজা সব সময়েই রবীন্দ্রনাথের দর্শন ও আলাপের সুযোগ পেয়েছে। সমাজের উপরতলা ও নীচেতলার সমস্ত শ্রেণীর লোকের

সঙ্গে তিনি মিশেছেন; নীচেতলার লোকদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় জমিদারীর পল্লী-পরিবেশের মধ্যেই ঘটেছে। তাদের মধ্যেকার বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ কয়েকজনের কথা যতটুকু জানি তাই বললাম। সমাজের স্তরে স্তরে অতি গভীরে যারা শিকড় গেড়েছে, সারা জীবন ধরে তাদের দুঃখ-সুখ, ভাল-মন্দ, আনন্দ-বেদনা, আশা-নিরাশা, জয়-পরাজয়, হাসি-কান্নার প্রতিটি মর্মকথা তাঁর সাহিত্যে ধ্বনিত হয়েছে। তিনি শুধু আনন্দলোকের কল্পনাবিহারী কবি নন। তাই পরম বিশ্বাসে বলেছেন—

"আমি পৃথিবীর কবি, যেথা তার যত ওঠে ধ্বনি
আমার বাঁশির সুরে সাড়া তার জাগিবে তখনি—।"

যিনি পৃথিবীর কবি, তাঁর কাছে পৃথিবীর ধূলিও মধুময়। এই ধূলির স্পর্শ তিনি সর্বাঙ্গে নিয়েছেন। সার্থক সফল জীবনের শেষ-প্রান্তে এসে বলেছেন—"তোমার ধূলির তিলক পরেছি ভালে",—এ সুগন্ধ চন্দনের তিলক নয়, উপেক্ষিত ধরণীর ধূলির তিলক। জীবনের সন্ধ্যাবেলায় শ্রান্ত ক্লান্তদেহে জীবন-প্রত্যুষের বহুদূরে ফেলে-আসা ঘণ্টাধ্বনি শুনে "শহরের অভ্রভেদী আত্মঘোষণার মুখরতা লুপ্ত হয়ে গেল" ফুটে উঠল

"এই সব উপেক্ষিত ছবি
জীবনের সর্বশেষ বিচ্ছেদবেদনা
দূরের ঘণ্টার রবে এনে দেয় মনে।"

কালী চক্রবর্ত্তী

গ্রামের প্রায় প্রান্তে এই অন্ধকার জঙ্গলের মধ্যে এলে প্রায় পঞ্চাশ বছর আগেকার একটা উজ্জ্বল ছবি মনের মধ্যে জেগে উঠে। মনে হয়, নন্দনকানন আজ শ্মশান হয়েছে। বাংলার আসল চেহারাখানিই তো এই। চোখে জল আসে, কবির সোনার বাংলার বন্দনা আজও কল্পনাতেই রয়ে গেছে,—সেই সুন্দর—

"অবারিত মাঠ, গগন ললাট চুমে তব পদধূলি
ছায়া-সুনিবিড় শান্তির নীড় ছোটো ছোটো গ্রামগুলি।"

ঐ যে ক'টা ফোত ভিটে, বড় বড় স্যাওড়া গাছের ছায়ায় দুর্ভেদ্য কাঁটার জঙ্গলে পালিয়ে আধুনিক সভ্যতা-রাক্ষসীর ভয়ে লুকিয়ে আছে,—ঐখানেই দেখেছি আনন্দের হাট, কত লোকজন, মণ্ডপে দীপান্বিতা কালীপূজার সমারোহ,—হৈ-চৈ, সত্যনারায়ণের পূজা, নিমন্ত্রণের ঘটা, হরিসংকীর্তণের "প্রেমানন্দে হরি বলরে ভাই," সেই নর্তনকুর্দন, আধ মণ বাতাসার হরির লুট. সকাল থেকে সারা রাত তামাকের ধোঁয়া। আর সবার উপরে বাড়ির কর্তা কালীকুমার চক্রবর্তীর চেহারাখানা যেন জ্যান্ত মানুষের মত চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। কালী চক্রবর্তী মশায়ের চেহারার হুবহু বর্ণনা দিচ্ছি। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় লর্ড ক্লাইভের ছবি সবাই দেখেছেন। লর্ড ক্লাইভ কালো বাঙালীর ঘরে জন্মালে তাঁকেই অবিকল কালী চক্রবর্তী বলা যেত।

লক্ষ্মীমন্ত গ্রাম্য জোতদার কালী চক্রবর্তী মশাই। অনেক খামার জমির-মালিক বাড়িতে চার-পাঁচখানা বড় বড় খড়ের আটচালা ঘর, —পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, নিকানো ধব্‌ধব করছে। প্রকাণ্ড গোলাঘর আর গোয়ালঘর; প্রায় ডজনখানেক গরুবাছুর। আউশধানের খড়ের দুই-তিনটী পর্বতপ্রমাণ পালা। বাড়ির চারধারে আম, কাঁঠাল, লিচু, সুপারী, নারকেল, পেয়ারা ইত্যাদি ফলের বাগান। পাশেই প্রকাণ্ড বাঁশের ঝাড় আর পুষ্করিণী। শান্ত সুখী পল্লীদুলাল। বাড়ির বৈঠকখানায় আর অন্দর মহলে দিবারাত্রি কলগুঞ্জন, যেন মা লক্ষ্মী নূপুর পায়ে সারা বাড়ি নেচে বেড়াচ্ছেন। প্রজাবর্গাৎ, যজমান, আত্মীয়, বন্ধুবান্ধব হরদম আসছে

যাচ্ছে, হরদম পানতামাক চলছে। মাত্র ত্রিশ বছর আগেকার সেই স্বর্গের ছবি—আজ শ্মশান।

চক্রবর্তী মশাই খুব বড় জোন্দার; আর তাঁর অসংখ্য যজমান। তিনি নিজে নিরক্ষর ছিলেন,—সংস্কৃত মন্ত্র ভালভাবে উচ্চারণ না করতে পারলেও পূজো পার্বন তিনি সবই জানতেন। অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত যজমানকুল তাঁর মুখের দাপটে, হাবেভাবে পাকা পুরোহিত ব'লে তাঁকে ভক্তিও করতো খুব। শিক্ষিত মহলে তিনি বড় একটা মিশতেন না,—মিশলেও তাঁর সঙ্গে শিক্ষিতদের ঝগড়া বেধে যেত। তা'হলেও অশিক্ষিত চক্রবর্তী মশাই কোন অন্যায় কথা ব'লে নিজের আদর্শের বা ধর্মের অপমান করতেন না।

ছেলেদের সঙ্গে ছিল তাঁর খুব ভাব। তাঁর নিজের কোন ছেলেমেয়ে ছিল না—তাই স্নেহের ক্ষুধা ছিল তাঁর প্রবল। আমরা আমাদের সমবয়সীর মতই তাঁর সঙ্গে গল্প করতাম। ভূতের গল্প, দৈত্যদানার কাণ্ডকারখানা ইত্যাদি অসম্ভব আজগুবী গল্প তিনি যে কত জানতেন, তার ইয়ত্তা নেই। আবার নিজের পুরোহিতগিরির গল্প ব'লে হাসতেনও খুব। তাঁর গল্প শোনবার জন্য আমাদের পুরস্কারের ব্যবস্থা ছিল প্রচুর। চিড়ে. মুড়কি মুড়ি, ঘনদুধ, কলা, নাড়ু, আমসত্ত, আচাব, সন্দেশ, বাতাসা—প্রচুরভাবে খেতাম—এই ছিল অমাদের বক্‌শিস্‌। তিনি পুরুষোচিত মোটা গলায় কথা বলতেন না। কেমন একটা অদ্ভুত মিহিসুরে ক্যান্‌ক্যান্‌ ক'রে কথা কইতেন। তাই তাঁর হাসির গল্প শুনলে হাসতে হাসতে পেটে খিল ধ'রে যেত।

একবার চক্রবর্তী-মশাই পূজোর জন্যে খুব বড় মণ্ডপ তৈরি করবেন,—বড চৌ-চালাঘর হবে এইটি তাঁর ইচ্ছা। ঘরখানা তৈরি করার খরচ তিনি তাঁর যজমানদের কাছ থেকেই আদায় করবেন এই মতলব তাঁর। কারণ পুরুত-ঠাকুরের পূজোর মণ্ডপঘর তৈরির খরচ দিতে তো যজমানেরা ধর্মত বাধ্য। ঠিক এই সময়ে দ্বারিগ্রামের একজন নামজাদা ধনী কুরি-প্রামাণিক যজমান পুকুর তৈরি ক'রে জলাশয় প্রতিষ্ঠার পূজার্চনার ব্যবস্থার জন্য চক্রবর্তী-মহাশয়ের কাছে হাজির। চক্রবর্তী এ সুযাগ ছাড়লেন না। বাড়ির ভেতর থেকে দুই-চারখানা পুঁথি এনে তার পাতাগুলো কয়েকবার উল্‌টিয়ে খুব গম্ভীরভাবে অল্প একটু হেসে গাম্ভীর্যটাকে মোলায়েম ক'রে নিয়ে বললেন,—"বাবা, জলদান অতি পুণ্যকার্য,—এর চেয়ে পুণ্য আর নেই,—পরকালে সপরিবারে স্বর্গবাস,—শাস্ত্রে লিখেছে। এত বড় পুণ্য সঞ্চয় সবাই করতে পারে না। তবে কি জানো,—মা বসুমতী কিন্তু এতে খুব রেগে যাবেন, কারণ তুমি তাঁর বুক খাবলে খানিক মাংস তুলে নিয়েছ। তবে এতে বরুণ

দেবতা, ইন্দির দেবতা আর মা গঙ্গা খুব খুশি হয়ে থাকেন। মা বসুমতীকে তুষ্ট করতেই হবে কারণ তিনিই আমাদের আসল মা—তিনি ধানপান দিয়ে আমাদের বাঁচাচ্ছেন। এক কাজ করো গে,—সমস্ত পুকুরটা জুড়ে একটা সামিয়ানা খাটাতে হবে, তাতে একশো দেড়শো খুব ভাল মোটা হিঁড়পাকা বড় বাঁশ লাগবে। আর মা গঙ্গাকে আনতে হ'লে খুব বড় দড়ির জাল লাগবে। কলিযুগে তিনি মাছেরই সামিল হয়েছেন কিনা। এর ব্যবস্থা করো গে, আর ষোড়শোপচারে পুজো আর ভোগের জন্য খুব ভাল রকম আয়োজন করো গে। আমি তার ফর্দ আজ বিকেলে পাঠিয়ে দেবো। মা বসুমতীকে পুজো ও আবাহন করতে হবে; ইন্দির আর বরুণ দেবতাকেও আবাহন করতে হবে। সূর্যঠাকুর এই পুজো না পেয়ে রেগে যাতে অনিষ্ট না করতে পারেন, তাইতে মস্ত বড় সামিয়ানা খাটানোর ব্যবস্থা করতেই হবে।"

যজমান বাড়ি গিয়ে আয়োজন করতে লাগলো। পুষ্করিণী প্রতিষ্ঠার শুভদিনের একদিন আগে চক্রবর্তী-মশাই পুকুরের ধারে গিয়ে দেখেন গাড়ি গাড়ি বাঁশ কাটা হয়েছে, কাজকর্মের হৈ-চৈ প'ড়ে গিয়েছে। যজমান এসে গলবস্ত্র হয়ে বললো—"ঠাকুরদা, পুকুর-জোড়া অত বড় সামিয়ানা তো কোথাও জোটাতে পাচ্ছিনে। এখন উপায় কি?"

চক্রবর্তী-মশাই বললেন—"মধু অভাবে গুড়ং দদ্যাৎ,—এরও তো ব্যবস্থা আছে শাস্ত্রে। তুমি এক কাজ কর। ফর্দে যা আছে, তার উপরেও তুমি পুরো দশ-গজা ৫ জোড়া ভাল চওড়া লালপেড়ে শাড়ি কিনে আন,—তাই দিয়েই মা বসুমতীকে খুশি ক'রে দেব। কাল আমি ঠিক সময়ে আসব।"

তাই হ'ল। ঠাকুর-মশাই জলাশয় প্রতিষ্ঠা ক'রে কয়েক গাড়ি বাঁশ, দশ সের তেঁতে আর এক গাড়ি-বোঝাই কাপড়চোপড়, থালা-বাসন, চাল, ডাল, নারকেল ইত্যাদি নিয়ে বাড়ি ফিরলেন। শীগ্‌গীরই তাঁর মনের মত খাসা একখানা পুজামণ্ডপ ঐ বাঁশ আর তেঁতে দিয়ে বানিয়ে ফেললেন।

চক্রবর্তী-মশাই গরু-বাছুর খুব ভালবাসতেন। গরুদের ভগবতী, লক্ষ্মী, সরস্বতী, কাত্যায়নী, ইত্যাদি নাম ছিল। তাদের পরিচর্যা নিজের হাতে করতেন, আবার তামাক খেতে খেতে তাদের সঙ্গে গল্পও করতেন—"বুঝলি মা সরস্বতী, তুই বাছুরকালে কত যে দড়ি ছিড়্‌তিস,—তোর ঠ্যালায় অস্থির হয়ে যেতাম।" সরস্বতী তার খুশিভরা গল্‌গলে চোখ দুটো স্থির ক'রে সে সব যেন বুঝতে পেরে উত্তর দিতো—"হাম্—।"

তাঁর একটা গরু ছিল,—ভারি দুরন্ত, কোনমতে ছাড়া পেলেই ল্যাজ মাথায় ক'রে নাচত আর দৌড়াত, তাই তার নাম ছিল "নাচুনী"। একবার হ'ল কি,

এই নাচুনী কোথায় যেন উধাও হ'ল। তাকে আর কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যায় না। চক্রবর্তী-মশাই ভেবে-চিন্তে অস্থির। তাঁর কে একজন বর্গাৎ বললো—"আপনার নাচুনী গরু কালোয়ার দিকে গিয়েছে,—খোঁয়াড়েও যেতে পারে।" "কি আমার নাচুনী কালোয়ার খোঁয়াড়ে? দেখব, খোঁয়াড়ওয়ালার ঘাড়ে ক'টা মাথা, কালী চক্রবর্তীর গরু খোঁয়াড়ে দেওয়ার মজা দেখাচ্ছি ব্যাটার।"

চক্রবর্তী-মশাই খালিগায়ে মালকোঁচা বেঁধে মাথায় গামছা জড়িয়ে প্রকাণ্ড এক তেলকুচকুচে লাঠি হাতে ছুটলেন কালোয়ার দিকে। তাঁর পালোয়ানের মত নিটোল কালো দেহখানা আর হাতের লাঠি দেখে সবাই বলল, "ঠাকুরদা, কী হল?" তাঁর মুখ দিয়ে রাগে কথা বের হলনা, শুধু "ব্যাটাদের মাথা ফাটাবো" ব'লে চক্রবর্তী হন্‌হন্‌ ক'রে চললেন।

কালোয়া খোঁয়াড়ের কাছে গিয়ে দেখেন তাঁর নাচুনী খোয়াড়ের বেড়ার মধ্যে হা-পিত্তেসে তাকিয়ে আছে। খোঁয়াড়ওয়ালা গরুটা যে কালী চক্রবর্তীর—তা জানত না। সে তাঁর ঐ ভয়ংকর রুদ্রমূর্তি দেখে খোঁয়াড় ছেড়ে বাড়ি পালিয়েছে। চক্রবর্তী নাচুনীর দিকে চেয়ে খানিক হাউমাউ ক'রে কেঁদে নিয়ে খোঁয়াড়ের বেড়ার উপর হরদম লাথি আর লাঠি ঝাড়তে লাগলেন। বেড়া ভেঙে গেল। নাচুনীকে খালাস ক'রে নিয়ে তিনি কাঁধের উপর লাঠি তুলে চেঁচাতে লাগলেন.—"আয়, ব্যাটা খোঁয়াড়ওয়ালা, এগিয়ে আয় তোর মাথা ফাটাই।

আমাদের কাছে কালী চক্রবর্তী-মশাইএর প্রধান আকর্ষণ ছিল—তাঁর গল্প শোনা। তাঁর গল্পে রহস্য ও বীভৎস রস এত বেশি থাকত আর ঐ গল্প শোনার বক্‌শিস্‌ এতই উপাদেয় ছিল যে, ছুটির দিনে বা সন্ধ্যায় তাঁর বাড়িতে যেতেই হ'ত। খানিক গল্প ব'লে তিনি "নিন্দম রাজার গল্প" বলতেন। এ গল্প শুনতে হলে নিন্দম মেরে বসে থাকতে হবে, কথাটি বললেই গল্প একেবারে মাটি।—"এক ছিল নিন্দম রাজা,—তাঁর ছিল আমার চেয়েও মস্তবড় ভুঁড়ি, আর তার ছিল সাতটি রাণী, সব ক'টি পাঁচী পাগলীর মত"—এইটুকু ব'লে তিনি চুপ করতেন। যদি কেউ বলতো "তারপরে?"—অমনি বলতেন, "যাঃ গল্প নষ্ট হয়ে গেল,—নিন্দম রাজা একটু ঘুমুচ্ছে,—অমনি তোরা কথা বললি? আচ্ছা, দাঁড়া তাঁর ঘুম ভাঙুক। তার পরে তিনি কি করবেন জানা যাবে,—সবুর কর।" আবার চুপ করতেন। যদি আমরা আবার বলতাম "তারপরে?"—আরে দাঁড়া, রাজার কী ঘুম, যেন কুম্ভকর্ণ—নাক ডাকছে—ঘড়াৎ-ঘড়াৎ।।" এইভাবে তিনি নিন্দম রাজার গল্প ব'লে বকুনীর শ্রান্তি দূর করতেন।

চক্রবর্তী-মশাইএর বাড়িতে দিনরাত একটা চাকর থাকত—তার নাম ছিল ঈশ্বর ভুত। ভুতমশাই জাতিতে নমঃশূদ্র বোধহয়। কিন্তু কেউ কেউ বলেন ঈশ্বর ভুতরা কায়স্থ; ভুতের ভয়টয় কোন একটা আজগুবী ব্যাপারে তাদের পদবী হয়ে যায় "ভুত"। এই ভুত-বংশ এখন নির্বংশ, তাই তার এই *বিভীষিকাময়ী পদবী নিয়ে কেউ মাথা ঘামায় না।* ঈশ্বরের কী কাজ ছিল জানি না। বুড়ো মানুষ, সারাদিন হরদম তামাক টানতো আর কাশতো। কাশতে কাশতে যখন এলিয়ে পড়ার মত হ'ত তখন কলকে রাখত, আর অনেক রাত্রে লালন সাঁই বা ফিকির চাঁদের (মহাত্মা কাঙাল হরিনাথ) গান গাইতো তার বেসুরা মোটা গলায়—"বাকীর কাগজ গেল হুজুরে।"—

এই ভুতের একটু ইতিহাস আছে।

একদিন চক্রবর্তী-মশাই অন্ধকার রাতে হাট থেকে বাড়ি ফিরছেন। তাঁর হাতে কোঁৎকা অর্থাৎ বাঁশের মোটা লাঠি। আঁধারে কিছু দেখতে পারছেন না, কিন্তু রাস্তার পাশেই শুকনো পাতাগুলোর মধ্যে কি যেন একটা গোঁ-গোঁ শব্দ করছে আর নড়ছে। ভাবলেন, এতো শুয়োর না হয়ে যায় না। আর যায় কোথায়। হাতের ঐ কোঁৎকায় ঝাড়লেন এক ঘা। আর অমনি "ওরে ও ঠাকুন্দা, মেরো না, আমি ঈশ্বর।" "তাইতো আর এক ঘা খেলে ঈশ্বর ভুতের এখানেই ভবলীলা সাঙ্গ হ'ত। আরে ব্যাটা ভুত। তুই এখানে!" কালী চক্রবর্তী-মশাই তার মাথায় ও মুখে জলের ঝাপটা দিয়ে সুস্থ ক'রে বাড়ি নিয়ে গেলেন। বেচারাকে খাইয়ে দাইয়ে যত্ন ক'রে নিজের বাড়িতে রেখে দিলেন। ঈশ্বর ভুতের ছিল মৃগী রোগ। এই রকম তার মাঝে মাঝে হ'ত। অনেকে বলেন, কালী চক্রবর্তী-মশাইএর কোঁৎকার ঘা খেয়ে তার ঐ শিবের অসাধ্য ব্যাধি নাকি সেরে গিয়েছিল।

শিলাইদহে যখন কালী চক্রবর্তী বেঁচেছিলেন, তখন গ্রামের একটা দিক দিয়ে বেশ একটা গৌরবময় যুগ ছিল। জমাজমি ও অর্থ-প্রতিপত্তিশালী ব্রাহ্মণ কায়স্থে গ্রামখানা সরগরম ছিল। দীপান্বিতা শ্যামা পূজা তিন চার ঘর ব্রাহ্মণ খুব ধুমধাম ক'রে করতেন. চক্রবর্তী-মশায়ের বাড়ির পুজোর খাওয়ার বহর সবাইকে টেক্কা দিত।

গ্রামের এই গৌরবময় যুগে রবীন্দ্রনাথ পল্লীসংগঠনের একটা আয়োজন করেন। একটা বৈঠকে গ্রামের ভদ্রলোকদের আহ্বান করেন, কালী চক্রবর্তীও আহূত হয়েছিলেন।

রবীন্দ্রনাথ ভদ্রলোকদের সহানুভূতি পাননি.—ভদ্রলোকেরা বেশ বুঝে নিলেন, শিলাইদহ জমিদারীর সংস্কার রবীন্দ্রনাথের একটা রাজনীতি। কবি

রবীন্দ্রনাথ রাজনীতিক ছিলেন একথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। কিন্তু তাঁর রাজনীতি আজ এই অভিশপ্ত পল্লী শিলাইদহের চেহারা বদলে দিত কিনা সেকথা বিশেষজ্ঞগণই বলতে পারেন। যাক্ সে কথা,—কালী চক্রবর্তী-মশাই কিন্তু রবিবাবুর কথায় ও ব্যবহারে একেবারে এমন মুগ্ধ হয়ে পড়েছিলেন যে, তিনি তাঁকে একেবারে দেবতা বানিয়ে ফেলেছিলেন। কিন্তু তিনি অশিক্ষিত অমার্জিত-রুচি, গ্রাম্য যাজক ব্রাহ্মণ। ভদ্র সমাজের মুখের তোড়ে তিনি কতক্ষণ দাঁড়াবেন? তিনি ভিতরে ভিতরে রেগে ফুলতেন। একদিন বাজারের মধ্যে কি একটা বিষয় নিয়ে গ্রামের মাথা কয়েকজন ভদ্রলোকদের মধ্যে (বোধহয় স্থানীয় ইস্কুল নিয়ে) তর্ক উঠল। চক্রবর্তী-মশাইও ঐ তর্কের মধ্যে পড়েছিলেন। আমরা শুনেছি, তিনি অতিমাত্রায় উত্তেজিত হ'য়ে হাতের কোঁৎকা (মোটা বাঁশের লাঠি, এ জিনিসটা চক্রবর্তী-মশাইএর সঙ্গের সাথী) মাটিতে বার-বার ঠুকে চেঁচিয়ে বলেছিলেন—"হাম্ সক্‌রিতার্ (সেক্রেটারী) হ্যায়।" —এই নিয়ে অনেকেই হাসাহাসি করেছেন।

রবীন্দ্রনাথের ছেলে রথীন্দ্রনাথ, জামতা নগেনবাবু ও বন্ধুপুত্র সন্তোষবাবু কলের লাঙ্গল এনে ফেললেন,—নানাদিকে নানা আয়োজন আরম্ভ করলেন,—তখন কালী চক্রবর্তী বলেছিলেন—"যাই বল বাপু আমি গণ্ডমুখ্যু, বলছি বাবু-মশাই এদের চিনতে পারলেন না। তিনি ছাইএর মধ্যে ঘি ঢালছেন।"

এরই কিছু আগে রবীন্দ্রনাথ স্বদেশী আন্দোলনে একেবারে মেতে উঠেন। শিলাইদহ কাছারীতে, কুঠীবাড়িতে আর কুষ্টে কুঠীবাড়িতে এক একটা প্রকাণ্ড তাঁতশালা খোলেন। সে তাঁতের কারখানা বেশ ভাল ভাবে চলেছিলও বহুদিন। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় তা বন্ধ কবতে বাধ্য হয়েছিলেন। কালী চক্রবর্তী-মশাই ভবিষ্যদ্দর্শী। তিনি একদিন বলেছিলেন,—"তোমরা মনে করেছ,—বাবু-মশাই-এর এই তাঁতের কাপড় বাবুভায়ারা পরবেন? হাঃ, আগেই তো তাঁদের পাছায় ফোস্কা পড়বে।—তার পরে, বাজারে তো মিহি বিলিতি কাপড়ের অভাব নেই, দামও তার কম। আমাদের মত গোমুখ্যু দুই-একজন পরবে,—দেশের জিনিস, বাবু-মশাইএর তৈরি, এই খাতিরে। বাবু-মশাই যদি নাকের জলে চোখের জলে এক না হন তবে আমি কালী চক্কত্তিই না।"—এই হ'ল তাঁর মন্তব্য।

এমন একটি সেকেলে খাঁটী বাংলার নিজস্ব সরল আনন্দময় সদাসন্তুষ্ট গৃহস্থ-যোগীর কথা প্রায়ই মনে হয়। চক্রবর্তী-মশাই রাজদরবারে চলেছেন,—কুষ্টে চলেছেন,—গায়ে উড়নীর চাদর।—পায়ে ভীষণাকার চটি অথবা খড়ম।

কিন্তু তাঁর অভাব ছিল কিসের? গোলা-বোঝাই ধান, মটর, মসুর, কলাই গম, সরষে, যব, তিল, চার-পাঁচটি দুধেল গাই, পুকুর বোঝাই মাছ। বাগানে থম্‌থম করছে আম, কাঁঠাল, নারকেল, সুপারী, কলা। ক'জন বড়লোক তাঁর কাছে দাঁড়াতে পারে?

মেছের সর্দ্দার

বাংলাদেশে একসময়ে জমিদারেরা পরস্পরের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ করাটাকে জমিদারীর 'প্রেস্টিজ' মনে করতেন। সে উদ্দেশ্যে তাঁরা নিজ নিজ জমিদারীতে লেঠেল রাখতেন নিযক্ত ক'রে। যে সমস্ত খ্দে জমিদারের টাকা বেশি ছিল না, তাঁরা দরকার হলেই লেঠেল ভাড়া করে আনতেন। এইভাবে পার্শ্ববর্তী প্রবল বা খ্দে জমিদারেরা জমির সীমানা নিয়ে বা বিলের দখল নিয়ে অবলীলাক্রমে মারামারি বাধাতেন। এইসব মারামারিকে বলতো "কাজিয়া।"

এইসব শৌখিন কাজিয়া নিয়ে তাঁরা ব্ক ফুলিয়ে গর্ব করতেন, লোককে ব্ঝাতেন, "আমি কত বড় লাঠিবাজ জমিদার, দেখে নাও।" এতে তাঁদের খ্যাতি দেশে দেশে বেড়ে চলতো, সাধারণে তাঁদের দেখে বাঘের মত ভয় করতো। তার ফলে অনেক নিরীহ অশিক্ষিত লোক তাঁদের খ্শি করবার জন্য মাথা গরম ক'রে লাঠি ধরে কাজিয়াতে প্রাণ দিতো. কেউ হাত পা ভেঙে মাথা কেটে ভুগতো, কেউ জেল খাটতো। জমিদাররা, সেই সব দ্ভাগাদের কখনো বা কিছ্ সাহায্য করতেন, কখনো বা শ্ধ্ কথায় চিড়ে ভিজিয়ে তাদের ঠাণ্ডা করে রাখতেন। এর ফলে সাধারণের মধ্যে তাঁদের বির্দ্ধে অসন্তোষ জেগে উঠতো। তব্ও ঐ সব জমিদারদের এই সৌখীন লাঠিবাজীর কোন প্রতিকার হ'ত না।

কোন কোন কাজিয়ার খ্নখারাবীর জন্য দস্তুর মত ফৌজদারী বেধে যেতো। দায়রায় মোকর্দমা হয়েও অনেক লেঠেল শ্রীঘর বাস করতো। অপরাধের গ্র্ত্ব অন্সারে দ্বীপান্তর বা তার চেয়েও কঠোর শাস্তিভোগ করতে হ'ত। আবার প্লিশের কর্তারা এই সব কাজিয়ার ব্যাপারে নানা চক্রান্ত জাল ছড়িয়ে গরীবের ম্খের অন্ন কাড়তেন, জমিদার বাড়িতে পোলাউ আর খাসীর গোস্ত্ উদরসাৎ ক'রে খ্ন্কে খ্ন বেমাল্ম গাপ্ করিয়ে (গোপন করিয়ে) দিয়ে গৃহিনীর গহনা বাড়ানর দাঁও মে'রে বসতেন। থানার কত্তাদের সঙ্গে জমিদারদের শয়নে স্বপনে ভাব রাখ্তে হ'ত। তা না হ'লে জমিদারীর শাসন সংরক্ষণ চল্তো না। অশিক্ষিত গ্রাম্য প্রজারা প্লিশকে জ্জ্ মনে ক'রতো আর জমিদারের কাছে তারা ব'নে যেত ম্রগীর বাচ্চা। সেকালকার গ্রাম্য জমিদারদের এই

মসীনিন্দিত চিত্র সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এঁকে গেছেন তাঁর বহুদিনের ডেপুটিগিরির অভিজ্ঞতা থেকে।

আবার লাঠিয়ালরাও সেকেলে জমিদারদের অবিচারে এই রকমের কাজিয়ার ফলে প্রায়ই শ্রীঘর বাস করত। তারপরে সর্বস্ব খুইয়ে বাধ্য হয়ে ডাকাতের দল গ'ড়ে পল্লী অঞ্চলে অশান্তির আগুন জ্বালিয়ে তুলতো। তাদের লাঠি দুর্বলকে রক্ষা করতে পারে নাই, দেশের সেবায় উৎসর্গীকৃত হয় নাই। তাদের লাঠিবাজী তাদেরই কালস্বরূপ হয়েছিল।

মেছের সর্দার সুবিখ্যাত লাঠিয়াল্ হলেও ভগবান তাকে গড়েছিলেন অন্য ধাতু দিয়ে। খুনীর ব্যবসা নিলেও সে অন্তরের মধ্যে তার খোদাতালার সুন্দর প্রেমময় মূর্তি দেখ্‌তে পেতো। সে খুনী হতে পারে নাই। খোদার সেরা সৃষ্টি এই দুনিয়ার সে মরদ হয়ে জন্ম নিয়ে হিংসুক্ হ'তে পারে নাই, স্বার্থের জন্য দয়ামায়া মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিতে শিখে নাই। মেছের দুই একজন খুদে জমিদারের অনুগ্রহ-ভাজন হয়েছিল নিজের অসাধারণ খ্যাতির জোরে, কিন্তু সে নিজের তিক্ত অভিজ্ঞতায় বুঝেছিল যে লাঠিয়াল বলে টাকাওয়ালারা তাকে তাদের পা-চাটা কুকুর বানাতে চায়। সে অনেক লাঠিয়াল তৈরী করেছিল। দেশময় ওস্তাদ ব'লে লোকদের শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। সে তার সাক্‌রেদদের কাছে অস্ত্রগুরু দ্রোণাচার্যের মত পিতৃস্থানীয় ছিল। সাক্‌রেদদের সে ছেলের মত মনে করতো।

শিক্ষা শেষ হ'লে সে সাক্‌রেদদের এই উপদেশ দিয়ে বিদায় করতো "দ্যাখো বাপজান্! ওস্তাদ মেছের সদ্দারের মুখে কালি দিও না, খুনী হবে না আর জীবনে কখনো ডাকাতি করবে না। খবরদার। তাহলে কিন্তু খোদাতালা তোমাদের তাগোৎ কেড়ে নেবেন, তিনি তোমাদের সাতজন্ম দোজোকে চুবোবেন।"

মেছের কোনো জমিদারের তোয়াক্কা করতো না। সে বাড়িতে প্রত্যহ পাঁচ ওক্তো নমাজ পড়তো; মৌলুদ্-শরীফ্ শুন্‌তে মস্‌জিদে যেতো। কোনো রকম নেশা করতো না। নিজের বাড়িতে ব'সে ধর্মচর্চা করতো আর সাক্‌রেদ্‌দের তালিম দিত।

কোন এক শুভক্ষণে সে একদা তার আদর্শের অনুরূপ একজন মানুষের মত মানুষের দর্শন পেয়ে গেল।

যৌবনে রবীন্দ্রনাথ একদিন তাঁর জমিদারীর অন্তর্গত পাণ্টীর হাট পরিদর্শন করে বজরায় ফিরছেন শিলাইদহে। গোরাই নদীর উপর কুমার-খালীর ঘাটে তিনি বজরার উপর বসে রয়েছেন। কাতারে কাতারে প্রজারা

তাঁকে দেখ্‌ছে। মেছের সর্দারও তাঁকে দেখ্‌তে নদীর ঘাটে হাজির হ'ল।

শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত

মেছের সর্দার রবীন্দ্রনাথের অপরূপ রূপ দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেল। এমন আকৃষ্ট হয়ে গেল যে, কখন যে প্রজার দল সেখান থেকে বাড়ি ফিরলো তা সে টেরও পেল না; সে হাঁ ক'রে তাঁর দিকে চেয়ে রইলো। প্রজাদের ভিড় কম হ'ল যখন, তখন তাঁর হুঁস্‌ হ'ল। সে বাড়ি ফিরবে কিনা ভাবছে, এমন সময় হয়ধর সর্দার নামে ঠাকুর বাবুদের একজন বিখ্যাত লেঠেল বরকন্দাজ

এসে তাকে নত হয়ে সেলাম দিয়ে বল্‌লে "ওস্তাদ্‌জী. সেলাম"। হয়ধর মেছেরেরই একজন প্রিয় সাগরেৎ ছিল।

হয়ধর বল্‌লে "ওস্তাদজী বাবু-মশায়ের সঙ্গে দেখা করুন, আমি তাঁর কাছে আপনাকে নিয়ে যাচ্ছি।" মেছের বললো "আমার আজ বড় ভাগ্য। চলো বাবজান্‌।"

বাবু-মশাই তখন বোটের মধ্যে বসে ছিলেন চুপ করে গোরাই নদীর দিকে চেয়ে। হয়ধর বরকন্দাজ তার ওস্তাদ মেছের সর্দারকে নিয়ে তার পরিচয় দিয়ে বললো "হুজুর, ইনি আমার ওস্তাদ। শুধু আমার ওস্তাদ নন্‌ এই তল্লাটের প্রায় হাজার লেঠেলের ওস্তাদ। ইনি হুজুরেরই পেরজা। বাড়ি খয়েরচারায়।"

রবীন্দ্রনাথ ঐ লোহা দিয়ে পেটা বলিষ্ঠ মেছের সর্দারের চেহারাখানা অনেকক্ষণ ধরে আগাগোড়া দেখে নিলেন. যেন খুব আনন্দিত হলেন। বেঁটে মানুষটী; সুগঠিত পেশীবহুল হাত দু'খানা, সিংহের মত গর্দান্‌। দু'হাত চওড়া বুকের ছাতি. পাথরে কোঁদা সুপুষ্ট বিশাল কোমর নিয়ে হাড়ে মাসে সুগঠিত পা'দুখানা। রবীন্দ্রনাথ হেসে বল্‌লেন, "বোসো মেছের সর্দার।"

মেছের তাঁর সাম্‌নে সতরঞ্চিতে ব'সে একদৃষ্টে হাঁ ক'রে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলো। রবীন্দ্রনাথ বল্‌লেন—"তোমাদের মধ্যে সকলেই কিছু কিছু লাঠি চালাতে জানে। আত্মরক্ষার দরকার হ'লে হাল ছেড়ে দ্যায় না। আমি গ্রামে গ্রামে ভদ্রলোকের ছেলেদের লাঠি খেলা শেখাতে চাই। তোমাকে তাদের ওস্তাদ বানাতে চাই। যাবে শিলাইদহে?"

মেছেরের কথা ছিল বঁড়ো মিষ্টি. আদব কায়দা ছিল খুব ভদ্র। সে বল্‌লো "হুজুরের মেহেরবানী হ'লেই বান্দা হাজির হবে গিয়ে। আমি হুজুরের বান্দা হয়েই জীবনটা কাটাতে চাই। এই চোর ডাকাতের রাজত্বে আর বাস করতে ইচ্ছা হয় না।"

স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কাউকে কোন কথা জিজ্ঞাসা না করে নিজেই মেছেরকে নিযুক্ত করলেন বরকন্দাজদের সর্দার করে। মেছের হাতজোড় করে বল্‌লে "আমার নিজের একটা আরজী আছে হুজুর।" রবীন্দ্রনাথ বল্‌লেন. "বেশ বেশ, বলো।"

মেছের ব'ল্‌ল, "হুজুর জমিদারীতে এলে যেখানে যতদিনই থাকুন না কেন এ বান্দা হুজুরের পাহারায় হুজুরের সঙ্গেই থাক্‌বে. বান্দার এই আরজীটা মঞ্জুর করতে হবে" বলে হাত জোড় করলো। রবীন্দ্রনাথ তাতে রাজী হোলেন "তোমাকে গ্রামের ছেলেদের লাঠিখেলা শেখাতে হবে। আমি তোমায় একদল শিক্ষার্থী দেবো। আমার সদর মফঃস্বল কাছারীতে যত

বরকন্দাজ হাল্‌সানা আছে সবাইকে ভাল করে তুমি লাঠি চালানো শিখিয়ে দেবে। আমি চাই একদল শক্তিমান সেবক আর সাহসী গ্রামবাসী। যারা এই বিদ্যা শিখে ভুল পথে গিয়ে ডাকাতী ক'রে শক্তি নষ্ট করছে, তাদেরও আমি এই কাজে ফিরিয়ে আন্‌তে চাই। তোমরা সবাই গ্রামগুলোকে সাহসী শক্তিমান করে তোলো।”

রবীন্দ্রনাথ আরও অনেক কথা বল্‌লেন। সে সময়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে বাঙালীর জীবনে নব-জাগরণের জোয়ার এসেছিল। যিনি সেই মাতৃপূজার মন্ত্র বাঙালীর কানে ও প্রাণে ঢেলে দিয়েছিলেন তাঁর মুখের কথা কত উদ্দীপনাময়ী হ'তে পারে পাঠক তা অনায়াসেই বুঝতে পারেন।

মেছের সর্দার মন্ত্রমুগ্ধ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথের পায়ে হাত দিয়ে গড় হয়ে প্রণাম করলো। তার চোখ দুটো জ্বলে উঠলো, গলার স্বর কেঁপে উঠ্‌লো, বুকখানা ভরে উঠ্‌লো। সে পলকহীন চোখে রবীন্দ্রনাথের দিকে চেয়ে তাঁর মুখের অগ্নিবানী শুন্‌তে লাগ্‌লো।

সপ্তাহ পরেই মেছের সর্দার শিলাইদহে এসে রবীন্দ্রনাথকে সেলাম করলো। তখন রবীন্দ্রনাথের জাতীয় সঙ্গীত শিলাইদহের আকাশ বাতাস মাতিয়ে তুলেছে! “ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন তত টুট্‌বে. “আগে চল ভাই” “আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি”, “একবার তোরা মা বলিয়া ডাক”—তাঁর এই সব আগুন ছড়ানো গানে মরা গ্রামগুলি জেগে উঠেছে। গ্রামের ফণী চৌধুরী, ভবানী আচার্য, অনাদি অধিকারী. সতীশ সরকার প্রভৃতি একদল ভদ্র যুবকদের নিয়ে মেছের সর্দার লাঠি খেলা শেখাতে লাগ্‌লো। কুস্তীর আখড়া বসালো। কাছারীর মাঠে মেহের সর্দার, হয়ধর, মাণিক, আহাদালী, কেতু ঢালী প্রভৃতি নামকরা লেঠেল বরকন্দাজেরা ওস্তাদ মেছের সর্দারের নেতৃত্বে লাঠিখেলা আরম্ভ করলো। আশেপাশের বহু গ্রাম থেকে লেঠেলরা এসে ঐ লাঠি খেলায় যোগদান করলো। কালোয়ার তমিজ সর্দার, মধু মাল, নাচন্‌ সর্দার বেনীবুনো প্রভৃতি নামকরা লেঠেলরা এসে ওস্তাদ মেছের সর্দারের সাগ্‌রেদী করতে লাগলো। এইসব বাছা বাছা সুশিক্ষিত লেঠেলদের রবীন্দ্রনাথ উপযুক্ত মাইনে ও জমি দিয়ে এস্টেটের বরকন্দাজ নিযুক্ত করলেন।*

*এই রকম লেঠেলের দল জমিদারীর এবং গ্রামের কাজে নিযুক্ত করবার জন্য রবীন্দ্রনাথের উপর গভর্ণমেণ্টের শ্যেন দৃষ্টি পড়ে; কিন্তু তাতেও তিনি সংকল্পচ্যুত হন নাই।

মেছের সর্দারের একমাত্র ছেলে এসে কাছারীর কুশলী বরকন্দাজদলে ভর্তি হ'ল। মেছের আজীবন ঠাকুর বাবুদের কাজ করবে বলে প্রতিশ্রুত হ'ল এবং সে বিশেষ দান হিসাবে কুমারখালীর চরে কিছু জমি বিনা সেলামীতে পেয়ে গেল। মেছেরের আর তিলমাত্র অবসর নেই। সে বরকন্দাজদের শেখায়, ভদ্রযুবকদের ক্লাবে দৈনিক লাঠি আর সড়কি খেলা শেখায়, রবীন্দ্রনাথের খাস বরকন্দাজ (এ-ডি-কঙ) হয়ে তাঁর বোট পাহারায় হাজির থাকে। এত কাজের মধ্যেও দৈনিক পাঁচ ওক্তো নামাজ পড়ে, রাত্রে কোরাণের বয়েদ গান করে। হিন্দু মুসলমান সমস্ত বরকন্দাজ তাকে প্রাণের সঙ্গে ভালবাসে—ভক্তি করে, আজ্ঞা পালন করে। ফার্সী কেতাব পড়ে সে প্রায় রাত্রে মুসলমান বরকন্দাজদের সঙ্গে ধর্মালোচনা করতো, আবার দরকার পড়লে সাধারণ বরকন্দাজদের মত কুষ্টে কুমারখালী যেতো, মফঃস্বল কাছারীতে মোতায়েন হয়ে খাজনাও আদায় করতো। সে বল্‌তো "বাবু নিয়ম মত না খাটলে শরীরটা ব্যারামের আড্ডা হ'য়ে উঠ্‌বে, চাষার খাটুনির শরীরে বাত ধরে যাবে।"

আচার্য জগদীশচন্দ্র, মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রনাথের অন্য বিশিষ্ট বন্ধুরা এলে রবীন্দ্রনাথ তাঁদের দেখাবার জন্য মেছের সর্দারের সাক্‌রেদদের লাঠি খেলার আয়োজন করতেন। সে খেলার নানা রকম কৌশল ও শক্তি চর্চার প্রদর্শনী হ'ত।

আমার বেশ মনে আছে, একবার সে কাছারীর মাঠে দশ বারো হাত দূরে দূরে বাঁশ পুঁতে চাদর বেঁধে তিন চারটি দরজা বানিয়ে এক এক দরজায় পাঁচজন করে অস্ত্রধারী লেঠেল রেখে মাঠের এক পাশে এসে বক্তৃতা শুরু করল—"দেখুন হুজুরেরা, দেখুন বাবুরা, মনে করুন আমাদের মনিবের বাড়িতে ডাকাত পড়েছে। মনিব একা স্ত্রীপুত্র নিয়ে বিপন্ন। আমি আর আমার ছেলে ভিন্ন আর কেউ নাই যে এই বিপদে মনিবকে বাঁচাতে পারে। ডাকাতরা বাড়ি লুট করছে, প্রত্যেক দরজায় ৪।৫ জন করে অস্ত্রহাতে পাহারা দিচ্ছে। এই দেখুন. আমি আমার ছেলে আহাদালী মনিবকে উদ্ধার করতে ছুট্‌লুম্‌, মনিবকে বাঁচাবো ডাকাতদের সব হটিয়ে দেব। এই দেখুন—আয় আয় বাপ্‌জান্‌। আল্লা আল্লাহো—" এই বলে মেছের প্রকাণ্ড আড়লাঠি আর ঢাল নিয়ে আর তার ছেলে সড়কি আর ঢাল নিয়ে বাড়ি আক্রমণ করলো। তিনটি দরজার তিনদল লেঠেলকে যুদ্ধে হারিয়ে দিয়ে তিনটি দরজার ছোট্ট ফোকরের মধ্য দিয়ে লাফিয়ে দরজা পার হয়ে বাপে বেটায় দু'জন লোককে ঘাড়ে করে ঐ ফোকরগুলো পুনরায় কৌশলে লাফিয়ে পার হ'য়ে এসে সঙ্গী লেঠেল ছেলের পিঠ চাপড়িয়ে বল্‌ল, "সাবাস্‌ সাবাস্‌ বাপজান্‌।"

জনতা মেছেরের জয়ধ্বনি ক'রে উঠলো।

এই রকম বক্তৃতা করে সে আরো অনেক কৌশলের ও বীরত্বের খেলা দেখাতো। মেছের সর্দার তার দলবল নিয়ে লাঠি খেলবে এই সংবাদ পেলে দশ বিশখানা গাঁয়ের লোক খেলার মাঠে জমায়েৎ হ'ত। লাঠি খেল্‌তে খেল্‌তে কোনও লাঠিয়াল রেগে অসংযত হয়ে মারামারি করতে উদ্যত হ'লে মেছের চেঁচিয়ে বলত "মেজাজ হারাস্‌নে বেটা হুঁসিয়ার, বসে পড়। ওস্তাদের হুকুম, বসে পড় লেড়কা; তবিয়ৎ ঠাণ্ডা কর।" বলে তার পিঠ চাপ্‌ড়াতো।

রবীন্দ্রনাথ অনেক সময় একা একা সুবিস্তীর্ণ নির্জন চরে বেড়াতেন, অনেক সময় তিনি নিঃসঙ্গ অবস্থায় মাঠের মধ্যে অনেক দূরে তাঁর অচেনা কোন গ্রামে গিয়ে পড়তেন। তিনি সঙ্গে কোন দেহরক্ষী বরকন্দাজের প্রয়োজন মনে করতেন না বা পছন্দও করতেন না; কিন্তু মেছের সর্দার মনিবের অজ্ঞাতে সর্বদা তাঁর অনুসরণ করতো সব যায়গায়। এমনি একটা কাহিনী আমি লিখেছি পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথে।*

মেছের সর্দার খুব বুড়ো হয়ে গেলে তার ছেলে তার জায়গায় বহাল হ'ল। মেছের মৃত্যুকাল পর্যন্ত ঠাকুর বাবুর এস্টেট্ থেকে পেন্‌সন পেয়েছে। তার মৃত্যুকালে জমিদারী বিভাগ হয়ে যাওয়াতে রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ পরিত্যাগ করেন। মৃত্যুশয্যায় মেছের বার বার বিকারের ঘোরে "ঐ যে হুজুর এসেছেন," বলে চেঁচিয়ে উঠেছিল এবং শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের সময় শান্ত সমাহিত চিত্তে বলেছিল—"হুজুর, চরণের ধূলা দিন।"

*"জমিদার বাহাদুর"—পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ।

মুন্সীবাবু

সেকালের জমিদারী সেরেস্তার কর্মচারীদের পদ ইংরাজী-ভাষায় ছিল না। সবগুলিই প্রায় ফার্সি-ভাষায়। যেমন—সুমার-নবিস, একজাই-নবিস, জমা-নবিস বা তৌজীনবিস, তদারগ্‌নবিস, নিকাশনবিস, কারকুন্‌, মহাফেজ, মুন্সী, পেশ্‌কার, নাজীর, জমাদার, দপ্তরী, বরকন্দাজ, হালসানা ইত্যাদি। কেরানীকে বলে মোহরার। একটি পদ হচ্চে মুন্সী। মুন্সী মানেই মুসলমানী-পর্দাবি নয় এর ইংরাজী প্রতিশব্দ হচ্চে হেড ক্লার্ক বা কর্‌সপণ্ডেন্ট ক্লার্ক।

বাংলা দেশে হতভাগ্য কেরানীরা আজীবন অসহায়ভাবে ভাগ্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রে কিভাবে শোচনীয় জীবন অবসান করে, তা কারো অজানা নেই। তাদের জন্য মৌখিক সহানুভূতি অনেকেই করেন। কিন্তু তাঁদের সত্যিকারের দুঃখটা কোথায়, বেদনা কোন্‌খানে, তা রবীন্দ্রনাথ কতখানি দরদ দিয়ে বুঝতেন তা জানা যাবে 'মুন্সীবাবু' অথবা আমাদের মহিমচন্দ্র সরকারের জীবন কাহিনীতে।

বেকার কেরানী মহিমবাবুর অবস্থার কথা শুনে রবীন্দ্রনাথ এতখানি অভিভূত হয়েছিলেন যে তিনি তাঁকে কালীগ্রাম পরগণার সদর কাছারীর মুন্সীপদে নিযুক্ত করেছিলেন (১৩০২ সাল)। তার জন্যে মহিমবাবুকে আজ-কালকার মত তদ্বির-বা অনুরোধ উপরোধ বেশি করতে হয় নি। মহিম-বাবুর জীবনে সব চেয়ে বড় অভিজ্ঞতা এই যে, তিনি সারাজীবন একজন অসাধারণ দয়ালু রবীন্দ্রনাথকে দেখেছেন। এই নিরীহ কেরানীটীর নানা অশান্তিময় জীবনে আবার মাঝে মাঝে মোক্ষপ্রাপ্তির বাসনা জেগে উঠতো। অসার সংসারে সেই পরমপদ লাভের আশায় বিশ বছর ঐ পদে চাকরী করে তিনি দুই মাসের ছুটি নিয়ে তীর্থে বেরুলেন। সুদীর্ঘ দুই বছর কাশী বাস ক'রে দেখ্‌লেন, "কম্‌লীতো নেহি ছোড়েগা।" সংসারের মায়া জালে যিনি আবদ্ধ তাঁর বৈরাগ্য সাধনে মুক্তির কোন আশা নেই এ কথাটা হাড়ে হাড়ে বুঝে তিনি আবার চাক্‌রীর উমেদারীতে পুরো একটি বছর নানাস্থানে ঘুরে হতাশ হ'য়ে পড়লেন।

ঘুরতে ঘুরতে কল্‌কাতায় এসে শুন্‌লেন, রবীন্দ্রনাথ বিলাতে। শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী মহাশয় তখন জমিদারীর ম্যানেজিং এজেণ্ট। ঠাকুর এস্টেটে কোনও চাক্‌রী তখন খালি না থাকায় শ্রীযুক্ত চৌধুরী সাহেব দয়া ক'রে তাঁকে

স্বর্গীয় গোপাললাল শীলের রিসিভার এস্টেটে একটি চাক্‌রী দেন। তিন বছর পরেই আবার মহিমবাবু বেকার হ'য়ে পড়লেন। আবার চাক্‌রীর জন্যে ঘুরতে লাগ্‌লেন।

খবরের কাগজে রবীন্দ্রনাথের বিলাত থেকে কল্‌কাতা ফেরবার সংবাদ পড়ে আবার তিনি "অনাথনাথ তিনি দীনেরগতি" রবীন্দ্রনাথের কাছে গেলেন। কল্‌কাতা জোড়াসাঁকো বাড়িতে অসংখ্য দর্শনপ্রার্থীর ভীড়ে রবীন্দ্রনাথের তখন একটুও বিশ্রাম নাই। তবু নিরুপায় হয়ে মহিমবাবু দোতালায় দরোয়ান দিয়ে শ্লিপ পাঠালেন "চাকরী প্রার্থী হতভাগ্য মহিমচন্দ্র সরকার।" শ্লিপ নিরর্থক পাঠিয়েছেন মনে করে মহিমবাবু ক্লান্তিতে বসে ঝিমুতে লাগ্‌লেন।

আশ্চর্যের বিষয়, মহিমবাবুর ডাক পড়লো দোতালায় পনেরো মিনিটের মধ্যে এবং তিনি গিয়ে আবার নিবেদন করলেন তাঁর দুঃখ দুর্দশার কাহিনী। শুন্‌লেন আবার সেই রকম সহানুভূতির বাণী "দিনদশেক পরে শিলাইদহে যাচ্ছি, সেখানে আমার সঙ্গে দেখা করো।"

যথা সময়ে মহিমবাবু শিলাইদহে এসে তাঁর সাম্‌নে হাজির হলেন। শিলাইদহ কাছারীতে কোন কাজই খালি নাই। মহিমবাবুর সজল চোখ দুটির পানে চেয়ে রবীন্দ্রনাথ ম্যানেজারের সঙ্গে অনেক আলোচনা করলেন, শেষে চরকালোয়ার তহশীলদারের কাজটি মহিমবাবুকে নেবার আদেশ দিলেন। মহিমবাবু তহশীলদারের গুরুদায়িত্ব পূর্ণ কাজ কখনো করেন নাই। কেরানী-গিরিতেই তিনি অভ্যস্ত। তবু তিনি বুঝলেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর জন্যে অসম্ভবকেও সম্ভব করতে চাইছেন। সব বুঝে তিনি দু'দিন অপেক্ষা করে আবার কুঠি-বাড়িতে তাঁর সঙ্গে দেখা করলেন। দেখ্‌লেন—অতিরিক্ত পরিশ্রমে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত ক্লান্ত, এমন কি আমাদের মত মানুষের অবস্থায় অসুস্থ বল্‌লেও বেশি বলা হয় না। তবু মহিমবাবুর সব কথা ধীর ভাবে শুন্‌লেন এবং বেশ বুঝলেন যে খাঁটী কেরানীর পক্ষে একটা মহালের আদায় তহশীলের কাজ করা শক্ত হবে। বল্‌লেন—"আপাততঃ ঐ কাজ কর গে। তোমায় শীগ্‌গীর কল্‌কাতা নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করব।" তিনি বেশ জানেন এই নিরীহ অভাব-গ্রস্থ লোকটী একান্তভাবেই তাঁর শরণাগত ও আশ্রিত।

"হাকিম ফেরে তো হুকুম ফেরে না।" রবীন্দ্রনাথের হুকুম যথাসময়ে শিলাইদহে চলে এলো। মহিমবাবু কল্‌কাতা সদর অফিসে এলেন। এসেই রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতেই তিনি অনেকক্ষণ মহিমবাবুর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন "তোমার শরীর তো দেখছি খুব খারাপ হয়েছে। কিসে ভুগ্‌ছো?" মহিমবাবু বল্‌লেন "হুজুর হাঁপানি রোগে ভুগ্‌ছি আজ প্রায়

একবছর।” বলে তিনি কেঁদে ফেল্‌লেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁকে বস্‌তে বলে পুত্র রথীন্দ্রনাথকে ডাক্‌লেন, বল্‌লেন “মহিমের নাকি হাঁপানি হয়েছে; বয়সতো ওর খুব বেশি হয়নি। ভাল চিকিৎসায় সেরে যাবে। তুমি ওর চিকিৎসার ভাল ব্যবস্থা ক’রে দাও।” মহিমবাবুর চোখ দিয়ে অবিরল অশ্রু ঝ’রে পড়লো, এ কৃতজ্ঞতার অশ্রু। আশ্রিত বৎসলের কাছে তিনি যত বারেই শরণ নিয়েছেন ততবারই আশ্রয় ও প্রশ্রয় দুই-ই পেয়েছেন।

রথীন্দ্রনাথ তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থা যথোচিত করেছিলেন; কিন্তু তাতে কোন স্থায়ী ফল হ’ল না। একজন ডাক্তার বল্‌লেন “ওঁকে আপনাদের জমিদারী পদ্মার চরে কাজ দিয়ে পাঠিয়ে দেন। তাহ’লে সেরে উঠতে পারবেন।” তখন থেকেই মহিমবাবু শিলাইদহে বদ্‌লী হবার সুযোগ অনুসন্ধান ক’রতে লাগ্‌লেন। মহিমবাবুর হাঁপানী না সারবার কারণ বোধ হয় তিনি অত্যন্ত তামাক খেতেন। প্রতি পনেরো মিনিট অন্তর তাঁর তামাক খাবার নেশা জেগে উঠতো। তামাকের গন্ধ পেলে শিকারী বেড়ালের মত তাঁর গোঁফ দাড়ি ফুলে উঠতো। তাঁর কোন বন্ধু বা সহকারী নিজে সেজে তাঁকে তামাক খাওয়ালে তিনি পরম সম্মানিত মনে করতেন। বিষ্টুপুরী বালাখানা ইত্যাদি তামাকের বর্ণনা ক’রে আমীর ওমরাহদের ফুরসীতে “তাওয়ায় সাজা” বহুমূল্য নবাবী তামাক টানার নানারকম সরস গল্প তিনি অনেক সময় মনের আনন্দে ব’লে যেতেন।

হঠাৎ শিলাইদহ কাছারীর মুন্সীর পদে যিনি ছিলেন তাঁর মৃত্যুর সংবাদ কলকাতা আপিসে এলো।' মহিমবাবু খুব সংকোচের সঙ্গে সেই রিপোর্ট নিয়ে দেখা করলেন। মুখে কিছু বল্‌তে সাহস পেলেন না, কারণ ঐ অতবড় দায়িত্বপূর্ণ পদে কাজ করবার মত তাঁর যোগ্যতা আছে কিনা সে বিষয়ে তাঁর ঘোরতর সন্দেহ ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথই ঐ সংবাদ শুনে নিজেই বললেন “তুমি পারবে কাজ করতে? সাহস কর? কাজ কিন্তু খুব দায়িত্বপূর্ণ। সেখানকার গোটা সেরেস্তাটা তোমার হাতের মধ্যে থাকবে।”

রবীন্দ্রনাথের অসাধারণ সহৃদয় ব্যবহারে প্রশ্রয় পেয়ে মহিমবাবুর সাহস যেন ক্রমেই বেড়ে গেছে; তিনি ও কাজ পারবেন বলে তখনই ঐ পদে বদলীর জন্য প্রার্থনা জানিয়ে ফেল্‌লেন। আশ্চর্যের কথা তাঁর প্রার্থনা তৎক্ষণাৎ মঞ্জুর হয়ে গেল।

কল্‌কাতা সদর আপিস ছেড়ে মহিমবাবু এলেন শিলাইদহে মুন্সীর পদে কাজ করবার জন্য। দুই চার দিনের মধ্যে রবীন্দ্রনাথও এলেন শিলাইদহে।

এখন থেকে তিনি আর মহিমবাবু নন, মুন্সীবাবু। ভগবান যেন তাঁকে

মুন্সিবাবু করেই গড়েছিলেন—কারণ এমন পাকা কেরাণী, এমন কষ্টসহিষ্ণু মুহুরী সংসারে দুর্লভ। প্রথমে ঐ কাজে যোগদান করলে ম্যানেজারবাবু তাঁকে নিজের মনের মত ভাবে গ্রহণ করতে পারলেন না; কিন্তু মহিমবাবুর উপরে রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি ও অনুগ্রহের পরিচয় পেয়ে অবাক হয়ে গেলেন।

রবীন্দ্রনাথ তখনো শিলাইদহে আছেন। একদিন মহিমবাবু একটু বিমর্ষভাবে তাঁকে প্রণাম করতে গেলেন। খানিকক্ষণ তাঁর মুখের দিকে চেয়ে বাবুমশাই বললেন "নূতন এসে তোমার বুঝি কিছু অসুবিধা হচ্ছে?" মুন্সীবাবু বাবুমশাইকে প্রায়ই "ভাবগ্রাহী জনার্দন" বলতেন। তিনি সত্যই বাবুমশাইএর ঐ কোমল স্নেহময় স্বরে একেবারে গলে গেলেন। বল্‌লেন; "এখানে এসে মেসে খেতে হয়; বাড়িতে পরিবারবর্গ রয়েছে—কুলোতে পারছি না। এ ভিন্ন আর কোন অসুবিধা নাই।"

তৎক্ষণাৎ রবীন্দ্রনাথ বল্‌লেন "আমার নাম করে কোয়ার্টারের জন্য ম্যানেজার বাবুকে বল না কেন। তিনি কি বলেন জানিও, আমি আরো দু'চার দিন এখানে আছি।"

দরিদ্র অসহায়, একান্ত নির্ভরশীল কর্মচারীর উপর মনিবের সহানুভূতির সীমা কতখানি থাকা সম্ভব তাই ভেবে মুন্সীবাবু অবাক হয়ে গেলেন। এত অনুগ্রহ কোন মনিব কোন কর্মচারীকে করেছেন বলে তিনি জানেন না বা শুনেন নাই। তিনি কোয়ার্টার পেয়ে গেলেন, স্ত্রীপুত্র কন্যাদের আনলেন। মাইনেও কিছু বাড়লো। মুন্সীবাবু জীবনে শান্তি পেলেন। তিনি বল্‌তেন "আমরা সবাই মহাপুরুষের আশ্রিত। আমাদের জীবনে তো কোন দুঃখ নাই।" কোন সহকর্মী চাক্‌রীবাক্‌রী নিয়ে অনুযোগ করলেই তিনি এই কথাটা বল্‌তেন।

মুন্সীবাবুকে কেউ মহিমবাবু বলে ডাক্‌তেন না। তিনি ভিতরে বাইরে ছিলেন মুন্সী; যেন মুন্সী কথাটা তিনি ভিন্ন আর কাউকে মানাতো না। চোখে প্রকাণ্ড বেশি পাওয়ারের চশমা; ছোট্ট একহারা অতি সাধাসিধে নিরীহ গোবেচারী কালো মানুষটী, কানে কলম; কখনো হাত বাক্‌সের উপর ঝুঁকে পড়ে অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে লিখছেনই অনবরত; বিরক্তি নাই, আপত্তি নাই, চলনে ফেরনে অনুমাত্র অস্থিরতা নাই, দিনরাত্রির পার্থক্য জ্ঞান নাই; কলম পিষছেনই। সাতেও নাই পাঁচেও নাই—কষ্টসহিষ্ণু নির্বিকার চিরানুগত মূর্তিমান বাঙালী কেরাণী। অতি ভোরে উঠে, স্নান আহ্নিক সেরে, বাড়ির সবাইকে ডেকে তুলে ভূঁই কোপাতেন, শাক লাউ কুমড়া শশা মুলো বুনতেন; রান্নার জন্য কাঠ ফাড়তেন, নিজ হাতে বাজার করতেন, মাঝে মাঝে অবসর

পেলেই চৈতন্য-চরিতামৃত পড়তেন আর গুনগুন্ করে গান গাইতেন। কোন তর্ক বিতর্ক বা পরচর্চায় থাক্তেন না, বরকন্দাজদের উপর ফাইফরমাস করতেন না,—হুকুম চালাতেন না। যেন নিজের মনের গভীরেই নিজে মগ্ন আছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উঠলে আত্মহারা হয়ে পড়তেন। বল্তেন, "তিনি ভাবগ্রাহী জনার্দন।" কেউ কেউ তাঁকে গোঁড়া রবীন্দ্রভক্ত বল্তেন।

বৃদ্ধ বয়সে মুন্সীবাবু কিছুদিন পেন্সন ভোগ করেছিলেন। আজ তিনি পরলোকে। তাঁর অখ্যাত ব্যক্তিগত জীবনে রবীন্দ্রনাথের অনুগ্রহের কাহিনী লিখবার জন্য তিনি মৃত্যুর পূর্বে আমায় অনুরোধ করেছিলেন।

আনন্দ ব্যাপারী

শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু অংকিত

বাংলাদেশে এমনও কেউ কেউ আছেন, যাঁদের ভুল ধারণা আছে যে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত কড়া এবং অত্যাচারী জমিদার ছিলেন। এরকম ধারণার কারণ কারো স্বার্থে আঘাত লাগবার দরুণ অসম্পূর্ণ বা মতলবী কাহিনীর রচনার কৌশলে। তাঁর জীবন-ধারণ প্রণালী সম্বন্ধে অনেক আজগুবী গল্প শোনা যায়। অনেকের ধারণা তিনি খেতেন শুতেন বেড়াতেন রাজকীয় চালে। সাধারণের নাগালের বহু ঊর্ধ্বে অভ্রভেদী মহিমায় তিনি প্রদীপ্ত। তাঁর সম্বন্ধে অনেক মনগড়া কাহিনী রচিত হয়। তাঁকে ইচ্ছামত রং লাগিয়ে অনেকেই বিকৃত করে ফেলে। যে কাহিনীটা আজ বল্‌ছি তা থেকে আসল জিনিসটি

না বুঝে কেউ হয়তো ভুল ধারণা করে নিতে পারেন এজন্য কাহিনীটা এতদিন বলিনি।

আনন্দ প্রামানিক, জাতিতে হেলেরই, যাকে বলে হিন্দু সৎচাষী, বাড়ি শিলাইদহে, পদ্মার ধারেই ঘোষপুর গ্রামে। নানা জিনিসের 'ব্যাপার' অর্থাৎ ব্যবসা ক'রে ব'লে তার নাম হয়ে গেল আনন্দব্যাপারী। গুড়, পাট, সুপারী আর কলাই সে সারা বছর ধ'রে বড় বড় পান্সী বোঝাই ক'রে নানান দেশে পাঠাতো। এই ব্যবসাতে সে বেশ ধনী হ'য়ে উঠলো।

কিন্তু ধনী হ'লে হবে কি! সে ছিল অত্যন্ত কৃপণ। ভাল মুখে চাও বা ভাল উদ্দেশ্যে চাও তো সে তোমায় একটি পয়সাও দেবে না। সোজা আঙুলে ঘি উঠ্‌তো না। কিন্তু টাকা তার খস্‌তো চতুর সৌখীন ছেলেদের অপব্যয়ে। সে গোপনে বালিসের তুলোর মধ্যে তোশকের মধ্যে তার সাধারণ খরচের টাকা লুকিয়ে রাখ্‌তো। মজুত ধনাগার ছিল তার শোবার ঘরের মেঝের নিচে। সে ঘরে তার অনুপস্থিতিতে কারো যাবার হুকুম ছিল না।

সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ ঘোষপুর, কোমরকাঁদি প্রভৃতি গ্রামে ছেলেমেয়েদের জন্য এবং বয়স্ক গ্রামবাসীদের জন্য কয়েকটা স্কুল খুলতে মনোযোগী হয়েছিলেন। এই সব গ্রাম সংস্কার ব্যাপারে এস্টেটের ও নিজের খরচে অনেক কাজ হ'ত; কিন্তু তাঁর পরিকল্পনার অনুযায়ী খরচ তিনি বা তাঁর এস্টেটে কতটাই বা বহন করতে পারেন! স্বদেশী যুগে তিনি শিলাইদহে বড় তাঁতের কারখানা, গুটীপোকার চাষ, নানাবিধ চাষের প্রচলন, ধানপাটের কারবার এবং কুস্টিয়াতেও তাঁতের কারখানা, পাটের কারবার, আখমাড়াই কলের ফ্যাক্টরী খুলেছিলেন খুব বড় আশা নিয়ে, বহু টাকা ব্যয়ে। কিন্তু নিজে বিপন্ন হয়ে সে সব নিতান্ত অনিচ্ছায় তুলে দিয়েছিলেন। ঠাকুর এস্টেটের মালিক তো তিনি একা ছিলেন না। ঐ সব দেনা নিজেকে বহন করতে হ'য়েছিল। এতখানি ত্যাগ স্বীকার ক'জন জমিদার করেছেন জানি না। তাই তিনি ব'ল্‌তেন "আমার অর্থ ভাগ্যে শনি"!

সে সময়ে তাঁর পল্লী সংগঠনের কাজ যাঁরা করতেন তাঁদের মধ্যে শ্রীযুক্ত অনঙ্গমোহন চক্রবর্তী আজও আছেন। অনঙ্গ বাবুরা দেখ্‌লেন, নানা রকমে খরচের চাপে শেষকালে শিশুদের ও বয়স্কদের শিক্ষা ব্যবস্থাও হয়তো উঠে যাবে। তাই তাঁরা প্রস্তাব করলেন যে, বয়স্কদের ইস্কুল ঘরের টাকা গ্রামের সঙ্গতিপন্ন গৃহস্থদের কাছ থেকে চাঁদা করে তোলা হোক্। সেকালে ৬০।৭০ টাকাতেই একখানা মাঝারি ভাল খড়ের ঘর তৈরি করা যেত। রবীন্দ্রনাথ এ প্রস্তাবে মত দিয়েছিলেন।

এই কাজে অনঙ্গবাবুরা আনন্দ ব্যাপারীর বিশ টাকা চাঁদা ধরেছিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন, আনন্দ ব্যাপারী বিনা বাক্য ব্যয়ে এই টাকা এনে দেবে, কারণ তার চেয়ে কম অবস্থাপন্ন লোকেরাও পাঁচ-ছয় টাকা ক'রে দিতে সানন্দে রাজী হ'ল।

ঝানু কৃপণ আনন্দ ব্যাপারী এই টাকা দেবে, মৌখিক স্বীকার ক'রে এসে দু'সপ্তাহ গা ঢাকা দিয়ে রইল। সে শুধু কৃপণ নয়, ধড়ীবাজ এবং বেপরোয়া। সে জমিদার সরকারে সে সময় বিশেষ জমিজমাও রাখতো না, যার জন্য জমিদারকে খাতির করার কোন দরকার ছিল। সে কোন্ স্বার্থে খামাখা এই গায়ের রক্ত জল-করা টাকা অকাজে খরচ করতে যাবে? আর যারা দিচ্ছে, তারা দিচ্ছে খাতিরে। বুড়ো মানুষদের ধ'রে পড়াশুনা করানো হবে, তার জন্য আবার ঘর চাই, বই চাই, ম্যাপ চাই,—বাবু মশায়ের এসব কী সৃষ্টি ছাড়া কাণ্ডরে বাবা!

নূতন একটা মতলব ঠাউরে নিয়ে আনন্দ ব্যাপারী কুষ্টে এলো। এসেই স্বর্গীয় শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র* মশাইকে জানালো "রবিবাবু মশাই প্রজা পীড়ন ক'রে চাঁদা তুল্‌ছেন ইস্কুল করবার জন্য। আমার মতন ছাপোষা দীন-হীন প্রজাকে এজন্য বিশ টাকা দেবার আদেশ করেছেন। এর প্রতিকারের জন্য আমি মহামান্য সরকাব বাহাদুরের কাছে দরখাস্ত করতে চাই। তার ব্যবস্থা করে দিন।"

উকীলবাবু প্রস্তাব শুনে তো একেবারে হতভম্ভ হয়ে গেলেন। তিনি আনন্দ ব্যাপারীকে অনেক বুঝালেন যে, এ কাজটা তোমার পক্ষে ভয়ানক অন্যায় হবে। এই সামান্য ক'টী টাকা ঐ মহৎ কাজে তোমার মত লোকের খুশি মনেই দেওয়া উচিত।

আনন্দ ব্যাপারী ঘোরতর আপত্তি জানিয়ে বল্‌ল, "দেখুন ব্যবসাবাণিজ্যে বড় লোকসান হচ্চে। আমাকে একটাকা কি বড়জোর দু'টাকা ধরা উচিত ছিল। কিন্তু একি অত্যাচার বলুন তো। জমিদারের কি টাকার অভাব আছে?"

উকিলবাবু মহা কৃপণ সুদখোর আনন্দ ব্যাপারীকে জান্‌তেন। তিনি বুঝলেন, লোকটা সহজ পাত্তর নয়, সোজা আঙুলে তো ঘি উঠবে না; কিন্তু কি ভয়ানক দুঃসাহস লোকটার। তিনি অনেক ক'রে বুঝালেন, কিন্তু ব্যাপারী মহাশয়ের মাথায় কিছুই ঢোকে না। তখন তিনি একটু ভেবে ওকালতী বুদ্ধি

*ইনি সুবিখ্যাত শিশু সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ মিত্রের পিতা।

খাটিয়ে বল্‌লেন—"দেখো ব্যাপারী, সরকার বাহাদুরের কাছে তাঁর মতন লোকের নামে দরখাস্ত ক'রে বিশ টাকা চাঁদা রেহাই পেতে হ'লে তোমাকে উল্টে বিশ টাকার দশগুণ খরচ করতে হবে। তার চেয়ে তোমায় একটা পাকা যুক্তি দিই শোনো। আমি বাবু মশাইকে একখানা উকীলের চিঠি দিচ্ছি। তাতে আইনের কথা লিখে জানাবো যদি আইন না মেনেও তিনি টাকা চান, তা'হলে তিনি যেন তোমার মতো গরীবের কাছে দু'টাকা মাত্র চাঁদা নেন। এইটাই হচ্চে সেরা উকীলের যুক্তি। খুব গোপন কথা কিন্তু। তিনি ভিন্ন কাউকে একথা বোলো না।"

ব্যাপারী অনেক ভেবে তাতেই রাজী হ'ল। উকীলবাবু ব্যাপারী পুঙ্গবকে ব্যাপারটা ভাল করে সম্‌ঝিয়ে দেবার জন্য বাবু মশায়ের কাছে সমস্ত ব্যাপার খুলে একখানা চিঠি লিখে দিলেন। বল্‌লেন,—"চিঠিখানা তুমি নিজেই নিয়ে তাঁকে দাও গে। তিনি তোমার চাঁদা দু'টাকা ক'রে দেবেন।"

আনন্দ ব্যাপারী খানিক ভেবে তাতেই রাজী হয়ে সেই চিঠি নিজেই নিয়ে এলো। সে লেখাপড়া আদৌ জান্‌তো না—আর এই কান্ডটা গোপন রাখ্‌তেই চেয়েছিল। অনেক ভেবে ভয়ে ভয়ে সে বোটের মধ্যে এসে রবীন্দ্রনাথের হাতে ঐ চিঠি দিল। তিনি চিঠি পড়েই প্রচন্ড হেসে উঠলেন। তাঁর হাসি দেখে ব্যাপারীর চক্ষু ছানাবড়া।

রবীন্দ্রনাথ হাসি থামিয়ে বল্‌লেন "আনন্দ ব্যাপারী, তুমি অতি গরীব মানুষ, তোমার মত গরীরকে অনঙ্গবাবুরা ধরেছে চাঁদা! কী অন্যায় কান্ড! কী অত্যাচার। ওহে অনঙ্গ শোনোতো—"

আনন্দব্যাপারীর মুখখানা শুকিয়ে আমচুর। বাবুমশাই অনঙ্গবাবুকে বল্‌লেন—"তোমরাও যেমন। আনন্দ ব্যাপারীর মত গরীবের কাছে আবার চেয়েছ চাঁদা।"

অনঙ্গবাবু উকীলের চিঠি পড়ে হাসবেন কি কাঁদবেন ঠাওর পেলেন না। বাবু মশাই বল্‌লেন,—"যাও আনন্দব্যাপারী, তোমাকে ইস্কুল ঘরের জন্যে এক পয়সাও দিতে হবে না।" তিনি আবার হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

ব্যাপারী ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বাড়ি ফিরছে। পথে অনঙ্গবাবুর সঙ্গে দেখা। তিনি বল্‌লেন—"কিহে ব্যাপারী, তুমি বড্ড গরীব আর জমিদারের কোন তোয়াক্কা রাখো না, কেমন? কিন্তু বলিহারী তোমার সাহস।"

আনন্দ ব্যাপারী বিশ ত্রিশ বিঘা জমি এবারে বন্দোবস্ত নেবে অনঙ্গবাবুকে ধরে, ভিতরে ভিতরে এই রকম তার মতলব ছিল। সে দেখ্‌লে—উকীলবাবু তাকে আচ্ছা শিক্ষা দিয়েছেন। তাকেও শয়তানে ধরেছিল।

সে বল্‌লে "আমি পঁচিশ টাকা দেবো হুজুর। আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন।"

আনন্দ ব্যাপারী সেই রাত্রেই অনঙ্গবাবুর কাছে পঁচিশ টাকা দিয়ে গেল। তার দুই তিন দিন পরে সে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে তারই নিজের জমির উপর জনমজুর লাগিয়ে তদ্বির করে খড়ের ঘর তুলে দিল। ঘর শেষ হ'লে সে অনঙ্গবাবুকে ডেকে এনে ঘর দেখিয়ে বল্‌ল, "ছি ছি! সামান্য পঁচিশ টাকা আমার হাতের ময়লা। তার জন্যে আমার চৌদ্দ পুরুষ নরকস্থ হ'ত। আমায় ভুতে পেয়েছিল; আমায় পায়ে রাখ্‌বেন বাবু!"

এ খবর অনঙ্গবাবু রবীন্দ্রনাথকে দিয়েছিলেন। শুনে তিনি একটুখানি হেসেছিলেন মাত্র। দিন দশেক পরে আনন্দ ব্যাপারী তাঁর কাছে বোটের উপর এক দরখাস্ত এনে প্রণাম করল—"মহামহিম মহিমার্ণব শ্রীল শ্রীযুক্ত বাবু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদার মহাশয় প্রজানুরঞ্জকেষু— ধর্মাবতার প্রবল প্রতাপেষু —হুজুরবাহাদুরের চরে কিছু জমি প্রার্থনা। ব্যবসা বাণিজ্যে বড় লোকসান, —গরীবের পেটের ভাতের জন্য কিছু জমি প্রার্থনা করি।"

রবীন্দ্রনাথ জমি দেবার হুকুম দিলেন। সেই থেকে আজ দশ বিঘা, কা'ল দশ বিঘা করে জমি নিয়ে আনন্দব্যাপারী মস্ত জোদ্দার হয়ে উঠ্‌ল—ব্যবসা আর মহাজনী তো ছিলই।

ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছর আগে যখন বাংলার জমিদারেরা প্রজাশোষণের নানান্‌ উপায় উদ্ভাবনে মাথা ঘামাতেন, তখন জমিদার রবীন্দ্রনাথ কি করতেন, ঐ রকম কাহিনীগুলোই তার সাক্ষী দেয়। তিনি বাংলাব অসহায় গরীব প্রজাদের জন্য যা করেছেন এবং যা করতে চেয়েছিলেন, সে কাহিনী এখন পর্যন্ত সুপ্রচারিত হয়নি; হ'লে দেশের অনেক উপকার হ'ত। এসব কাজে বহু ক্ষতি স্বীকার করেও রবীন্দ্রনাথ কোন সূত্রেই আত্মগরিমা প্রকাশ করেন নি। তাঁর বহু পত্র (পারিবারিক ও ব্যক্তিগত) ছাপা হয়ে প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু সে চিঠির কোন খানিতেও তিনি এই সব কাজে অর্থনাশ ও মনস্তাপের কথা ঘুণাক্ষরেও প্রকাশ করেন নি, সে একটা আশ্চর্য ব্যাপার। দেশ যখন অনগ্রসর তখন তিনি নিজের শক্তির বলে তাকে নাড়া দিতে চেয়েছিলেন, কারণ তখনকার দেশনেতারা তাঁর "স্বদেশী সমাজ" ও "পাবনা প্রাদেশিক সম্মেলনের অভিভাষণের" পরামর্শ এবং সে সময়কার বহু বক্তৃতা ও প্রবন্ধে তাঁর জাতিগঠন মূলক চিন্তা ধারার কোন মূল্যই দেন নি।

তাঁর সে সময়কার পরীক্ষা মূলক পল্লীসংগঠনের চেষ্টা অনেকাংশে ব্যর্থ হলেও তার মূল্য যে কত সুদূর প্রসারী আজ তা দেশের মনীষিরা বুঝছেন।

জানকী রায়

আমরা তখন ইস্কুলে পড়ি। একবার শিলাইদহ সদর কাছারীতে পুণ্যাহের নিমন্ত্রণ খেতে গিয়েছিলাম। শুধু খাওয়া নয়, যাত্রাগান শুনবারও নিমন্ত্রণ ছিল। সদর কাছারীর প্রকাণ্ড প্রাঙ্গণে কোন্ এক বিখ্যাত যাত্রারদলের আসর বসেছে। চাষীভদ্দর সকল শ্রেণীর প্রজা জোদ্দারেরা দলে দলে এসেছে যাত্রা শুন্‌তে। লোকে লোকারণ্য। আলোয় সমস্ত কাছারীবাড়ি ঝলমল করছে।

সন্ধ্যার পরেই নিমন্ত্রণ। কাছারীর পুরোনো মেসের বারান্দায় আর সামিয়ানা-খাটানো উঠোনে পাতা পড়েছে। আমরা খেতে বসলাম আমাদের বাড়ির কর্তাদের সঙ্গে। একজন নূতন অপরিচিত ভদ্রলোক; সৌম্যমূর্তি. মাথায় টাক, শ্যামবর্ণ একাহারা চেহারা খালি গায়ে নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়ন করছিলেন, পরিবেশনের ব্যবস্থা করছিলেন আর চাকর বরকন্দাজদের হুকুম করছিলেন। আমার বড়দাদা স্থানীয় স্কুলের হেডমাষ্টার। তিনি বললেন "ইনি নূতন ম্যানেজার। পরগণার সেটেলমেণ্টের ভার নিয়ে এসেছেন। বড় একরোখা ম্যানেজার, নাম জানকীনাথ রায়।"

কড়া ম্যানেজার শুনে একটু ঘাবড়ে গেলাম। যাহোক দক্ষিণ হস্তের কাজ শেষ করে যাত্রার আসরে গিয়ে দেখি, গান আরম্ভ হবার আর দেরী নাই। কিন্তু আসরে লোক গিজ গিজ করছে, তিলধারণের জায়গা নেই। বরকন্দাজেরা লোকের ভিড় নিয়ন্ত্রণ করতে হিম্‌সিম্ খেয়ে যাচ্ছে, যাত্রার কনসার্টের সঙ্গে লোকের হট্টগোল চল্‌ছে। বসবার জায়গা পাবার সম্ভাবনা নেই। এমন সময় সেই নূতন ম্যানেজার জানকীবাবু সেখানে এসে দু'তিনজন বরকন্দাজকে চোখের ইঙ্গিত করতেই তারা গোলমাল থামিয়ে অনেকের বসবার জায়গা করে দিল। তারপর আসরের মধ্যে গিয়ে আমাদের ডাকলেন। আমরা বহুকষ্টে একটু এগিয়ে যেতেই তিনি আমাদের তিন চার জনকে হাত ধরে কোলে করে তুলে আসরের মধ্যে বেহালাদারদের পাশে দিব্যি জায়গা করে বসিয়ে দিলেন। কড়া ম্যানেজার জানকীবাবুর প্রতি আমাদের মনের মধ্যে একটা শ্রদ্ধা ও ভালবাসার ভাব জেগে উঠ্‌লো।

পুণ্যাহের কিছুদিন পরেই দেখি কাছারীতে দিনরাত লোকে লোকারণ্য। শুধু প্রজাদের আনাগোনা নয়, অনেক নূতন আমলা বরকন্দাজ নিযুক্ত হ'য়েছে। কাছারীর দোতলায় নূতন আফিস বসেছে। আমলাফয়লা যেন চারগুণ বেড়ে

গিয়েছে—শ্নল্ম সেটেলমেণ্টের সেরেস্তা বসেছে। তার কর্তা জানকী রায়, সেই কড়া ম্যানেজার।

একদিন বাজারের সামনে মাঠে হাডু-ডু খেলবার সময় দেখি, জানকীবাব্ অন্যান্য আমলাবাব্দের সঙ্গে বাজারে আসছেন। বাঃ, বেশতো সাদাসিধে শান্তশিষ্ট মান্ষটি, সবার সঙ্গে হাসিঠাট্টা গল্পগ্জব করছেন। বাজারের অনেক লোক বলতে লাগলো—"খ্ব ভালো লোক, কিন্তু সেরেস্তায় বস্লে একেবারে বাঘ। জরিপ জমাবন্দীতে একটুখানি ফাঁকি দেবার জো নেই বাবা। আমীন ম্হ্রীর একেবারে দফারফা।

বাস্তবিক সেকালের আমীনদের প্রজারা আদৌ ভালো চোখে দেখতেন না। তাদের ধারণা, আমীনের জরিপের শিকল যেন তাদের গলায় গাঁথবার জন্যই তৈরি হ'ত। তারা আমীনের শিকলকে বাঘের মত ডরাতো।

জানকীবাব্ প্রথম জীবনে গভর্ণমেণ্টের সেটেলমেণ্ট বিভাগে কান্নগোর পদে কাজ করতেন। অল্প বেতনভোগী নীচ-প্রকৃতির আমীনদের অত্যাচার ও দ্নীতি দেখে তিনি ঐ চাকরীতে বীতশ্রদ্ধ হ'য়ে চাকরী ছেড়ে দেন। সেই সময়ে ১৩০৩ সালে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে নিজের জমিদারীতে ডেকে এনে চাক্রী দেন। তখন তাঁর জমিদারীতে গভর্ণমেণ্ট সেটেলমেণ্টের কাজ শ্র্ হয়েছে এবং তাঁর শিলাইদহ ও কালীগ্রাম দ্ই জমিদারীতেই সেটেলমেণ্ট কাজ পরিচালনার জন্য একজন স্দক্ষ ও ন্যায়নিষ্ঠ কর্মচারীর বিশেষ প্রয়োজন হ'য়ে পড়েছিল।

যে পদ্ধতিতে সরকারের সেটেলমেণ্ট কাজ পরিচালিত হবার নিয়ম আছে তাতে এক একটা বড় জমিদারীর সমস্ত রকম জমিজমার স্বত্ব সাব্যস্ত, খাজনা ধার্য, জমিজমার পরিচয়, শ্রেণীবিভাগ, কমিবেশী, দখল, সীমানা ইত্যাদি সব রকম জটিল ব্যাপারের তদন্ত জরিপ ও কাগজ পত্র তৈরী করতে কমপক্ষে এক বৎসরের উপর সময় লাগবে এবং অনেক কর্মচারীরও দরকার হ'য়ে থাকে। সাধারণ জোতদার ও কৃষকদের হাঙ্গামার অন্ত থাকে না কারণ সবাই সে সময়, যার যতখানি কৌশল জানা আছে খাটিয়ে নিজ নিজ স্বার্থ ষোলোআনা বজায় রাখবার জন্য প্রাণপনে লড়ে থাকেন। জমিদারের পক্ষে যিনি এই বিষম সমস্যাপ্র্ণ জটিল কাজের দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে থাকেন তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, দক্ষতা ও সত্যনিষ্ঠা কত উচ্চতারবিশিষ্ট হওয়া দরকার তা সহজেই অন্মান করা যায়। এই কাজে জানকীবাব্কেও অনেকবার অনেকরকম কঠোর সমস্যার সম্ম্খীন হ'তে হয়েছিল। প্রজাদের অধিকাংশই সরল অশিক্ষিত চাষী কিন্তু এমন অনেক অর্ধশিক্ষিত পাকা বৈষয়িক প্রজা ও জোতদার আছেন যাঁরা কূট-

কৌশলে চার্চিল আমেরীর মত কূটনীতিবিশারদদেরও ঘোল খাইয়ে দিতে পারেন। এই রকমের ঝানু প্রজাদের পাল্লায় পড়তে হয়েছিল জানকীবাবুকে অনেকবার।

একবার খানাপুরীর (১) সময় চাণক্য-মার্কা জোতদারদের চক্রান্তে শিলাইদহ জমিদারীর একটা বড় মহালের প্রজারা বিদ্রোহী হয়ে ওঠে।

জানকীবাবু কোনরকম জোর জবরদস্তী না ক'রে তাদের বল্‌লেন "তোমাদের মধ্যে যারা জমিদারীর কাগজপত্র একটু আধটু বোঝো এমন পাঁচজন প্রজা এসো আমার কাছে। যদি জমিদার পক্ষের কোন অন্যায় দেখাতে পারো, তবে আমি নিজে এসমস্ত জমি তোমাদের 'খাস খামার' রেকর্ড করিয়ে দিব।" জানকীবাবু তাদের কাগজপত্রের সাহায্যে জলের মত পরিষ্কার বুঝিয়ে দিলেন। শেষে তারা নিজেরাই নির্বিবাদে খানাপুরী কাজ সেরে খুশি হয়ে বাড়ি ফিরে গেল।

এই ব্যাপারের পর জানকীবাবুর উপর ভালমন্দ সমস্ত প্রজার একটা শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের ভাব জেগে উঠ্‌লো। তার পরে প্রায় তিন বছরে ঠাকুর জমিদারের দুই জমিদারীর সেটেলমেণ্টের কাজ জানকীবাবুর কৃতিত্বে বেশ নির্বিবাদে সুসম্পন্ন হ'য়ে গেল। তার পরে তিনি প্রথমে কালীগ্রামের ও পরে শিলাইদহের সদর ম্যানেজার হ'য়ে গেলেন। তিনি প্রকাশ্যে প্রজাদের বল্‌তেন "বাপু, আমি ঢাকাই বাঙাল। আমার বাঙালের গোঁ নড়চড় হবে না। (১)

একবার কালীগ্রাম পরগণার দুইজন অর্থশালী প্রজার জমির স্বত্বসাব্যস্ত নিয়ে অনেকদিন থেকে ভয়ানক গোলযোগ চল্‌ছিল। সেই জটিল গোলযোগ জানকীবাবু এমন সুন্দরভাবে মীমাংসা করে দেন যে সেই প্রজা দু'টী তাঁর নিরপেক্ষ ন্যায় বিচারে অত্যন্ত খুশি হয়ে তাঁকে নগদ টাকা কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ উপহার দিতে চেয়েছিল। জানকীবাবু বলেছিলেন "যদি তোমাদের কৃতজ্ঞতার মূল্য কিছু থাকে তবে তা আমার প্রাপ্য নয়, আমার মনিবের। এটাকা তাঁকে দাও, আমি কিছুতেই নেবো না।" প্রজারা সত্যই এই ব্যাপার রবীন্দ্রনাথকে জানিয়েছিল। তা শুনে তিনি বলেছিলেন "সত্য ধর্ম রক্ষা করে জানকীবাবু জমিদারকে যে অমূল্য পুণ্যফল দিয়েছেন তা জমিদার পেয়েছেন। এর পুরস্কার তাঁরই পাওয়া উচিত, জমিদারের নয়। এই রকম

(১) গভর্ণমেণ্ট সেটেলমেণ্টের একটী প্রাথমিক অধ্যায়।
(১) জানকীবাবুর বাড়ি ঢাকার নিকট পূর্বদী গ্রামে।

সত্যনিষ্ঠার পরিচয় পেয়ে রবীন্দ্রনাথ জানকীবাবুর উপর কতখানি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন, তা তাঁর লিখিত অনেকগুলি পত্রে প্রকাশ করেছেন।

জানকীবাবুর প্রকৃত পরিচয় রবীন্দ্রনাথ নানাদিক দিয়ে পেয়েছিলেন। শুধু তাঁর জমিদারীর কর্মচারী বলে নয় সত্যিকারের মানুষ, কর্তব্যপরায়ণ কর্মী বলেও বটে। তিনি ১৩১৫ সালের ২৯শে চৈত্র জানকীবাবুকে যে উপদেশ দিচ্ছেন, মানুষের কর্মজীবনে সে যে কত বড় অমোঘ আশীর্বাদ তা ভাবলে অবাক হতে হয়—

"তোমার এবং ভূপেশ প্রভৃতির সঙ্গে আমার জমিদারীর কাজের সম্বন্ধ ছাড়া আরো একটি বিশেষত্ব আছে। আমি জমিদারীকে কেবল নিজের লাভ লোকসানের দিক হইতে দেখিতে পারি না। অনেকগুলি লোকের মঙ্গল আমাদের প্রতি নির্ভর করে। ইহাদের প্রতি কর্তব্য পালনের দ্বারা ধর্মরক্ষা করিতে হইবে। এপর্যন্ত যে সকল কর্মচারী ছিলেন তাঁহারা অনেকে কর্মপটু ছিলেন, কিন্তু সকলেই আমাদিগকে পাপে লিপ্ত করিয়াছেন। তোমাদিগকে লইয়া আমি যে একটি নূতন ব্যবস্থা করিয়াছি তাহার মূল উদ্দেশ্যই আমাদের যথার্থ কর্তব্যসাধন করা। তোমরা সকলে মিলিয়া সেই উদ্দেশ্যকে রক্ষা করিবে। তোমাদের কর্ম ধর্মকর্ম হইয়া উঠিবে এবং তাহার পুণ্য তোমরা এবং আমরা লাভ করিব। এই জন্যই তোমাদের চিন্তা ও ব্যবহার কেবলমাত্র বৈষয়িক কর্মের উপযুক্ত না হয় এই দিকে আমার দৃষ্টি আছে। তোমাদের মধ্যে ধৈর্য, ক্ষমা, উদারতার লেশমাত্র যেন অভাব না হয়। তোমরা পরস্পরের সমস্ত ত্রুটি একেবারে ভিতর হইতে সংশোধন করিয়া লইবে। সে সংশোধন কেবলমাত্র ধর্মবলেই হইতে পারে। সেজন্য প্রত্যহই ঈশ্বরের প্রসাদ প্রার্থনা করিয়া নিজের শক্তিকে পবিত্র ও উজ্জ্বল করিয়া তুলিবে। যখনি দেখিবে মনের মধ্যে কাহারও প্রতি গ্লানি আসিয়াছে তখনি সতর্ক হইয়া সত্যপথে সরল পথে তাহা সংশোধন করিয়া লইবে। আবর্জনা কদাচ মনের মধ্যে লেশমাত্র জমিতে দিবে না। তোমাদের চরিত্রে, ব্যবহারে ও কর্মপ্রণালীতে আমাদের জমিদারী যেন সকল দিক হইতে ধর্মরাজ্য হইয়া উঠে। আমাদের লাভই কেবল দেখিবে না, সকলের মঙ্গল দেখিবে। সেই মঙ্গল নিম্নতম কর্মচারীদিগকে উৎসাহিত করিয়া রাখিবে। অধীর হইও না, অসহিষ্ণু হইও না। ঈশ্বরকে আমাদের ধর্মশাস্ত্রে শান্তম্ শিবম্ অর্থাৎ শান্তিময় মঙ্গলময় বলিয়াছে। তাঁহারই আদর্শে মনকে সর্বদা শান্ত ও মঙ্গলময় করিয়া রাখিবে। তাহা হইলে আর্থিক ও পারমার্থিক সকল কাজই ভাল হইবে। ইহাতে সন্দেহ নাই।

"ভূপেশ, অক্ষয়, সত্যকুমার প্রভৃতিকে লইয়া তুমি মাঝে মাঝে এমনভাবে একত্রে কর্মের আলোচনা করিবে যাহাতে তোমার মন ও চেষ্টা তোমাদের কর্মের চেয়েও অনেক বড় হইয়া উঠে। তোমরা যে কাজে আছ সে কাজ তোমাদের লক্ষ্য নহে, তাহা তোমাদের পথ। অতএব লক্ষ্যের দিক তাকাইয়া পথকে ঠিক করিয়া লইবে। এই সম্বন্ধে তোমাদের পরস্পরের মধ্যে একটি যথার্থ ধর্মের যোগ থাকে এই আমার ইচ্ছা। বাধা বিস্তর, বারংবার আঘাত পাইবে, ব্যথাও পাইবে, মাঝে মাঝে স্খলন হইবে, কিন্তু তাহাতে বিচলিত হইও না। অবসন্ন হইও না। সকলকে ধর্মের নামে এক করিয়া টানিয়া লও। তোমাদের পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর অবিচলিত হউক। ঈশ্বর তোমাদের সকলকে এক কল্যাণসূত্রে বাঁধিয়া তাঁহার মঙ্গল কর্মে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত করুন। কর্ম তোমাদিগকে কোন মতেই ক্ষুদ্র করিতে, মলিন করিতে যেন না পারে। ইতি ২৯শে চৈত্র, ১৩১৫।"

জানকীবাবু অন্তরের পরিচয় পেয়েছিলেন তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁকে এই অনবদ্য চিঠিতে উপদেশ ও আশীর্বাদ পাঠিয়েছিলেন যথার্থ কর্মযোগীর মত। স্বদেশী আন্দোলনের সময়ে রবীন্দ্রনাথ অপরিমিত উৎসাহ নিয়ে শিলাইদহে অনেক অর্থব্যয়ে যে তাঁতের কারখানা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সেই স্বদেশী যজ্ঞের অনুষ্ঠানে জানকীবাবু তাঁর দক্ষিণহস্ত ছিলেন। হিন্দু সমাজের নমঃশূদ্র প্রভৃতি অবনত সম্প্রদায়ের উপর নানারকম সামাজিক অত্যাচার তিনি সহ্য ক'রতে পারতেন না। তিনি তাঁর নিজের গ্রামে এবং জমিদারীর কর্মস্থলে এই অস্পৃশ্যতা বর্জনের জন্য আন্দোলন করেছিলেন। তাঁর দেশ থেকে অনেক অত্যাচারিত নমঃশূদ্র পরিবার আনিয়ে জমি দিয়ে তাদের শিলাইদহের চরে বসিয়েছিলেন এবং তাদের সামাজিক জীবন সংগঠনের জন্য কীর্তন ও মহোৎসব প্রভৃতির জন্য নানাভাবে উৎসাহিত করেছিলেন। প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে বাংলার গ্রামগুলিতে হিন্দু ধর্মধ্বজীদের কি কঠোর গোঁড়ামী চল্‌তো তা সকলেই জানেন। সেই সময়ে এই রকম অস্পৃশ্যতা-বর্জনের আন্দোলন করতে কতখানি বুকের পাটা শক্ত হওয়া দরকার তা সকলেই বুঝতে পারেন।

তারপরে জানকীবাবু ছিলেন খাঁটি স্বদেশী। বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনকে তিনি নিজের জীবনের শ্রেষ্ঠ কর্তব্য বলে মনে করতেন; দেশী মোটা তাঁতের কাপড় ছাড়া পরতেন না। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে তিনি মনে প্রাণে গভীর অনুপ্রেরণা পেতেন। সে সময়ে শিলাইদহের আকাশ বাতাস

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানে দিনরাত ভরপুর থাকতো। তাঁর স্বদেশী গান গেয়ে নগর কীর্তনের দল যখন গ্রাম পরিভ্রমণ করতো, তখন তিনি আপিসের কাজ ছেড়ে গানের দলে মেতে উঠতেন।

জানকীবাবুর সময়ে শিলাইদহ কাছারীর বড় আমলাদের মহলে একটা বিরাট অন্তর্বিপ্লব চলছিল; জমিদারের স্বার্থ ছাড়া গ্রামের স্বার্থেরও যোগ ছিল সেই দলাদলিতে গভীর ভাবে। তা ছাড়া রবীন্দ্রনাথ সে সময়ে জমিদারীর কার্য ব্যবস্থার আমূল সংস্কারের জন্য একটা নূতন পদ্ধতির প্রচলন করেছিলেন যাতে তাঁর জমিদারীতে বিশেষতঃ শিলাইদহে একটা তুমুল ঝড় উঠেছিল এবং সেই ঝড়ে ম্যানেজার হিসাবে জানকীবাবু এবং তাঁর সহকর্মীরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই অন্তর্বিপ্লব নিবারণের জন্য রবীন্দ্রনাথকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। তিনি সেই সময়ে জানকীবাবুকে যে অনন্যসাধারণ পত্রখানা লিখেছিলেন (২৪শে ফাল্গুন, ১৩১৫ সালে), সে পত্রখানি আশ্চর্য মানুষ রবীন্দ্রনাথের লোকোত্তর প্রতিভার নিদর্শন—

"আশিস সন্তু

মধু* বোলপুরে আসিয়াছিল। তাহার সঙ্গে আলাপ করিয়া স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম সত্যকুমারের† বিরুদ্ধে তোমার মনে বিকার দেখা দিয়াছে এবং সেই বিকার যথোচিত উপায়ে সংশোধনের চেষ্টা না করিয়া মধুকে তুমি তোমার সহায় করিয়াছ।

"কর্মক্ষেত্রে কেহই আঘাত বাঁচাইয়া চলিতে পারে না। পূর্বেও তোমাকে অনেকের কাছ হইতে অনেক প্রতিকূলতা সহ্য করিতে হইয়াছে। ঈশ্বরের কৃপায় সে সমস্তই তুমি কাটাইয়া চলিতে পারিয়াছ।

"আমি জানি ধর্মে তোমার নিষ্ঠা আছে এবং ভগবানের প্রতি তোমার

* মধুবাবু ছিলেন ঠাকুরবাবুদের সদর দপ্তর কলকাতা আপিসের বিশিষ্ট কূটনীতিজ্ঞ সুদক্ষ কর্মচারী।

† সত্যকুমার মজুমদার, ইনি জানকীবাবু ম্যানেজার থাকা কালে শিলাইদহ সদর কাছারীর সেক্রেটারী নামে এক নূতন পদে বহাল হয়ে আসেন। তাঁর সঙ্গে জানকীবাবুর মনান্তর ঘটে এবং সে মনান্তর অনেকদূর গড়ায়। শিলাইদহের বিশিষ্ট প্রজাদের সঙ্গেও সত্যকুমারবাবুর গ্রাম্য মাইনর ইস্কুল ইত্যাদি নিয়ে বিবাদ হয় এবং তদানীন্তন জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বার্লি সাহেব তা গ্রামবাসিদের পক্ষে মীমাংসা করে দেন। এই সমস্ত বিবাদ বিসম্বাদে দোষী নির্দোষী সম্বন্ধে কোন মন্তব্য করব না। একদিকে জমিদারীর আমূল সংস্কারের চেষ্টা অন্যদিকে কর্মচারীদের অন্তর্বিপ্লব এসময়কার একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

লক্ষ্য স্থির করিয়াছ। এইজন্য তুমি যখন বিচলিত হইয়া সরল পথ পরিত্যাগ কর, তখন তাহাতে আমি চিন্তিত হই। তুমি মধুকে যে পত্র লিখিয়াছ তাহার মধ্যে তোমার স্বভাবসিদ্ধ ধর্মবুদ্ধি প্রকাশ পায় নাই; তাহার মধ্যে গূঢ় বিদ্বেষের ভাষা আছে। আমার তাহা পড়িয়া মনে হইল মধুও সদর হইতে কোনো অত্যুক্তির দ্বারা তোমার মন কলুষিত করিতে চেষ্টা করিতেছে। সেই-জন্য আমি বিশেষ দুঃখিত হইলাম।

"সকল অবস্থাতেই তুমি তোমার উদারতা রক্ষা করিবে, ক্ষমা করিবে, বিচলিত হইবে না। তোমার সেই শক্তি আছে, তোমার পদও সেইরূপ। মধুকে তুমি যে পত্র যে ভাবে লিখিয়াছ তাহাতে মধু খুশি হইয়াছে সন্দেহ নাই। তাহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইয়াছে, কিন্তু ইহাতে তোমার মর্যাদা হানি হইয়াছে। যেখানে তুমি আমাকে পত্র লিখিবার অধিকারী সেখানে মধুকে দলে টানিয়াছ, ইহা তোমার পক্ষে অগৌরবকর। সত্যকুমারকে ডাকিয়া তাহাকে যদি তিরস্কার করিতে সেও তোমার উপযুক্ত হইত।

"সত্যকুমার সম্বন্ধে তোমরা ভুল ধারণা করিতেছ বলিয়া আমার বিশ্বাস। তোমার কোনো কাজের বিরুদ্ধে সত্যকুমার চক্রান্ত করিয়াছে বলিয়া যদি তোমার প্রত্যয় হয় তবে তাহা অমূলক। যদি সমূলকও হয় তবু নিজের মনে কোনো ক্ষুদ্রতা রাখিও না। সংসারে কোথায়ও কোনো পাপ উঠিতেছে যদি দেখ, তবে বাহির হইতেই তাহা মুছিয়া ফেলিবে, তৎক্ষণাৎ তাহার যাহা উচিত প্রতিকার তাহা সারিয়া একেবারে ধুইয়া মুছিয়া ফেলিবে। তাহাকে নিজের মনের মধ্যে কোনোমতেই তুলিয়া রাখিও না। তোমার এই কর্মক্ষেত্রেই কি তোমার চিরজীবনের ক্ষেত্র? এইখানকার বাধা-বিঘ্ন, মান-অপমান, রাগ-দ্বেষ ঈর্ষাই কি তোমার চিরদিনের? প্রতিদিনের আবর্জনা প্রতিদিন ঝাঁট দিয়া ফেল। কোনো ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে তোমার কোন ক্ষুদ্রতায় সহায় করিও না। তাহা হইলে সেই ক্ষুদ্রতা দূর না হইয়া কেবলি প্রশ্রয় পাইবে। তুমি নিশ্চয় জানিবে ক্ষুদ্রতার বন্ধুরা যখনি সুযোগ পাইবে তখনি তোমার শত্রুপক্ষের সহিত যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইবে না। ইহাদের সঙ্গে কেবলমাত্র কর্মের সম্বন্ধ রাখিবে, হৃদয়ের সম্বন্ধ রাখিও না।

"আমি তোমাকে শ্রদ্ধা করি বলিয়াই এরূপ পত্র লিখিতে পারিলাম। তোমার চিত্ত নির্বিকার থাকে ইহাই দেখিতে আমার আনন্দ। তুমি যে কাজ লইয়া আছ সেই কাজের চেয়েও বড় হইয়া থাকিবে। তুমি তো কেবল জমিদারীর ম্যানেজার নও, তুমি মানুষ, মনুষ্যত্বে ভূষিত। কাহারও প্রতি-কূলতাতেও সে কথা কোনোদিন ভুলিও না। নিজের আত্মাভিমানে আঘাত

পাইয়া অন্যকে অবিচার করিও না; কারণ তাহা হইলে নিজের যথার্থ গৌরব হারাইবে। ইতি, ২৪শে ফাল্গুন, ১৩৬৩।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

"পুঃ। আমি তোমাকে এই যে পত্র লিখিলাম ইহা তোমার প্রতি রাগ করিয়া লিখি নাই। আমি তোমার কল্যাণ কামনা করিয়াই লিখিয়াছি। তোমার প্রতি আমার স্নেহ আছে এবং আমি তোমাকে বাহিরের শত্রুতা হইতে অনেকবার রক্ষা করিয়াছি। এবার ভিতরের প্রবলতর শত্রুর সম্বন্ধে তোমাকে সতর্ক করিয়া দিলাম।—বোলপুর।"

জানকীবাবু রবীন্দ্রনাথের জমিদারী ব্যবস্থার সংস্কার প্রচেষ্টার প্রবীণ সহায় ছিলেন। তিনি সাহায্যকারী হিসাবে পেয়েছিলেন শ্রীযুক্ত ভূপেশচন্দ্র রায়কে। ভূপেশবাবু ছিলেন শান্তিনিকেতনের সৃষ্টির যুগের আত্মত্যাগী শিক্ষক ও কবি স্বর্গত সতীশচন্দ্র রায়ের ভাই। রবীন্দ্রনাথের জমিদারী সংস্কারের মূল উদ্দেশ্য ছিল গ্রামে গ্রামে সুপরিকল্পিত পঞ্চায়েৎ প্রবর্তন। জমিদারীর গতানুগতিক দুর্নীতিপরায়ণ শাসন সংরক্ষণের পরিবর্তে জমিদারী শাসনযন্ত্র প্রাচীন বাংলার পঞ্চায়েৎ প্রথার মধ্যে মিশিয়ে দেওয়া—পল্লীস্বরাজের প্রবর্তন। তাঁর নীতি ও কার্য, ব্যবহার ও পরিচয় বিশ্লেষণ করতে হলে পৃথক প্রবন্ধের প্রয়োজন।

১৩১১ সালে জানকীবাবু পেন্‌সান নিয়ে অবসর গ্রহণ করেন। আবার বছর দুই পরে তাঁকে রবীন্দ্রনাথ ডেকে এনে জমিদারীর ম্যানেজারের পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। শেষে ১৩১৮ সালের প্রথমে তিনি শেষবার পেন্‌সান সহ অবসর নিয়ে কিছুদিন স্বগ্রামে এবং শেষে বৃন্দাবনবাসী হয়েছিলেন। বৃন্দাবনেই তাঁর মৃত্যু হয়। জানকীবাবুর চরিত্রের একটি বৈশিষ্ট্যের কথা আগে বলি নাই। তিনি ছিলেন মনে-প্রাণে খাঁটী বৈষ্ণব। চৈতন্যদেব চণ্ডালকে ভালবেসে কোল দিয়েছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম ও আচার ব্যবহারের মধ্যে এইটিতে তাঁর প্রবল আগ্রহ ছিল।

জানকীবাবু ম্যানেজার থাকা কালে জানিপুরের দ্বারিকানাথ বিশ্বাসের চাকরী ও জমিজমা সম্বন্ধে যে গোলযোগের সৃষ্টি ও মীমাংসা হয়েছিল তার উল্লেখ করাটা দরকার মনে করি। সেই ব্যাপারটা একাধিক কারণে সকলেরই শিক্ষাপ্রদ। সেই ঘটনাতেই প্রমাণ পাওয়া যায় রবীন্দ্রনাথ কেমন আদর্শ ও সহৃদয় জমিদার ছিলেন। বিভিন্ন চরিত্রের পল্লীবাসীকে তিনি কেমন সুস্পষ্ট, যথার্থ গভীরভাবে চিনতে পারতেন। সেই ঘটনাটা বিবৃত না করে দ্বারিক

বিশ্বাসের সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অনবদ্য চিঠিখানা পাঠকপাঠিকাকে উপহার দিলাম—

"আশিস সন্তু

"কর্মের নিয়ম অনুসারে দ্বারিক বিশ্বাসকে যে ভাবে চালনা করিতে হইবে তাহা দৃঢ়ভাবেই স্থির করা আবশ্যক; সে সম্বন্ধে আমি কোনো শৈথিল্য করিতে বলি না। আমি কেবলমাত্র বলি তাহার প্রতি রাগ করিয়া কোনো কাজ না করা হয়। স্বার্থরক্ষার জন্য প্রবল ব্যক্তি স্বভাবত চাতুরী অবলম্বন করিয়া থাকে। সে স্থানে দুর্বল পক্ষের বেলায় চাতুরী দেখা গেলে আমরা যে রাগ করি সে চাতুরীর প্রতি রাগ নহে, দুর্বলের প্রতিই রাগ। কারণ এই দ্বারিক বিশ্বাসই চতুরতার দ্বারা আমাদের কোন কাজ উদ্ধার করিলে প্রশংসা ও পুরস্কারের পাত্র হয়। এমন স্থলে নিজের স্বার্থ সাধনের উদ্দেশ্যে চাতুরী প্রয়োগ দেখিলে আমাদের রাগ করিবার কারণ নাই। আমার প্রজারা নিজের বৈষয়িক স্বার্থ-রক্ষার জন্য যখন চতুরতা করে আমার মনে তখন রাগ হয় না। তাহাদের বেদনা ও ব্যাকুলতা বুঝিবার আমি চেষ্টা করি।

"দ্বারিক বিশ্বাসকে* আমি তোমার কাছেই ফিরাইয়া দিব, নিজে কোনো হুকুম দিব না। তোমরা যেটা কর্তব্য বোধ করিবে, তাহাই করিবে। কেবলমাত্র দণ্ড দিবার জন্য কিছুই করিবে না। দ্বারিক বিশ্বাস যদি প্রবল হইত তবে সে আমাকে দণ্ড দিবার চেষ্টা করিত। আমি দৈবক্রমে প্রবল হইয়াছি বলিয়াই

*দ্বারিকানাথ বিশ্বাস ঠাকুর জমিদারেরই একটা জটিল ফৌজদারী মোকর্দমা সম্পর্কে ঠাকুরবাবুদের কর্মচারী নিযুক্ত হয়েছিলেন। এই মোকর্দমাটি সুবিখ্যাত "তের ছটাকের মামলা" নামে স্থানীয় লোকের কাছে সুপরিচিত। ঠাকুরবাবু ও নড়াইলের প্রতাপান্বিত জমিদার উভয়ের জমিদারীর সীমানগত ঐ তের ছটাক জমির জন্য বহুদিন ফৌজদারী ও দেওয়ানী মোকর্দমা করেছিলেন; পরে অবশ্য ঠাকুরবাবুই জয়লাভ করেন এবং আপোষে উভয় জমিদারের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়েছিল। এই মোকর্দমায় অনেক টাকা খরচ হয়েছিল এবং জনিপুরবাসী দ্বারিক বিশ্বাসই ঐ মামলা মোকর্দমার তদ্বিরকারক ছিলেন। মামলা চালাবার সময় তিনি ন্যায় অন্যায় অনেক কাজই করেছিলেন এবং নিজের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কৌশল অবলম্বন করে গোপনে অনেক জমিজমা করে নিয়েছিলেন। ঐ মোকর্দমা শেষ হয়ে গেলে ম্যানেজার জানকীবাবু দ্বারিক বিশ্বাসের কৌশল ও স্বার্থপরতার প্রমাণ পেয়ে তাঁকে শাস্তি দেবার জন্য প্রস্তাব করেন। অসাধারণ মনস্তত্ত্ববিদ্ রবীন্দ্রনাথ তাতে মত দেন নাই। তিনি অপরাধী দ্বারিক বিশ্বাসের চাতুরীর পরিচয় পেয়েও তাঁকে ক্ষমা করে-ছিলেন। অপরাধী চিরকালই শাস্তির যোগ্য এইকথা জানিয়ে জানকীবাবু রবীন্দ্রনাথের এই আদেশের প্রতিবাদ করেছিলেন।

যে ক্রোধ পরিতৃপ্তির জন্য তাহাকে দণ্ড দিব এবং সে তাহা অগত্যা বহন করিবে,
এ আমি সঙ্গত মনে করি না। ১৮ই আষাঢ়, ১৩১৩।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।”

*　　　*　　　*

জমিদারীর নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জানকীবাবু দ্বারিক বিশ্বাসকে কর্মচ্যুত করে তাঁর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে কর্তব্য সম্পাদন করলেন. কিন্তু অপরাধী দ্বারিক বিশ্বাসের উপর রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতি তখনো অটুট ছিল।

অপরাধী দ্বারিক বিশ্বাসের চরম শাস্তির ব্যবস্থা হ'য়ে গেলে রবীন্দ্রনাথ ১৩১৫ সালের ৮ই ফাল্গুন ভূপেশবাবুকে যে পত্র লিখেছিলেন, তাতে তিনি কতখানি মনোবেদনা প্রকাশ করেছেন তার অপূর্ব অভিব্যক্তিতে মুগ্ধ হতে হয়—

“কল্যানীয়েষু—দ্বারিক বিশ্বাসের জোত পাঁচশত টাকায় অন্যের সহিত বন্দোবস্ত করিয়াছ ইহাতে আমি বড় দুঃখিত হইয়াছি; কারণ আমি দ্বারিককে নিজের মুখে আশ্বাস দিয়াছিলাম যে তুমি এই জোত ইস্তাফা দিলে জোত হইতেই আমাদের দেনার টাকা বন্দোবস্ত, নজর ইত্যাদি দ্বারা উদ্ধার করিয়া তোমারই সহিত বন্দোবস্ত করিব। তোমার বিনা এতেলায়* স্বেচ্ছামত কুঞ্জদের† সহিত বন্দোবস্ত করিয়া আমার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করাতে আমার পক্ষে একান্ত লজ্জার কারণ ঘটাইয়াছ। আমি এরূপ আশা করি নাই। দ্বারিক বিশ্বাসের এরূপ আশাভঙ্গ করিয়া এষ্টেটের যে বিশেষ লাভ হইল আমি তাহা মনেই করি না। যে সম্পত্তিতে যাহার অধিকার আছে, আমি যথাসম্ভব রক্ষা করিতেই চেষ্টা করি। এই কারণেই চাক্‌রাণ জমি‡ আমি অল্প নজরেও পূর্বাধিকারীকে ছাড়িয়া দিয়াছি। তোমরা সামান্য কারণে তাহার অন্যথা করিয়া যে মনোবেদনর সৃষ্টি করিয়াছ তাহা কোনো মতেই মঙ্গলকর হইতে পারে না এবং আমি দ্বারিক বিশ্বাসকে আশ্বাস দিয়াও তাহাকে রক্ষা করিতে পারিলাম না ইহাতে আমার গ্লানি রহিয়া গেল। উচ্চ ডাকে নিলাম ডাক করাইলেই বা কি পার্থক্য হইত তাহাও বুঝি না। এ সম্বন্ধে তুমি কি

* এতেলা এর ইংরাজী রিপোর্ট।

†জানিপুরের কুঞ্জবিহারী সরকার।

‡চাকরান জমি=স্থায়ী কাজের জন্য চাকরদের বা কর্মচারীদের যে জমি দেওয়া হয়।

রিপোর্ট করিয়াছ তাহা আমি জানি না, কারণ তাহা কলিকাতার সেরেস্তায় গিয়াছে।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

* * *

রবীন্দ্রনাথের ঐ পত্রের বৈদ্যুতিক ক্রিয়ায় দ্বারিক বিশ্বাসের চাকা ঘুরে গেল। রবীন্দ্রনাথের সহানুভূতিপূর্ণ ন্যায়সঙ্গত ব্যবস্থায় সমস্ত অবস্থাই পরিবর্তিত হয়ে গেল। জমিটা নিলাম হওয়াতে দ্বারিক বিশ্বাস ঠাকুরবাবুদের দেনা থেকে মুক্ত হয়েও কিছু টাকা পেয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ এই সংবাদ পেয়ে শান্ত হলেন, লিখলেন (১৫ ফাল্গুন, ১৩১৫)—

"আশিস সন্তু

"ইতঃপূর্বেই সত্যকুমারের পত্রে দ্বারিক বিশ্বাসের জোত নিলামের সমস্ত বিবরণ বিস্তারিত অবগত হইয়া আশ্বস্ত হইয়াছি। তাহার সম্বন্ধে সমুচিত ব্যবস্থা হইয়াছে সন্দেহ নাই।

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

জমিদার রবীন্দ্রনাথ, মানুষ রবীন্দ্রনাথের অলোকসামান্য চরিত্রের উপরে জানকীবাবুর কাছে লিখিত তাঁর চিঠিগুলি অনেকখানি আলোকপাত করেছে। তিনি উপযুক্ত কর্মচারীও খুঁজে বের করতে পারতেন।

জানকীবাবু পেনসান-সহ অবসর গ্রহণ করার পর রবীন্দ্রনাথ তাঁকে যে পত্র লিখেছিলেন, সে রকমের পত্র কোন মনিব কোন কর্মচারীকে লিখেছেন বলে জানি না। সেই অপূর্ব চিঠিখানা পাঠকপাঠিকাকে উপহার দিয়ে আমরা এ প্রসঙ্গ শেষ করি।

বোলপুর

"শুভাশিসাংরাশয় সন্তু—

"এক্ষণে যাঁহারা কর্মের ভার লইয়াছেন* তাঁহারা বর্তমান ব্যবস্থায় তোমার পদ অনাবশ্যক বিধায় তোমাকে অবসর দিয়েছেন ইহা আমার পক্ষে বেদনাজনক।

* এই সময়ে জমিদারীর ভার ম্যানেজিং এজেন্ট শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরীর উপর ছিল। জমিদারীর কাজ দেখা এসময়ে রবীন্দ্রনাথ একেবারে ছেড়ে দেন। জানকীবাবুকে অবসর দেওয়ায় তিনি বিশেষ দুঃখিত হন এবং ভবিষ্যতে তাঁর ছেলেদের জন্য কোন অনুগ্রহ প্রদর্শনের দরকার হলেই তা মঞ্জুরের নির্দেশ দেন।

তুমি চিরদিন কিরূপ সততার সহিত কাজ করিয়াছ এবং ধর্মের দিকে তাকাইয়া অসংকোচে ও নির্ভয়ে আপনার কর্তব্য সম্পন্ন করিয়াছ তাহা আমার অগোচর নাই। তোমার এই নির্ভীক সততায় অনেক সময় তোমার উপরিতন ও নিম্নতন কর্মচারীরা অসহিষ্ণু হইয়া তোমার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার চেষ্টা করিয়াও এ পর্যন্ত কৃতকার্য হয় নাই। তুমি যেরূপ সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্কভাবে ও সম্মানের সহিত পেনসন্ লইয়া কর্ম হইতে নিষ্কৃতিলাভের সুযোগ পাইয়াছ, জমিদারী সেরেস্তার অল্প লোকের ভাগ্যে এরূপ ঘটে। ইহা তোমার অবিচলিত ধর্মনিষ্ঠার ফল। যে ভগবানের প্রতি তুমি সুখে দুঃখে চিরদিনই নির্ভর করিয়াছ তিনি নিশ্চয় তোমার কর্মজাল হইতে মুক্তিলাভকে তোমার পক্ষে কল্যাণকর করিয়া তুলিবেন। অতএব তুমি তোমার বর্তমান ক্ষতি ও অসুবিধাকে তাঁহারই স্বহস্তের দান বলিয়া নিরুদ্বিগ্নচিত্তে শিরোধার্য করিয়া লইবে। তুমি যে অবস্থায় যেখানে থাক, আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। ইহা নিশ্চয়ই জানিবে।

"সহসা তোমার কর্মস্থান হইতে চলিয়া আসিবার জন্য তোমার যে ক্ষতি হইয়াছে তাহা জানাইয়া আবেদন করিলে নিঃসন্দেহেই তাহা পূরণের ব্যবস্থা হইবে। এসম্বন্ধে এষ্টেট্ হইতে তোমাকে সাহায্য করা কর্তব্য বলিয়া মনে করি। অতএব সংকোচ না করিয়া এই সংক্রান্ত তোমার ন্যায্যদাবী উত্থাপন করিতে পার।

"সরকারী যে জিনিসগুলি তুমি সর্বদা ব্যবহার করিয়া আসিতেছ তাহা তুমি সঙ্গে লইয়া যাইবে; তাহার কোন মূল্য দিতে হইবে না।

"আমাদের সহিত পূর্বাপর যেরূপ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের সম্বন্ধ ছিল তাহার লেশমাত্র ব্যত্যয় হয় নাই, ইহা স্থির জানিবে এবং তোমার মঙ্গল সংবাদ পাইলে সুখী হইব, ইহাও মনে রাখিবে। ইতি—১৬ই বৈশাখ, ১৩১৮।*

শুভাকাঙ্ক্ষী

—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।"

* রবীন্দ্রনাথের চিঠি ক'খানা ১৩৪৯ সালের শ্রাবণ ও আশ্বিন সংখ্যা প্রবাসীতে সুসাহিত্যক শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ বসু দুইটি প্রবন্ধে প্রকাশ করেছিলেন। এই পত্র কয়খানা জানকীবাবুর পুত্র শ্রীমান শচীন্দ্রনাথ রায়ের ও বিশ্বভারতী রবীন্দ্রভবনের অনুমতি অনুসারে প্রকাশিত হল। এই সম্বন্ধে শ্রদ্ধেয় নরেন্দ্র বসুর ঐ প্রবন্ধ দুটি পড়লে পাঠক-পাঠিকা উপকৃত হবেন।

কুঠীবাড়ীর গৃহস্থালী

জনতার সামনে খ্যাতিমান পুরুষেরা অনেক আবরণ দিয়ে নিজের আটপৌরে রূপটি ঢাকতে চান তাঁদের আসল রূপটির প্রকাশ পায় তাঁদের দৈনন্দিন গার্হস্থ্জীবনে, লৌকিক বৈষয়িক ও পারিবারিক ব্যবহারে। রবীন্দ্রনাথের গার্হস্থ্জীবনের একটি সত্য কাহিনী আজ বলবো। কাহিনীটি বলেছেন কবির পুরাতন কর্মচারী শ্রীঅনঙ্গমোহন চক্রবর্তী।

অনঙ্গবাবু বহুদিন শিলাইদহে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পারিবারিক কর্মচারী হিসাবে। তখন রথীন্দ্রনাথ কবির উপদেশে জমিদারীর কাজ শিখছেন শিলাইদহে—গ্রাম্যকৃষি-জীবনের-উন্নতিকর নানা কর্মের আয়োজনে। কবি বুঝেছিলেন জমিদারীর উন্নতির অর্থই হচ্ছে পল্লীজীবনের ও কৃষির উন্নতি। তাই তিনি নিজের পুত্র, জামাতা ও অন্তরঙ্গ বন্ধুর পুত্র সন্তোষকুমার মজুমদারকে আমেরিকায় পাঠিয়ে সেখানকার বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিবিদ্যা শিখিয়ে পারদর্শী করে আনেন এবং তাঁদের জমিদারীতে এনে হাতে কলমে চাষ করিয়ে প্রজাসাধারণের মধ্যে উন্নত বিজ্ঞানসম্মত কৃষিপ্রণালী প্রবর্তনের ব্যবস্থা করেন। অবশ্য নানাকারণে তাঁর চেষ্টা সে সময়ে ফলবতী হতে পারে নি, কিন্তু তাঁর সুদীর্ঘ অধ্যবসায় ও কঠোর নিষ্ঠা ও অবিরত ক্ষতি স্বীকার করেও আদর্শে আত্মনিয়োগ দেখে অবাক হতে হয়।

অনঙ্গবাবু চালাতেন মোটর বোট। রথীন্দ্রনাথকে প্রায়ই পদ্মার চরে নানা গ্রামে প্রজাদের কাছে যেতে হত। তাই অনঙ্গবাবু তখন কিছুদিন স্থায়ীভাবে মোটর বোটের ড্রাইভারী করতেন আর নতুন ফসলের চাষ প্রবর্তন তদারক করতেন। একদিন অনঙ্গবাবু বেলা এগারটার পরে পদ্মা পাড়ি দিয়ে শিলাইদহে কুঠীবাড়িতে বিশ্রাম করছেন এমন সময় জানতে পেলেন কলকাতার একজন বিশিষ্ট ভদ্রলোক সেইদিন রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে বিশেষ জরুরী কাজে কলকাতা ফিরে যাবেন। তখন সবে বর্ষার আরম্ভ। রাস্তাঘাট ভাল নয়। সেইদিনই বেলা চারটায় কুষ্টে এসে চিটাগাং মেল ধরানোর আর কোন যানবাহন নেই। আছে কেবল মোটর বোট।

তখন পদ্মার সঙ্গে গোরাই নদীর যোগ ছিল এবং শিলাইদহ থেকে গোরাই নদী দিয়ে জলপথে স্টীমারও চলতো। সেই ভদ্রলোকটির জরুরী কাজের জন্য কাজে কাজেই অনঙ্গবাবুর উপরেই ভার পড়লো।

বেলা ১২টায় শিলাইদহ থেকে না ছাড়লে পদ্মা ও গোরাই নদী দিয়ে মোটর বোট কোন মতেই বেলা চারটেয় কুষ্টে স্টেশনে চিটাগাং মেল ধরাতে পারে না। এ কারণ তাড়াতাড়ি অনঙ্গবাবু কুঠীবাড়িতে স্নানাহার করে নিতে পারলেন না। সামান্য জলযোগ সেরে সেই বিশিষ্ট ভদ্রলোকটিকে নিয়ে ঠিক বেলা ১২॥টায় শিলাইদহ থেকে মোটর বোট ছাড়লেন।

সে সময়ে শিলাইদহ কুঠীবাড়িতে রবীন্দ্রনাথের বিরাট পরিবার। তখন কবিগৃহিণী পরলোকে। কুঠীবাড়িতে রথীন্দ্রনাথ, শ্রীমতী মীরা দেবী ও অন্যান্য অনেকে আছেন। দাসদাসীতে বাড়ি পরিপূর্ণ। সকলে কুঠীবাড়িতেই খেতো থাকতো। দৈনিক প্রতি বেলা ৩০।৪০ জন লোক খেতো। অনঙ্গ-বাবুও অবশ্য কুঠীবাড়িতেই খেতেন ও থাকতেন।

অনঙ্গবাবু যখন কুষ্টের কাজ সেরে শিলাইদহ কুঠীবাড়ি পৌঁছিলেন তখন বেলা প্রায় শেষ হতে চলেছে। তিনি হাত পা ধুয়ে খাবার জন্যে রান্নাবাড়িতে পৌঁছিলেই পাচক ব্রাহ্মণ গালে হাত দিয়ে ব'সে পড়লো। ভুলক্রমে সে সেদিন অনঙ্গবাবুর খাবার রাখতেই ভুলে গেছে। সর্বনাশ! অনঙ্গবাবু না খেয়ে কুষ্টে গেছেন এ বিষয় তার হুঁস ছিল না। অনঙ্গবাবু "ঠাকুর ভাত দাও" বলে দু'তিনবার ডেকে বাইরে এসে নিজের ঘরে ঢুকতেই শুনতে পেলেন রবীন্দ্রনাথ দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে কঠোর স্বরে জোরে জোরে নিজের মেয়েকে বলছেন—"মীরা এই তো তোমাদের সংসার! একটা লোক তেতে-পুড়ে এসে না খেয়ে ব'সে রইলো। আর তোমরা দোতলায় ব'সে বই পড়ছো। সবই ঠাকুর চাকর করবে! এতো বেশ গেরস্তালী।" এই বলেই পাচক আর রান্নাঘরের ঝিকে ডাকতে লাগলেন। ব্যাপার দেখে মীরাদেবী নিচে নেমে এসে লুচি বেলতে লাগলেন। চাকর দাসীরা আধ ঘণ্টার মধ্যেই অনঙ্গবাবুকে লুচি, আলুর তরকারী, বেগুন ভাজা ইত্যাদি খাইয়ে দিলেন। সেদিন থেকে কুঠীবাড়ির ব্যবস্থার একেবারে আমূল সংস্কার হয়ে গেল।

গৃহস্থ রবীন্দ্রনাথের অনেক অতিথি শিলাইদহে আসতেন। লোকেন্দ্র পালিত, জগদীশচন্দ্র বসু, যতীন বসু, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ প্রায়ই আসতেন। একবার জগদীশচন্দ্র শিলাইদহে এসে শাকের নানারকম তরকারী খেতে চাইলেন। শাকভাজা, শাকের ঘণ্ট, শাকচচ্চড়ি. ঝোল ইত্যাদিতে প্রায় বিশ রকমের শাকের তরকারী বিজ্ঞানাচার্যকে খাওয়ানো হ'ল। তিনি পদ্মার চরের কচ্ছপের ডিম খেতে খুব ভাল বাসতেন। তারও ব্যবস্থা হয়েছিল। পিয়ার্সন সাহব, লরেন্স সাহেব এ'রা বাঙালীর খাবার খেতে ভালবাসনে। লরেন্স সাহেব রথীন্দ্রনাথকে ইংরাজী পড়াতেন। তিনি গেঁয়ো বাঙালীর মত হুঁকোয়

তামাক খাওয়া শিখে ফেলেছিলেন। শান্তিনিকেতনের শিক্ষকেরা ও ছাত্রেরাও অনেকেই আসতেন। বহু কবি ও বিশিষ্ট সাহিত্যিককে রবীন্দ্রনাথ শিলাই-দহের শান্ত পল্লীশ্রী উপভোগ করবার জন্য নিমন্ত্রণ করে আনতেন এবং তাঁদের আতিথ্য সৎকারের বিশেষ আয়োজন থাকতো। মোট কথা শিলাইদহে রবীন্দ্র-নাথ একা বা সপরিবারে যখনই থাকতেন তখনই তাঁকে পাকা গেরস্থালী পাততে হ'ত।

রবীন্দ্রনাথ নিজে শিলাইদহের 'বড়োনের ধানের' লাল-রংএর সুগন্ধি আতপ চাউলের ভাত, তারই সরু চিড়ে-ভাজা খেতে ভালবাসতেন। তিনি বহুদিন আতপ চাউলের ভাত এবং আলু, কলা, পটল, ডালবাটা-ভাতে খেতে অভ্যস্ত হয়েছিলেন। নিজে আহারে বিহারে এত সাদাসিধে ছিলেন যে, জমিদারের পক্ষে সেরকম কখনো দেখা যায় না। তাঁর গৃহস্থ জীবনের কিছু কিছু চিত্র আমি অন্যান্য কাহিনীতে দিয়েছি। রবীন্দ্রনাথের ভৃত্যভাগ্য ছিল। তিনি সবসময়েই সত্যিকার প্রভুবৎসল চাকর সঙ্গে আন্‌তেন এবং তাদের খুব ভালবাস্‌তেন।

একবার একজন নিকারী (মৎস্য বিক্রেতা) প্রকাণ্ড এক রুই মাছ এনে তাঁর কাছে দরবার শেষ করে ফিরে যাচ্ছে এমন সময় রবীন্দ্রনাথ তাকে পাঁচটা টাকা নেবার জন্য বহু অনুরোধ করতেও সে টাকা নিতে কিছুতেই রাজী হ'ল না। তখন তিনি বললেন,—"তা হলে তোমাকে মাছ খেয়ে যেতে হবে—না খেয়ে গেলে তোমার হুকুম নাকচ করে দেবো।" সে রান্নাবান্না শেষ হবার পর মহাস্ফূর্তিতে খেতে বসেছে এমন সময়ে রবীন্দ্রনাথ সামনে এসে জিজ্ঞেস করলেন, "মাছ কেমন রান্না হয়েছে, রান্নাবান্না কেমন হয়েছে, ভাল লাগছে তো?" সে লোকটি তো মহাখুশি "হুজুর, রাজভোগ—রাজভোগ"। রবীন্দ্র-নাথ জানতেন গ্রামের লোকেরা সন্দেশ খেতে পায় না। তিনি লোকটিকে প্রচুর সন্দেশ খাইয়ে দিলেন; সেও খেলো খাবার মত খাওয়া।

একবার শিলাইদহে পুণ্যাহের সময়ে প্রজারা যখন সার বেঁধে খাচ্ছে, এমনি সময় এক বরকন্দাজ-সঙ্গে হঠাৎ রবীন্দ্রনাথ এসে পড়লেন, তখন রাত প্রায় নটা! প্রজাদের খাওয়া দেখতে ঐ সময়ে তাঁকে আসতে দেখে সবাই তো আকাশ থেকে পড়লো।

ধন নয়, মান নয়, কিছু ভালবাসা

জমিদারীর আমলা

রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁর জমিদারীর আমলাদের কিরকম দুর্গতি হত তারই একটা কাহিনী বলব।

রবীন্দ্রনাথ যখন শিলাইদহে জমিদারী দেখাশুনা করতেন, সে সময়ে তিনি পদ্মায় বোটে বাস করতেন। বোটখানা শিলাইদহ কাছারীর কাছে কুঠীর হাটের কাছে বাঁধা থাকতো। শিলাইদহ কাছারীর আমলারা সকালে বিকালে জমিদারীর কাগজপত্র নিয়ে তাঁর সঙ্গে সেখানে আলোচনা করে আদেশ উপদেশ নিয়ে যেতেন।

শরৎচন্দ্র সরকার নামে একজন অতি বিচক্ষণ চাণক্য-মার্কা আমলা ছিলেন। তাঁর পদ ছিল 'পেশকার' (অর্থাৎ যিনি কাগজপত্র বুঝিয়ে পেশ করেন)। তিনিই অধিকাংশ সময় বোটে গিয়ে বাবুমশায়ের কাছে দরকারী কাগজপত্র পেশ করে আদেশ উপদেশ আনতেন। শরৎবাবু ছিলেন জমিদারী সেরেস্তার ঝানু আমলা; ক্ষুরধার বুদ্ধি আর পাকা বৈষয়িক বলে তাঁর খুব নাম ছিল। গানবাজনার শখও তাঁর ছিল।

জমিদারীর একঘেয়ে নানা আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে শরৎবাবুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বাঙলা দেশের সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে একটু-আধটু আলোচনা জুড়ে দিতেন। জমিদারীর আমলা বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতেন না। একদিন শিবু সা'র কীর্তনের কথা তুলে রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণবধর্ম ও রসতত্ত্ব নিয়ে একটুখানি আলোচনা করে শরৎবাবুকে দু'একটা প্রশ্ন করলেন। শরৎবাবু তো ফাঁপরে পড়ে গেলেন; কি করবেন ভেবে চিন্তে চণ্ডীদাস ,বিদ্যাপতি, জ্ঞানদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিদের দু'চারটা পদ আউড়িয়ে তাঁর আন্দাজী একটা মতামত দিয়ে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ একটু হেসে তাঁর কথাগুলো শুনলেন। ঐ রকম আর একদিন হিন্দুসমাজের অস্পৃশ্যতার আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ, রামমোহন, কেশব-চন্দ্র প্রভৃতির আলোচনার সূত্র ধরলেন। শরৎবাবু এই মহাবিপদে পড়ে মাথা চুলকিয়ে দু'তিনবার কেশে 'চণ্ডালোপি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ' ইত্যাদি বচন ঝেড়ে অস্পৃশ্যতা সম্বন্ধে তাঁর মতামত বলে রেহাই পেলেন। এই রকমই চলতো মাঝে মাঝে। রবীন্দ্রনাথ বেশ বুঝতেন বেচারা অল্পজলের মাছ; নেহাৎ জামদারীর আমলামাত্র। আলাপ জমতো না, কিন্তু তবু রবীন্দ্রনাথ ছাড়তেন না।

শরৎবাবু বাসায় এসে সহকর্মীদের কাছে বলতেন—"ভারি মুসকিল বাবু-মশায়ের সঙ্গে কথা কওয়া। মামলা-মোকদ্দমা, ফৌজদারীফাদা, জমাবন্দী, জলিজ্যেষ্ঠকর হিসাব-নিকাশ এইসব নিয়ে যতক্ষণ আলোচনা চলে, ততক্ষণ বাবুমশাই বুঝতে পারেন যে শরৎ সরকার একখানা চীজ। আবার চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, শঙ্করাচার্য রামমোহন এসে পড়লেই আমার বিপদ। আমি কি বলতে কি বলে ফেলি পাগলের মত, চণ্ডীদাসের সেই, 'দাও মা আমায় তবিলদারী।' এ এক মহা ফ্যাসাদ, আমার তখন প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে আসে, ঘাম দিয়ে আমার জ্বর ছাড়ে। কি করি, আপনারা তো মশাই আমাকে বোটে পাঠিয়েই খালাস; সেখানে গিয়ে আমার কি দশাটা যে হয়—"

এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার জন্য শরৎবাবু এক ফন্দী আঁটলেন। জমিদারীর কাজ শেষ হবা মাত্রেই যাতে অন্য প্রসঙ্গ না এসে পড়ে সেজন্য আগে থেকেই আলোচনাগুলো হালকা করে নিজ অভিজ্ঞতার প্রসঙ্গ টেনে আনতেন যাতে রামমোহন শঙ্করাচার্য নিয়ে বিপদ ঘনিয়ে না আসে। এইসব গল্প শরৎবাবু সবিস্তারে আমাদের শোনাতেন। তিনি অমনি জিজ্ঞাসা করতেন, হুজুর, গরুর দুধটা খেয়ে এখন কেমন আছেন? নিধু ঘোষের বড় কালো গাইএর দুধ। খুব ভালো দুধ। আবার সঙ্গে সঙ্গে মাসকাবারি হিসেবের প্রজার আমানতের জমাখরচ সমস্যা বা বৃষ্টি আদৌ হচ্ছে না, চাষবাসের ক্ষতি হচ্ছে—এইসব প্রসঙ্গ তুলে আলাপ আলোচনা নিজের আয়ত্বের মধ্যে নিয়ে যেতেন। রবীন্দ্রনাথ হাসতেন আর জবাব দিতেন। ঠাট্টাও করতেন—"শরৎ, মাছমাংস খাও তো? কোন্ মাছটা সুস্বাদু খেতে বলতো—ইত্যাদি রসিকতাতেও তিনি ছিলেন অসাধারণ। ঠিক এই প্রসঙ্গেই রবীন্দ্রনাথ নিজে ছিন্নপত্রে লিখেছেন অতি সুন্দর একটি কথা :

"শিলাইদা, ৭ই ডিসেম্বর, ১৮৯৪— * * * সকাল সকাল বেড়াতে বেরই। যতক্ষণ না শরৎ আসে ততক্ষণ মনটাকে শান্তশীতল করে নিই। তারপরে হঠাৎ শরৎ এসে যখন জিজ্ঞাসা করে, আজ দুধ খেয়ে কেমন ছিলেন: কিংবা আজ কি মাসকাবারি হিসাব দেখা শেষ হয়ে গেছে,—তখন বড় খাপছাড়া শুনতে হয়। আমরা নিত্য এবং অনিত্যের ঠিক এমন মাঝখানে পড়ে দুই দিকের ধাক্কা খেয়ে চলে যেতে থাকি। যখন আধ্যাত্মিক কথা হচ্ছে, তখন গায়ের কাপড় এবং পেটের খিদের কথা আনলে ভারি অসংগত শুনতে হয়, অথচ আত্মা এবং পেটের খিদে একত্রেই যাপন করে এল।" * * ছিন্নপত্র. পৃঃ ৩১৩-১৪

বামাচরণ ভট্টাচার্য বলে আর একজন-আমলা ছিলেন, তিনি একটু শিক্ষিত

ছিলেন। তাঁর সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ অনেক বিষয় আলোচনা করে বুঝলেন—এ ব্যক্তি ছড়া, পাঁচালী, লোক-প্রবাদ প্রভৃতির ভক্ত। বামাচরণবাবুকে রবীন্দ্রনাথ ঐরকম ছড়া, পাঁচালী প্রভৃতি সংগ্রহের ভার দেন। আমি বামাচরণবাবুর কাছে মাঝে মাঝে পড়তে যেতাম। দেখতাম তাঁর একখানা প্রকাণ্ড খাতা—তাতে অসংখ্য ছেলেভুলানো ছড়া, পাঁচালীর গানে বোঝাই। আবার গ্রাম্য শব্দের একটা সংগ্রহ তাঁকে করতে হয়েছিল বাবুমশায়ের উপদেশে। মরমী পল্লী কবি লালন সাঁই-এর সমস্ত গানের নকলও বামাচরণবাবু করেছেন। তিনি বলতেন—"বাপু আমার জমিদারী সেরেস্তার এ এক নতুন চাকরী।"

বাঙলার প্রাণের খবর রবীন্দ্রনাথ এমনি করেই নিতেন, তাঁর অশিক্ষিত অর্ধশিক্ষিত জমিদারীর আমলাদের কাছেও। আজ আমরা এসব খবর রাখি কি?

লৌকিক ব্যবহার

রবীন্দ্রনাথ যে উচ্চ বংশ ও সংস্কৃতির মধ্যে জন্মেছিলেন তাতে অতি সাধারণ গ্রাম্য অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত লোকদের সঙ্গে তাঁর মেলামেশার সম্ভাবনা খুবই কম ছিল। এটা খুবই স্বাভাবিক, কারণ আমাদের দেশে কাঞ্চনকৌলিন্য ও মার্জিত রুচির সঙ্গে সঙ্গে আভিজাত্যের এমন একটা কঠিন আবরণ দেশের শিক্ষিত সমাজকে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলে যে তথাকথিত বড়লোক ও সাধারণ লোকের মধ্যে একটা স্বাভাবিক দুরূহ বিভেদ দেশের নাড়ীর সঙ্গে বড়লোকদের সংযোগ একেবারে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তাই দেশের শিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত কৃষক ও গৃহস্থ আজও সমাজে ও রাষ্ট্রে এমন তলিয়ে গেছে যে, তার প্রতিকার অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ছিলেন জমিদার; কিন্তু তথাকথিত সাধারণ জমিদার নন,—সত্যিকার প্রজাহিতৈষী জমিদার। তাঁর মত অভিজাত জমিদারকে দেখে তাঁর অপরিচিতেরা তাঁকে সমীহ ক'রে চলতেন, কিন্তু প্রজা বা কর্মচারীর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ যে কি আশ্চর্য কৌশলে প্রাণখোলাভাবে মিশতেন তা একটা ভাববার জিনিস। এটা তাঁর কবিচিত্তের লীলা। এসব কথা আজ অতি অল্প লোকেই জানেন। সুসভ্য ম্যার্জিত রুচি ধনীর বা বিখ্যাত মনীষীদের সঙ্গে তাঁর আচার-ব্যবহারের কাহিনী অনেকেই জানেন। আজ কয়েকটি বিস্মৃত-প্রায় সত্য কাহিনী বলবো—যাতে তাঁর লৌকিক ব্যবহার কতখানি মধুর, সরল অন্তরঙ্গ ছিল তা বুঝা যাবে। এমন খোলাখুলি ব্যবহার তাঁর মত লোকের কাছে কেউ আশাও করতে পারতো না। সকলেই জনেন, অতি সাধারণ লোকের সঙ্গেও রবীন্দ্রনাথ নিজে হাতে লিখে পত্র ব্যবহার করতেন, সেক্রেটারীদের দিয়ে লেখাতেন না। তাই আমাদের মত অতি সাধারণ লোকের ঘরেও সেই অলোকসামান্য মহাপুরুষের স্বহস্তলিখিত চিঠি সযত্নে রক্ষিত দেখা যায়।

আমার 'সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথে' যজ্ঞেশ্বরের সিদ্ধিলাভের কাহিনী আছে। যজ্ঞেশ্বরবাবু যখন রবিবাবুর জোড়াসাঁকো বাড়িতে চাকরীর উমেদার ছিলেন, তখন রবীন্দ্রনাথ যজ্ঞেশ্বরবাবুকে বড় সুন্দর কথাটা বলে-ছিলেন—"দ্যাখো যজ্ঞেশ্বর, তুমি জমিদারীর আমলাগিরি চাইছ. তোমায় আমি তা ক'রে দেবো; যে মাইনে পাবে তাতে তোমার কষ্টেসৃষ্টে চ'লে যাবে, পরে তোমার কৃতিত্ব অনুসারে তোমার পদ ও মাইনের উন্নতি হবে; কিন্তু সাবধান,

গোড়া থেকেই কাঁচা পয়সার লোভ করলে তোমার অনেক টাকা উপার্জন হবে, কিন্তু তাতে লাভের মধ্যে চাকরীটুকু হারাবে। কাঁচা পয়সার লোভ বড় ভয়ঙ্কর লোভ।" এই বলে তিনি পরমাত্মীয়ের মত হো-হো ক'রে হেসেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের মানুষ চিনবার একটা অসাধারণ ক্ষমতা ছিল—বৈষয়িক অভিজ্ঞতাও ছিল প্রচুর। তিনি জানতেন, যজ্ঞেশ্বর পরের গোলামী করতে পারবে না। তার ব্যবসা-বুদ্ধি আছে, তাতেই তার উন্নতি হবে। তাই তিনি যজ্ঞেশ্বরবাবুকে ব্যবসা করবার সুবিধা ক'রে দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যও সিদ্ধ হয়েছে।

আর একবার তিনি তাঁর জনৈক কর্মচারী সতীশচন্দ্র ঘোষকে বেশ মজার অথচ বড় উপদেশপূর্ণ কথা বলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের বাচনভঙ্গিও ছিল এমন সুন্দর ও সরস যে তা অনেকের মুখস্ত হ'য়ে যেতো। সতীশবাবু তখন এস্টেটের সার্ভেয়ারের পদ থেকে প্রমোশন পান চর-বিভাগের ম্যানেজারীতে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ব্যবস্থাতেই। তিনি সতীশবাবুর কৃতিত্ব ও সততার পরিচয় পেয়েছিলেন—তাই এই পুরস্কার।

সতীশবাবু প্রমোশন পেয়ে নূতন কাজে যাবার সময় রবীন্দ্রনাথকে প্রণাম করতে গেলেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর মাথায় হস্তস্পর্শ ক'রে আশীর্বাদ করে তাঁকে উৎসাহিত করবার জন্য হাসতে হাসতে বলেছিলেন,—"সতীশ, চরেই তুমি কৃতিত্ব দেখিয়েছ, আবার চরেই তোমায় দিলুম। জানোই তো—চরের শুকনো বালি অনুর্বর নয়, এতে টাকা বড় কম জন্মায় না—। তোমার বাবা তোমাকে আমার কাছে দিয়ে গিয়েছিলেন, তোমার বাবার সবগুলো গুণই তুমি পেয়েছ, কিন্তু খবরদার, একটা গুণ তাঁর তুমি কিছুতেই পেয়ো না। এই আমার আশীর্বাদ থাকলো!" বলা বাহুল্য সতীশবাবুর পিতা গিরিশবাবু যথেষ্ট কার্যক্ষমতা দেখিয়ে ঠাকুর এস্টেট থেকে অবসর নেবার সময়ে পুত্র সতীশ-বাবুকে রবীন্দ্রনাথের কাছে এনে চাকরী করিয়ে দেন। গিরিশবাবু খুব কার্যক্ষম ছিলেন, কিন্তু তাঁর একটি মহৎ দোষ ছিল যা তাঁর কার্যক্ষমতাকে সময়ে সময়ে মলিন করে তুলতো, আর কর্মচারীদের দোষগুণের পরিচয় রবীন্দ্রনাথের কাছে কখনো অজ্ঞাত থাকতো না। সামান্য পাইক বরকন্দাজদের কাজের দোষগুণও তিনি ভালভাবে লক্ষ্য রাখতেন। তাই জমিদারী সেরেস্তাকে সংস্কৃত করবার ইচ্ছাও তাঁর জেগেছিলো এবং সে ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন —অনেক শিক্ষিত কর্মী যুবককে জমিদারীর কর্মচারী নিয়োগ করে।

রবীন্দ্রনাথের ভবিষ্যদ্বাণী সফল হয়েছিল। সতীশচন্দ্র ঘোষ পরে ঠাকুর

এস্টেটের ম্যানেজার হয়েছিলেন তাঁরই আদেশে এবং তিনি একাজে সুনামও অর্জন করেছিলেন।

দক্ষিণারঞ্জন চৌধুরীকে রবীন্দ্রনাথ নিজে ডেকে চাকরী দেন—তাঁর খোলা-খুলি গ্রাম্য হালচাল আর অশ্বচালনে কৃতিত্ব দেখে। দক্ষিণাবাবু সেকালের শান্তিনিকেতনের কিছুকাল ম্যানেজারীও করেছিলেন। দক্ষিণাবাবু নিজেকে প্রায়ই "পটুক বামুন" বলতেন আর ভোজে বা কোন ব্যাপার-বিধানে ভাল পরিবেশন করতে পারতেন। রবীন্দ্রনাথ হেসে বলেছিলেন,—"আমাদের আশ্রমের ছাত্র শিক্ষকদের খাওয়াদাওয়ার সুব্যবস্থা হতে পারবে এই পেটুক বামুনের দ্বারায়। যারা নিজেরা খেতে পারে, পরকেও তারা খাওয়াতে জানে। দক্ষিণা, তোমাকে আমার আশ্রমের সবচেয়ে কঠিন কাজের ভারটা দিলাম। দেখবো, পেটুক বামুন বলে যে তুমি বড়াই কর, তা সত্যি কিনা।"

দক্ষিণাবাবু প্রায়ই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সঙ্গে থাকতেন, তাই তিনি রবীন্দ্র-নাথকে বেশ অন্তরঙ্গভাবে দেখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। দক্ষিণাবাবুর দুইবার স্ত্রী বিয়োগ হয়। দক্ষিণাবাবুর সর্বদা বিমর্ষ ভাব দেখে তিনি প্রায়ই দুঃখ প্রকাশ করতেন। একদিন কোন কার্যোপলক্ষে দক্ষিণাবাবু একটু উন্মনা হ'য়ে ওঠেন, তাঁর চোখ দুটো একটু ছলছল করতে থাকে। মরমী রবীন্দ্রনাথ তা বেশ লক্ষ্য করলেন। তিনি অতি বিষণ্ণভাবে বললেন—"এই এতটুকু বয়সে তোমার দু'দুবার পরিবার বিয়োগ হ'ল। সত্যিই তো। আচ্ছা দক্ষিণা, এবারে আর কালো বৌ বিয়ে কোরো না—তোমার জন্যে একটা ফুটফুটে বৌ আমি পছন্দ করে দেবো।" দক্ষিণাবাবু লজ্জায় মরে গেলেন। তিনি তখন রবীন্দ্রনাথের সম্মুখ থেকে সরে যেতে পারলে বাঁচেন। তিনি এমন প্রাণখোলা পরমাত্মীয়ের মত ব্যবহারের আরো অনেক সরস কাহিনী ব'লে থাকেন।

শিলাইদহের পেসকার শরৎচন্দ্র সরকার কন্যাদায়ে বিব্রত হ'য়ে পড়েন। তাঁর মেয়ে ক'টিই কালো। বড় মেয়ের বিবাহের সময় রবীন্দ্রনাথ শরৎবাবুর অবস্থা শুনে বললেন,—"শরৎ, তোমার তিন চারটি মেয়ে। ছেলেরা কালো মেয়ে পছন্দ করতে চায় না। মোটা ভাত কাপড় পায় এমন ছেলে খুঁজে মেয়ে বিয়ে দাও গে।" তিনি শরৎবাবুর দু'টি মেয়ের বিবাহে আশাতীত সাহায্য করেছিলেন। সহকর্মীরা ঠাট্টা ক'রে শরৎবাবুকে বলতেন—"রবিবাবু থাকতে শরৎবাবুর কন্যাদায়ের ভাবনা নেই।"

ফণিভূষণ চৌধুরী প্রভৃতি শিলাইদহের সেকালের গ্রাম্য যুবকেরা কীর্তনের দল নিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে উপস্থিত হলেন, তাঁরা ছেলেদের একটা শরীর-

চর্চার আখড়া করতে চান আর দলের উৎসাহ সঞ্চারের জন্য বারোয়ারী কালী-পূজা করতে চান। রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন—"বাঃ, এ গাঁয়ে ছেলে নাই কে বলে? আমি ভেবেছিলাম গাঁয়ের সবাই বুঝি বুড়ো।" তিনি ছেলেদের খুব উৎসাহ দিলেন,—বারোয়ারী কালীপূজা ধুমধামে সম্পন্ন করার জন্য ম্যানেজারবাবুকে উপদেশ দিলেন, লাঠিখেলা ও কুস্তি শেখবার জন্য কয়েকজন নামজাদা লেঠেল আনালেন। সেটা স্বদেশী আন্দোলনের যুগ। সেই বারোয়ারী কালীপূজাই পরে গ্রাম্য ভদ্রলোকদের উৎসাহে কাত্যায়নী মেলায় পরিণত হয়। পল্লীর কীর্তন, জারী-তরজা, কবি, ভাসান-যাত্রার অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতেন; গ্রাম্য উৎসবাদি তুচ্ছ অসভ্য বা অশ্রাব্য মনে ক'রে দু'পাঁচ মিনিট শুনেই চলে আসতেন না। দক্ষিণাবাবুর গানবাজনার খুব বাতিক ছিল। রবীন্দ্রনাথের অনুরোধে দক্ষিণাবাবু সদল-বলে তাঁকে যাত্রাগান শুনিয়ে দেন। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথের উৎসাহে ও আনুকূল্যে শিলাইদহের ছেলেরা মহাসমারোহে "বিল্বমঙ্গল" অভিনয় করেছিলেন,—অভিনয়ে অঘোরনাথ অধিকারী পার্ট নিয়েছিলেন। জানিপুরের শিবু সাহার কীর্তন, লালান ফকিরের গান তিনি সামাজিক উৎসবের মত কর্মচারী ও প্রজাদের নিয়ে একত্রে ব'সে শুনতেন।

শিলাইদহের (খোরসেদপুরের) মৌলবী নুরুদ্দিন আহম্মদ এণ্ট্রান্স পড়বার সময় হুগলী কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হবার সাহায্যের জন্য একটা সুপারিশ নেবার জন্য রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে দেখা করেন। রবীন্দ্রনাথ বালক নুরুদ্দিনের মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করে বলেছিলেন—"বেশ, এই তো চাই, তোমরা উচ্চশিক্ষা পেলেই তো আমাদের গৌরব।" তিনি উক্ত ইস্কুলের হেড মাস্টার ক্ষীরোদচন্দ্র রায়চৌধুরীর নামে যে সুপারিশপত্র দিয়েছিলেন—তাতে রবীন্দ্রনাথ একজন সম্ভ্রান্ত প্রজার ছেলের উচ্চশিক্ষা বিধানে যে কত আগ্রহশীল ছিলেন তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেই সুপারিশ চিঠির ফলে মুন্সী সাহেব ঐ স্কুলের বোর্ডিং-এ Free Border হিসাবে লেখাপড়া শিখেছিলেন।

কেরানীগিরি

শান্তিনিকেতনের অতি-শৈশব অবস্থা। তখনকার আশ্রমটি ছিল অনেকটা সেকালের তপোবনের মত, উপকরণের বিরলতার মধ্যে মানুষ-গড়বার ঐকান্তিক তপস্যা। আপিস একটা ছিল খানিকটে সেকেলে বৈঠকখানার মত, তার চেয়ার টেবিল, দেরাজ, ডেস্ক, অফিসার, কেরাণী ইত্যাদির বিশেষ বালাই ছিল না। কবিই আপিসের সর্বেসর্বা কেরাণী, অফিসার, যাই বলুন। কবি সকালে অন্যান্য অধ্যাপকদের মত ছেলেদের পড়িয়ে নিজেই আপিসে বসতেন, হিসেব কিতেব, চিঠিপত্র লেখাপড়া ইত্যাদি কাজে। শ্রীসুধাকান্ত রায় চৌধুরী তখন নূতন এসেছেন আশ্রমে, তিনি আপিসের টুকিটাকী কাজে কবিকে সাহায্য করতেন। আর একটি পিওন ছিল, তার কাজ ছিল চিঠিপত্র দেওয়া-নেওয়া, পোস্টাপিসে যাওয়া, ঘরঝাট দেওয়া, কিছু ফাইফরমাজ খাটা। তার নাম সতীশ।

সতীশ নতুন নতুন নিযুক্ত হয়ে কিছুদিন বেশ কাজকর্ম করল। তরুণ গ্রাম্য যুবক, ক্রমে সব হালচাল দেখেশুনে একটু ধোপদোরস্ত বাবুও বনে গেল। অনেক অধ্যাপক ও বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি আপিসে আসতেন যেতেন, তাঁদের সবাইকে বলতে হত অমুকবাবু—অমুকবাবু। সবাই 'বাবু'!

সতীশের মনের দুঃখু, তাকে কেউ বাবু বলে না—সবাই বলে সতীশ। সে দেখলো—আপিসে তার যা কাজ সেগুলো পিওনের কাজ, মর্যাদাহানিকর নয়, কিন্তু দৈনিক ঐ ঘরঝাঁট দেওয়াটা দস্তুর মত চাকরের কাজ। ওটা নিতান্ত নীচ কাজ, বাবুর কাজ নয়। সে আপিসের বাবু না হোক, পিয়ন বটে, কিন্তু সে চাকর নয়। ঘরঝাঁট দেয় চাকরবাকর—সে সেই নীচ কাজটা করে নিজের সম্ভ্রম নষ্ট করবে কেন? তার মন খারাপ হল।

সতীশ ঘরঝাঁট দেওয়া কাজটা কমিয়ে দিলো, শেষকালটা সে আপিস-ঘরটা ঝাঁট দেওয়া বন্ধ করল, দুইতিন দিন অন্তর কাগজপত্তর ঝাড়পোঁছ করে। রবীন্দ্রনাথ আপিসে যতক্ষণ থাকতেন কাজকর্মে একেবারে মগ্ন হ'য়ে থাকতেন, অনেককিছু দেখেও দেখতেন না,—সময়ও পেতেন না।

রবীন্দ্রনাথ একদিন খুব ভোরে আপিসে এসেছেন, সুধাকান্তবাবু নীরবে খামের উপর ঠিকানা লিখে যাচ্ছেন, সতীশ আপিসে নাই। রবীন্দ্রনাথ চারিদিকে চেয়ে একটু ঘুরে বললেন—"কী বিশ্রী নোংরা হয়েছে আপিসটা।

যেন কতদিন ঝাঁড় দেয় না সতীশ। সতীশ কোথায় সুধাকান্ত, ঘরটার কী বিশ্রী চেহারা দেখছো না—এই বলেই ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। সুধাকান্তবাবু সতীশকে খুঁজতে গেলেন। তাকে কোথাও পেলেন না, আপিসে ফিরে এসে দেখেন—স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ কোথা থেকে ঝাঁটাগাছ খুঁজে নিয়ে নিপুণ হয়ে ঘরঝাঁট দিচ্ছেন, পুরোনো কাগজে ধুলোবালি জড়ো করে বাইরে ফেলে দিচ্ছেন।

সুধাকান্তবাবুর তো চক্ষু চড়কগাছ। আমায় দিন বলে ঝাঁটাগাছ হাত থেকে নিতে যাবেন, এমন সময় সতীশ এসে হাজির। তারও চক্ষু চড়কগাছ। রবীন্দ্রনাথ বললেন, কি রে সতীশ, ঘরটার কি দশা হয়েছে দেখছিস না? গোয়ালঘরের চেয়েও নোংরা।" ততক্ষণ ঘরদোর বইপত্তর সব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে গেছে। সতীশ ভয়ে বিবর্ণমুখে তাঁর সামনে হাতজোড় করে দাঁড়ালো—"হুজুর, আমায় দিন, ভুল হয়ে গেছে. আর ভুল হবে না।"

রবীন্দ্রনাথ হাত পা পরিষ্কার ক'রে বসে হাসতে হাসতে বললেন, কী রে সতীশ, এই নেংরা ঘরের মধ্যে তোর ভাল লাগে?"

সতীশের খুব ভয় হয়েছে, এবারে চারকীটা যাবেই। সুধাকান্তবাবু একটু মজা করবার জন্য ছোট্ট ক'রে বললেন--সতীশ তো পিওন। ঘরঝাঁট দেওয়াটা চাকরের কাজ, সেটা ওর মনের মত নয়। রবীন্দ্রনাথ হো হো ক'রে হেসে বললেন—"সত্যিই তো সতীশ ঝাড়ুদার নয়, চাকর নয়, সতীশ তাহলে সতীশ-বাবু। কেমন সতীশ—তাই নাকি?" এই বলে আবার খুব জোরে হেসে উঠলেন। সতীশ নীরবে রবীন্দ্রনাথের পা জড়িয়ে ধরল বলল, হুজুর, আমার অপরাধ ক্ষমা করুন। এখন থেকে দৈনিক—

ক্ষমা করার কথা আর উঠলোই না। কোন কড়া কথা বা বকুনী শুনতে হল না, চাকুরীরও ক্ষতি হল না। রবীন্দ্রনাথ আবার হেসে বললেন, আপিসঘরটা পরিষ্কার রাখিস—বুঝিস তো কত লোক আসে যায়, বসে এখানে।

মনিবের আদর্শ ও সস্নেহ উপদেশ পেয়ে সতীশের চোখ বেয়ে জল গড়াতে লাগলো। সে আর "বাবু" হতে চায় না, কিছুতেই না।

আর একটা কাহিনী—

একবার জমিদারী থেকে প্রজাদের একগাদা দরখাস্ত এসেছে সদর আপিসে, রবীন্দ্রনাথের কাছে হুকুমের জন্য। রবীন্দ্রনাথের হাতে তখন অনেক কাজ। নিজের সাহিত্যসাধনা, আর শান্তিনিকেতনের চিঠিপত্র লেখাপড়া অধ্যাপনা ইত্যাদি নিয়ে অত্যন্ত ব্যস্ত। দরখাস্তের প্রকাণ্ড গাদা একবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে তিনি আফিসে কার্যরত সুধাকান্তবাবুকে দিয়ে বললেন,—সুধাকান্ত, এইগুলো পড়ে

মোটামুটী প্রজাদের নামধাম আর প্রার্থনা কি—তারই একটা লিষ্টি করে দাও তো।

সুধাকান্তবাবু সুধাসমুদ্রের বদলে বিপদসমুদ্রে পড়ে গেলেন। সেকেলে দাড়িগোঁফওয়ালা জিলিপির প্যাঁচের মত বাংলা লেখা, অসংখ্য বানান ভুল, পাঠোদ্ধার করতে মাথা ঘুরে যায়। দরখাস্ত শুরু "মহামহিমমহিমার্ণব শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশ্রীচরণকমলেষু" আর "ধর্মাবতার প্রবলপ্রতাপেষু," আর শেষ হয়েছে "আজ্ঞাধীন সেবক অধম দীন সন্তান—অমুক—সাকিন অমুক।

পুরো দিন দুই হয়ে গেল, সুধাকান্তবাবু কিছুতেই ব্যাপারটা আয়ত্বে আনতে পারছেন না—সারাদিন ধরে দরখাস্ত ঘাঁটছেন, পাঠোদ্ধার করছেন। তিনদিনের দিন রবীন্দ্রনাথ বললেন—আমি কাল বিকেলে বাইরে চলে যাবো, লিস্টিটা আজই শেষ করে দাও সুধাকান্ত। আমার তো আর সময় নেই।

সুধাকান্তবাবু মাথা চুলকিয়ে বললেন—অনেক কেরাণীগিরি করেছি, কিন্তু এমন বিপদে তো পড়ি নাই। একে তো পড়াই যায় না—সেকেলে হরফের অদ্ভুত বাংলা লেখা, তারপর ইনিয়ে-বিনিয়ে কী সব ধানাই-পানাই লিখেছে—কিছু বুঝতেই পারছি না। আরো সময় লাগবে আমার।

রবীন্দ্রনাথ হো হো করে হেসে বললেন—সে কি হে। এই সামান্য কাজটা করতে এত সময় লাগবে তোমার? জমিদারীর আমলারা কেমন চটপট একাজ করে ফেলতো। তবে শোনো—এক কাজ করো—দরখাস্তের গোড়াটা আর শেষটা পড়লেই পাবে প্রজার নাম্-ধাম, আর শেষের তিনচার লাইনের উপরেই পাবে—তার প্রার্থনাটা কি। আর সব চোখ বুলিয়ে স্রেফ বাদ দিয়ে যাও,—যা শক্ত কথা, তার নীচে লাইন টেনে আণ্ডারলাইন করে দাও, তাহলেই দেখবে, তিনচার ঘণ্টায় লিস্টি হয়ে যাবে। তারপরে আমি "সেরেস্তার মন্তব্য"টা পড়েই হুকুম লিখে দেবো। নাও আরম্ভ করো। কালই চাই ওটা।

কবির জমিদারী ও কেরাণীগিরির অভিজ্ঞতা দেখে সুধাকান্তবাবু অবাক হলেন। সুধাকান্তবাবু দেখলেন, সত্যিই কাজটা সহজ হয়ে গেছে। পরের দিনই সন্ধ্যার পর লিস্টি ও দরখাস্তের গাদা তিনি পেশ করলেন।

কাহিনী দুটিই শ্রীসুধাকান্তবাবুর কাছে শোনা।

কালীগ্রামে শেষবার

১৯৩৭ সালের জুলাই মাসের প্রায় মাঝামাঝি সময়ে রবীন্দ্রনাথ শেষবার তাঁর জমিদারী কালীগ্রাম পরগণায় বেড়াতে যান। ১৯৩০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে রাশিয়া থেকে তিনি রথীন্দ্রনাথকে যে চিঠিগুলি লেখেন তার মধ্যে কালীগ্রামের প্রজাদের সম্বন্ধে যে কয়েকটি মন্তব্য রয়েছে তাতে প্রমাণিত হয়, নিজ জমিদারীর প্রজাদের সুখদুঃখ আশাআকাঙ্ক্ষার স্মৃতি রাশিয়ার বিরাট কৃষিউন্নয়ন, যৌথখামার প্রভৃতি বিশাল কর্মযজ্ঞের প্রত্যক্ষদর্শী কবির মনে একটা আলোড়ন এনেছিল।

"জমিদারীর অবস্থা লিখেছিস। যে রকম দিন আসছে তাতে জমিদারীর উপরে কোনোদিন আর ভরসা রাখা চলবে না। ও জিনিসটার ওপর অনেক-কাল থেকেই আমার মনে মনে ধিক্কার ছিল, এবার সেটা আরও পাকা হয়েছে। যেসব কথা বহুকাল ভেবেছি, এবার রাশিয়ায় তার চেহারা দেখে এলুম। তাই জমিদারী ব্যবসায়ে আমার লজ্জা বোধ হয়। আমার মন আজ উপরের তলার গদি ছেড়ে দিয়ে নিচে এসে বসেছে। দুঃখ এই যে, ছেলেবেলা থেকে পরোপজীবী হয়ে মানুষ হয়েছি।" ৩১ অক্টোবর, ১৯৩০।

শ্রীযুক্তা প্রতিমাদেবীকে লিখেছিলেন—

"ধনী পরিবারের ব্যক্তিগত অমিতব্যয়িতার উপরে এবার আমার আন্তরিক বৈরাগ্য হয়েছে। দেনা শোধের ভাবনা ঘুচে গেলেই দেনা বাড়াবার পথ একেবারে বন্ধ করতে হবে। তা ছাড়া নিজেদের ভরনপোষণের দায়িত্ব আমাদের গরীব চাষী প্রজাদের 'পরে যেন আর চাপাতে না হয়। একথা আমার অনেক-দিনের পুরনো কথা। বহুকাল থেকেই আশা করেছিলুম, আমাদের জমিদারী যেন আমাদের প্রজাদেরই জমিদারী হয়, আমরা যেন ট্রাষ্টীর মত থাকি। অল্প কিছু খোরাকপোষাক দাবী করতে পারবো, কিন্তু সে ওদেরই অংশিদারের মতো। কিন্তু দিনে দিনে দেখলুম, জমিদারীর রথ সে রাস্তায় গেল না, তারপর যখন দেনার অঙ্ক বেড়ে চলল, তখন মনের থেকেও সংকল্প সরাতে হল। এতে ক'রে দুঃখ বোধ করেছি, কোনো কথা বলিনি। এবার যদি দেনাশোধ হয়, তাহলে আর একবার আমার বহুদিনের ইচ্ছা পূর্ণ করবার আশা করব।"

স্বদেশে ফিরেই কয়েক বছর পরে নিজেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে কালীগ্রামের প্রজাদের শেষবার দেখবার জন্য আগ্রহান্বিত হয়েছিলেন। সে সময় কালী-

গ্রামের (সদর কাছারী—পতিসর) প্রজাদের কাছ থেকেও পুণ্যাহ উপলক্ষে দর্শন দেবার বহু সাগ্রহ আমন্ত্রণ এসেছিল তাঁর কাছে।

কালীগ্রামের প্রজাদের স্মৃতি তাঁর কাছে ছিল চিরদিনই বড়ো আদরের, কারণ সেখানকার প্রজাদের কাছ থেকে জীবনের বড় দুঃসময়ে যে সহানুভূতি ও সাহায্য পেয়েছিলেন, তাঁর মতো দরদী মানুষের পক্ষে তা ছিল প্রকৃতই মূল্যবান। ১৯২০ সালে আপোষ-মীমাংসায় পার্টিসন হয়ে শিলাইদহ জমিদারী (পরগণা বিরাহিমপুর) মেজদাদা স্বর্গত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের (পুত্র স্বর্গত সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর) এবং কালীগ্রাম পরগণা রবীন্দ্রনাথের ভাগে পড়ে। সেই থেকে কালীগ্রাম পরগণার প্রজাদের জন্য তাঁর হৃদয়ের মধ্যে বিশেষ সহানুভূতি ও স্নেহের টান বেশী ছিল। সে বন্ধনটি তিনি এবং তাঁর পুত্রও স্বেচ্ছায় শেষদিন পর্যন্ত ছিড়তে পারেন নি। সেখানে সেদিন পর্যন্তও একটি দাতব্য চিকিৎসালয় ও উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয় ছিল। এই পরগণার শতকরা ৮০জন প্রজাই মুসলমান ও কৃষিজীবী। কালীগ্রাম উত্তরবঙ্গের একটি সমৃদ্ধ জমিদারী।

কবির সেক্রেটারী শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী ও অবসরপ্রাপ্ত ম্যানেজার নগেন্দ্রনাথ রায়চৌধুরী তাঁর সহযাত্রী ছিলেন। তৎকালীন রাজসাহীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও স্বনামখ্যাত সাহিত্যিক শ্রীঅন্নদাশঙ্কর রায়ও তাঁর সঙ্গে মিলিত হয়েছিলেন। আত্রাই রেল স্টেশনে নেমে পতিসর পৌঁছুবার জন্যে তাঁরা বিখ্যাত আত্রাই নদী দিয়ে বোটে রওনা হলেন, সঙ্গে ছিল কবির প্রিয়তম পুরাতন ভৃত্য বনমালী। বনমালী জাতিতে উড়িয়া। শ্রীযুক্তা মৈত্রেয়ী দেবীর বিখাত "কালিম্পংএ রবীন্দ্রনাথ" গ্রন্থে কবির এই প্রিয়তম ভৃত্যের সম্বন্ধে অনেক কৌতুকপ্রদ কাহিনী আছে। বনমালী ছিল দরদী কবির উপযুক্ত সহচর।

বেলা দ্বিপ্রহর! প্রখর রৌদ্রের মধ্যে বোট ছেড়েছে রেল স্টেশন থেকে। কবি বহুকাল পরে আত্রাই নদীর সাবেক চেহারা দেখবার জন্য নদীর দুইধারে চেয়ে রয়েছেন। বোটের মাঝিমাল্লারা এবং কয়েকজন চাষী প্রজা গল্প করতে আরম্ভ করল—এবারে আল্লার কুদরতে এ অঞ্চলে আজ পর্যন্ত একেবারেই বৃষ্টি হলনা—আষাঢ় মাস চলে গেল, চাষবাস সব বরবাদ হয়ে গেল। বর্ষার সময়েও একফোঁটা বৃষ্টি নেই, এই দারুণ অনাবৃষ্টিতে দুর্ভিক্ষ না হয়ে যায় না—চাষীরা সব মরে যাবে। বাবুমশাই জমিদারীতে পা দিচ্ছেন, তাই যদি আল্লার 'দোয়ায়' 'দেওয়া' (বর্ষণ) হয়। এই রকম নানা মন্তব্য রবীন্দ্রনাথের কানে যাচ্ছিল, তিনিও এই আলোচনায় যোগ দিচ্ছিলেন।

সত্যই তাই। আত্রাই পেরিয়ে বোট পড়ল নাগর নদীতে। নদীর দুধারের সোনার খেত হাজার হাজার বিঘা শ্মশানের দশা পেয়েছে। ধানের আধপোড়া শীষ মধ্যাহ্ন সূর্যের উত্তাপে ঝাঁ ঝাঁ করছিল—আগুনের হলকার মত গরম বাতাস বইছিল। ছোট নদীটিও প্রায় বিশুষ্ক। কবি প্রজাদের দুএকটি কথার জবাবও দিচ্ছিলেন। বোট ক্রমে (কালীগ্রাম) পতিসর কাছারীর দিকে অগ্রসর হতেই দুই তীরে দলে দলে নরনারী দাঁড়িয়ে সম্বর্ধনা জানাচ্ছিল, প্রজারা সেলাম দিচ্ছিল, হিন্দু মেয়েরা হুলুধ্বনি দিচ্ছিল। কবি দুচোখ ভরে তাদের দেখছিলেন, তাঁর শরীরও তখন ভাল যাচ্ছিল না—তবু বিশ্রামের সময়টা ভ্রমণে কাটাবেন, এই অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু প্রজাদের ও চাষবাসের শোচনীয় অবস্থায় যেন অত্যন্ত ম্রীয়মান হয়ে বসেছিলেন, যেন কোন গভীর সমস্যার সমাধান করতে চেষ্টা করছেন।

পতিসর কাছারীর প্রায় এক মাইল দূরে বোট চলছে। এমন সময়ে ঘটল অদ্ভুত ব্যাপার! আকাশে কালো মেঘ দেখা দিল, মিনিট কয়েকের মধ্যে মেঘ গর্জন, শিলাবৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে প্রবল বর্ষণ আরম্ভ হল। চারিদিকে কী আনন্দ! বোটের মধ্যে সবাই ঢুকে আনন্দে কলগুঞ্জন করতে লাগলো। সবাই বিস্ময়ে বিমুগ্ধ, কী আশ্চর্য, বাবুমশাই জমিদারীতে পা ছুঁতেই কী সুন্দর বর্ষণ, খোদাতালার আশীর্বাদ নেমে এলো, চাষীরা এবারে বাঁচলো,—এদেশটা রক্ষা পেলো। মুষলধারে বৃষ্টি, বোট চলতে লাগলো, বৃষ্টি যেন অবিরাম জল ঢেলে উত্তপ্ত মাঠকে সজীব শীতল ক'রে তুললো। বাবুমশায়ের পায়ের ছোঁয়া লেগেই সারা দেশটা আজ বেঁচে উঠলো—সবাই মহানন্দে এই প্রসঙ্গ নিয়ে কলরব করতে লাগলো। প্রজাদের সরল বিশ্বাসে কবি হাস্‌তে লাগলেন।

পতিসর কাছারীতে বোট পৌঁছুলো, তবু বৃষ্টির বিরাম নাই। নদী-তীরে ধারাবর্ষণের মধ্যেও অপেক্ষমান জনতার কী আনন্দ। কিছুক্ষণ পরে বৃষ্টি থামলো। প্রজাদের জনতা প্রণাম ও সেলাম করবার জন্য বোট ঘিরে দাঁড়ালো। বাবুমশাই বোটের পাটাতনে এসে কিছুক্ষণ বসে সবার কুশলবার্তা নিলেন। সবাই বলতে লাগল—খোদার দয়া বাবুমশাইএর বেশ ধরে পা দিলেন তাঁর জমিদারীতে। জমিদারীর ম্যানেজার শ্রীবীরেন্দ্রনাথ সর্বাধিকারী প্রমাদ গনলেন—যদিও সমারোহ করবার নিষেধ ছিল,, তবু যে আয়োজন করা হয়েছে, তা এই প্রবল বৃষ্টিতে ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। কিন্তু বাবুমশায়ের পদার্পনেই এই সুবৃষ্টির জন্য প্রজাদের সরল আনন্দ কলরবে তিনিও হাসিমুখে অভ্যর্থনাদি নানা ব্যবস্থায় মেতে উঠলেন। রবীন্দ্রনাথ প্রজাদের এই আনন্দের আতিশয্যে হাসতে লাগলেন।

সন্ধ্যা হয়ে এলো,—সেদিনকার মত প্রজা কর্মচারীদের বিশ্রাম করতে বলে বোটের মধ্যে গেলেন। রাত্রি প্রায় আটটার পর রবীন্দ্রনাথ আহার শেষ করে বোটে বিছানায় শুতে যাবেন, দেখেন, ভৃত্য বনমালী তাঁর শোবার সমস্ত ব্যবস্থা করে দিচ্ছে, কিন্তু তাকে যেন খুব বিব্রত, মন-মরা মনে হলো। বাবুমশাই জিজ্ঞাসা করলেন, "কী রে বনমালী, জমিদারীতে এসে ভাল লাগছে না বুঝি। তোর বিছানা করেছিস কোথায়? আজ সকাল সকাল শুয়ে পড়। কাল তো অনেক হৈ-হাঙ্গামা আছে, কাল সব দেখে বেড়াস। শুয়ে পড় তাড়াতাড়ি, তোর বিছানা কোথায়?"

বনমালী কথা কয় না, মুখে চোখে বিব্রত-ভাব, তার শুকনো হাসিতে তার অসহায় ভাব যেন বেশী প্রকট হয়েছে। কিন্তু নির্বাক। বোটের পাহারারত বরকন্দাজ ও মাল্লাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—ব্যাপার কী রে,—বনমালীর মন খারাপ হয়েছে—কথা কয় না যে—"

বোটের মাল্লা ভয়ে ভয়ে বলল—হুজুর, হঠাৎ বৃষ্টি আরম্ভ হলে বোটের ছাদের মালপত্র সব ভেতরে আনা হল, কিন্তু বৃষ্টির আনন্দে ভুল করে বনমালীর বিছানার বাণ্ডিলটা ছাদেই পড়ে রইলো,—সেটা ভিজে একেবারে"—

তার মুখের কথা শেষ না হতেই কবি রেগে জ্বলে উঠলেন—কী আশ্চর্য, এত জিনিষ ছাদ থেকে নামানো হল, আর বেচারী বনমালীর বিছানাটা কারো চোখেই পড়লো না? এ অত্যন্ত অন্যায়, অদ্ভুত ব্যাপার তো! এতলোক জিনিষপত্র টেনে নামালো—কারো খেয়াল হল না—এই গোবেচারীর বিছানাটার ওপর। এখন এ বেচারী শোবে কী ক'রে? ছি ছি ছি ছি, তোদের কী বলবো৷ যা—এখুনি যা, ম্যানেজারবাবুকে ডেকে আন—এখুনি এর ব্যবস্থা করতে বল—" কবি বোটের মাঝিমাল্লা, বরকন্দাজ সব্বাইকে বড্ড বকতে লাগলেন। অনেকদিন তারা এমন বকুনি খায়নি।

ম্যানেজারবাবু সারাদিনের পরিশ্রমের পর বাসায় সবেমাত্র খেতে বসেছেন, বরকন্দাজ-মুখে 'বাবুমশাই ভয়ানক চটেছেন' শুনেই তৎক্ষণাৎ হন্তদন্ত হয়ে ছুটলেন—একজন চাকরের মাথায় বালিস, তোষক, চাদর ইত্যাদি চাপিয়ে। এসেই দেখেন, ভয়ানক ব্যাপার—কবি রেগে আগুন, খুব বকছেন—সবাইকে দোষ দিচ্ছেন—চুপটি ক'রে সবাই বকুনি খাচ্ছে, কিন্তু একাজটা যে বনমালীরও কর্তব্য ছিল—সে কথা বলবার সাহস কার? বনমালী চুপটি করে বসে। মুখে কথাটি নেই।

ম্যানেজারবাবু আর একপত্তন বকুনি খেলেন। বনমালীকে গিয়ে বললেন—বনমালী, নে ভাই, ভালো করে বিছানা পেতে নে—এই নে ডবল বালিস।

বনমালী একটু হেসে নিয়মমত বাবুমশায়ের বিছানার নীচে পাঠাতনে পরিপাটি করে সেই বিছানা পেতে নিলো। ডবল বালিস, পাশ বালিস! বাবুমশাই খুব খুশী—বললেন তোর বেশ বিছানা হয়েছে—শুয়ে পড় বনমালী—শুয়ে পড় চট্‌পট্‌।

বনমালীর বিছানাপর্ব মিটলো। রাত ভোর হলেই জমিদারীর পুণ্যাহ অনুষ্ঠান। তার পরের দিন অভিনন্দন সভা, ইস্কুলেও সভা হবে। বৃষ্টিতে সমস্ত আয়োজন বরবাদ হয়ে গেছে—কারো আর বিশ্রাম নাই। কবির নিষেধ স্বত্ত্বেও এই ক'টী আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে।

পরের দিন পুণ্যাহ সভা—রসুনচৌকীও দিশী বাদ্যভাণ্ড আরম্ভ হয়েছে, লোক সমাগম হয়েছে অসম্ভব রকম। কারণ দীর্ঘ বারো বছর পরে কবি কালীগ্রামে এসেছেন। পুণ্যাহ আরম্ভ হবার প্রারম্ভে মাতব্বর প্রজারা বোটে এলেন কবি-জমিদারকে সভায় নেবার জন্যে। অসম্ভব জনতা চারিদিকে গিজ্‌-গিজ করছে। কবি শারীরিক অসুস্থতার জন্য সভায় যেতে চাইলেন না, "তোমরা পুণ্যাহ করো গে—আমি অনুমতি দিচ্ছি" বলে খবরের কাগজ পড়তে লাগলেন। প্রজারা হতাশ হল, কিন্তু ম্যানেজারবাবুর নিষেধে কবিকে আর পিড়াপীড়ি করলেন না। পুণ্যাহ শেষ হল। বিকালে প্রজাদের ভোজ ও দরিদ্র বিদায়। বুড়ো মাতব্বর প্রজারা দু বেলাতেই বোটের চারিদিক ঘিরে জমিদার-বাবুকে প্রণাম করল—কবি-জমিদার বাইরে এসে সবার কুশল প্রশ্ন করলেন।

পরদিন কবির সম্বর্ধনা সভা। প্রাতে নগর সংকীর্তন ইত্যাদির অনুষ্ঠান শেষ হল। তার পরেই হাই ইস্কুলের সভায় অভিনন্দন। হেড্‌মাষ্টার মশাইরা এলেন বোটে কবিকে সভায় নিতে। কবি অসুস্থশরীরেও ধীরে ধীরে হেঁটে গেলেন সভায়। অনেকেই বক্তৃতা করলেন,—কবি সামান্য গুটিকতক কথায় তাঁদের সবাইকে উৎসাহ দিলেন—"সংসার থেকে বিদায় নেবার আগে, তোমাদের দেখে যাবো—আমার সেই আকাঙ্ক্ষা আজ পূর্ণ হল। তোমরা এগিয়ে চলো,—জনসাধারণের জন্যে সবার আগে চাই শিক্ষা—"Education first," সবাইকে শিক্ষা দিয়ে বাঁচাও, মানুষ করো।" অনেক বৃদ্ধ প্রজা কথা বল্‌তে বল্‌তে আবেগে কেঁদে ফেল্‌লেন—কয়েকজন যুবকের উচ্ছ্বসিত ভাবাবেগে কবির চোখও ছলছল করতে লাগলো। কবি যেন ব্যথিত হলেন—একটু বিচলিত হয়ে বোটে ফিরে যাবার জন্য ইঙ্গিত করলেন,—মনে হল, বেশী অসুস্থ বোধ করছেন। পাল্কী ক'রে তিনি বোটে ফিরলেন—দুধারে অগণিত জনতা—জয়ধ্বনি করতে লাগ্‌লো।

বিকালে কাছারী প্রাঙ্গণে সম্বর্ধনা সভার বিরাট আয়োজন, বিপুল জনসমাগম। কালীগ্রামের প্রজারা সুদীর্ঘ বারো বছর পরে তাদের প্রিয় কবি-জমিদারকে পেয়েছে নিজেদের মধ্যে। বিকালে কবিকে প্রফুল্ল দেখা গেল, সভায় যাবার জন্য নিজেই প্রস্তুত হলেন,—খুব উৎসাহের সঙ্গেই বোটের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট প্রজার সঙ্গে গল্প করলেন।

কাছারী প্রাঙ্গণে বিরাট সুসজ্জিত অভ্যর্থনামণ্ডপ। লোকে লোকারণ্য, তিলধারণের স্থান নাই। কবিজমিদার পাল্কী করে সেই বিপুল জনসমাবেশের মধ্যে এলেন। গ্রাম্য প্রজাদের এত বড় বিরাট সম্মেলন কোনো জমিদারের দেখ্‌বার সৌভাগ্য হয়েছে কি না জানি না।

উচ্চমঞ্চে কবিজমিদারের জন্য সুসজ্জিত আরামপ্রদ আসন দেওয়া হয়েছে। মঞ্চের নীচে কয়েকখানা চেয়ারে সুধাকান্তবাবু, নগেনবাবু বসেছেন, একখানা আসন রয়েছে জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের জন্যে। ম্যানেজার বীরেনবাবু চারিধার ঘুরে সমস্ত ব্যবস্থা করছিলেন, আর মাঝে মাঝে একখানা বেঞ্চের এককোণে ব'সে বিশ্রাম নিচ্ছিলেন। সম্মুখে বিশাল জনসমাগম,—কবির আগমনের সঙ্গে সঙ্গে নীরব, টুঁ শব্দটি নেই। রবীন্দ্রনাথ মঞ্চে উঠ্‌তেই দেখ্‌তে পেলেন, ম্যানেজার বীরেনবাবু ঘর্মাক্তকলেবরে একখানা বেঞ্চের এককোণে বসে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিচ্ছেন। হঠাৎ কবি বেশ উত্তেজিতভাবে চারিদিকে চেয়ে দেখে কঠোরস্বরে বলে উঠ্‌লেন নগেনবাবুকে—"এ কী রকম হল? জমিদারীর মধ্যে এত বড় সভায় আমার ম্যানেজার, আমার প্রতিনিধি বীরেনের জন্য একটা বস্‌বার আসনের অভাব হল! এ কী রকমের ব্যবস্থা তোমাদের? আমার অভ্যর্থনা আয়োজনের কী চমৎকার নমুনা? তোমাদের কি মাথা খারাপ হয়েছে?"

বিরক্ত ও উত্তেজিত অবস্থায় তাঁর এই শ্লেষবাক্যে নগেনবাবু তৎক্ষণাৎ ছুটে গিয়ে ম্যানেজার বীরেনবাবুকে ধরে এনে কবির সামনে শূন্য চেয়ারখানায় বসিয়ে দিলেন। কবি একটু হাস্‌লেন। একটু গোলমাল হল,—রবীন্দ্রনাথ হাত তুলে ইসারা করে সবাইকে শান্ত হতে বল্‌লেন। একজন শিক্ষিত মুসলমান প্রজা কবিজমিদারের উদ্দেশ্যে অভিনন্দনপত্র পাঠ করলেন:—

"মহামান্য দেশবরেণ্য দেবতুল্য জমিদার
শ্রীযুক্ত কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহোদয়ের
পরগণায় শুভাগমন উপলক্ষ্যে শ্রদ্ধাঞ্জলি—

প্রভো, প্রভুরূপে হেথা আস নাই তুমি
দেবরূপে এসে দিলে দেখা।
দেবতার দান অক্ষয় হউক্
হৃদিপটে থাক্ স্মৃতিরেখা॥

তোমার করুণাকাঙ্ক্ষী—
পতিসর, সদর কাছারী কালীগ্রাম পরগণার রাজভক্ত প্রজাবৃন্দের পক্ষে
(রাজসাহী) মোঃ কফিলদ্দিন আকন্দ. রাতোয়াল্।"
১২ই শ্রাবণ, ১৩৪৪

সামান্য ক'টি কথায় সরল সহজ প্রজাদের অন্তরের অকপট শ্রদ্ধা ও ভক্তির অভিব্যক্তি এই অভিনন্দন পত্রটি। যিনি পাঠ করলেন—তাঁর স্বর বারবার কম্পিত হচ্ছিল। কয়েকজন বৃদ্ধ প্রজা শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন, অনেক পুরোনো কাহিনী সরল গ্রাম্যভাষায় অত্যন্ত আবেগের সঙ্গে বিবৃত করলেন। কয়েকজন যুবক কবির দীর্ঘজীবন কামনা ক'রে তাঁদের অনন্যসাধারণ সৌভাগ্যের কথা নিবেদন করলেন; কেউ এই ভয়ানক অনাবৃষ্টির বৎসরে তাঁদের প্রাতঃস্মরণীয় কবিজমিদারের পদার্পণের সঙ্গে সুবর্ষণের কথা উল্লেখ ক'রে আমরা 'দেবতার রাজ্যের প্রজা' বলে বেশ একটু আন্দোলন সৃষ্টি করলেন।

রবীন্দ্রনাথ ব'সে বসেই বল্লেন—"সংসার থেকে বিদায় নেবার সময় তোমাদের সঙ্গে দেখ হ'ল—এইটীই আমার সান্ত্বনা। তোমাদের কাছে অনেক পেয়েছি,—কিন্তু কিছু দিতে পেরেছি বলে মনে হয় না। সেসব কথা মনে হ'লে বড়ো দুঃখ পাই। কিন্তু আর সময় নেই, আমার যাবার সময় হয়েছে, শরীর আমার অসুস্থ—এ অবস্থায় তোমাদের মধ্যে এসে তোমাদের সঙ্গে থেকে তোমাদের উন্নতির জন্য কিছু করবার খুব ইচ্ছা থাক্‌লেও, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। তোমরা নিজের পায়ে দাঁড়াও,—তোমাদের সবার মঙ্গল হোক —তোমাদের সবাইকে এই আশীর্বাদই আমার শেষ আশীর্বাদ।"

এই ক'টীমাত্র কথা প্রজাদের মধ্যে, বিশেষ করে বৃদ্ধদের মধ্যে একটা গভীর আবেগের সৃষ্টি করল, অনেকে চোখ মুছতে লাগ্‌লেন। রবীন্দ্রনাথও অত্যন্ত বিচলিত হয়ে—"আজ তোমাদের সবার কাছে বিদায় নিতে এসেছি। তোমরা আমার বড় আপন জন, তোমরা সুখে থাকো"—বলে নীরব হলেন। দুটি চোখ তাঁর ছলছল করতে লাগ্‌লো—স্বর অবরুদ্ধ হয়ে গেল।

রবীন্দ্রনাথের কথাগুলো সভার বিরাট জনতা নীরবে শুন্‌ছিল। কিছুক্ষণ পরে তিনি আবার বললেন, "তোমাদের জন্যে কিছুই করতে পারিনি। ইচ্ছা

ছিল, মান সম্মান সম্ভ্রম সব ছেড়ে দিয়ে তোমাদের সঙ্গে তোমাদের মতই সহজ হয়ে জীবনটা কাটিয়ে দেবো। কী করে বাঁচ্‌তে হবে তোমাদের সঙ্গে মিলে সেই সাধনা করব, কিন্তু আমার এই বয়সে তা হবার নয়, আমার যাবার সময় হ'য়ে এসেছে। এই নিয়ে দুঃখ ক'রে কি করব? তোমাদের সবার উন্নতি হোক,—এই কামনা নিয়ে আমি পরলোকে চলে যাবো—" কবি অসুস্থ; আর বেশী কিছু না বলে বোটে ফিরবার জন্যে সংকেত করলেন।

পরের দিন বিকালে কর্মচারীদের বাড়ির মেয়েরা নানারকম খাবার তৈরি ক'রে নিয়ে কবির বোটে তাঁকে প্রণাম করতে এলেন। নানারকম পিঠে, আচার প্রভৃতি দেখে খুব সন্তুষ্ট হয়ে বললেন, "আমার খাওয়া হয়ে গেছে, বড় খুশী হলাম এইসব দেখে, খেয়ে আর কত খুশী হব?" মেয়েরা অতি সংকোচে কথা বল্‌ছেন দেখে বল্‌লেন—"আমাকে ভয় করছ কেন? একটা গল্প বল দেখি শুনি। আচ্ছা, তুমি বলো. তোমার বাপের বাড়ির গল্প। আচ্ছা তুমি বলতো,—কী খেতে তোমার ভাল লাগে? কোন্‌ রান্নাটা ভালো।" অনেক সাধ্যসাধনার পর দুই একজন মহিলা সাহস সঞ্চয় করে দু'চারটি কথা বল্‌লেন। রবীন্দ্রনাথ বল্‌লেন—"তোমাদের সংসারের কাজের চাপ খুব বেশি, তা বুঝি। তবু বল্‌ছি—তোমরা ভালো বই পোড়ো,—এখানকার লাইব্রেরীতে অনেক ভাল বই, মাসিকপত্র আছে, সে সব পোড়ো, আনন্দ পাবে।" মেয়েরা এনেছিলেন অজস্র ফুল, উলের মোজা, কার্পেটের জুতা ইত্যাদি। জিনিসগুলো নিজে হাতে ক'রে নিয়ে বল্‌লেন, "এগুলি আমায় দিচ্ছ.—আমি নিলুম,—আমি পরবো,—আর তোমাদের কথা মনে করবো।"

মেয়েরা চ'লে যাবার সময় তারা ভূলুণ্ঠিত হয়ে প্রণাম করল। সবার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

কল্‌কাতায় ফিরবার সময় হল। আবার বোটের ধারে বিরাট জনতা। বনমালী মহাখুশী, এ কয়দিন ধরে সে বেশ আমোদেই ছিল। নিকটবর্তী জমিদারবাড়ি থেকে কবির জন্য নানারকম খাবার এলো,—সে যেন একটা রাজভোগের রাজসূয়। রবীন্দ্রনাথ কৌতুহলী হয়ে চেয়ে দেখ্‌ছেন, কৌতুক-প্রিয় কবি বল্‌লেন "আমি দেখেই আনন্দ পাচ্ছি,—সুধাকান্ত, তুমি এগুলোর সদ্‌ব্যবহার করবে, রাস্তার বাজে জিনিস খেয়ো না।"

সুধাকান্তবাবু হাস্‌তে লাগ্‌লেন। বোট ছাড়লো পতিসর কাছারীর ঘাট থেকে। নাগর ও আত্রাই নদী পেরোচ্ছেন, নদীর দুধারে অগণিত নরনারীর জয়ধ্বনি। কালীগ্রামের প্রজাদের শেষ সম্বর্ধনা কবি শান্ত নিরাসক্ত ভাবে গ্রহণ করলেন।

কালীগ্রাম পরগণায় (সদর পাতিসর) রবীন্দ্রনাথ জমিদারী ও প্রজা-সাধারণের উন্নতির জন্য নিজস্ব ব্যবস্থায় অনেক সংগঠনের চেষ্টা করেছিলেন। শিলাইদহে যা পারেননি, কালীগ্রামে সেই 'মণ্ডলী প্রথা' প্রচলিত করেছিলেন। সাধারণ হিতকর হাই স্কুল ও ডাক্তারখানা স্থাপন ও উন্নতির জন্য জমিদারীর বার্ষিক দানের বরাদ্দ ছাড়াও প্রজাদের খাজনার উপর স্থায়ী "কল্যাণবৃত্তি" নামে একটি চাঁদা আদায়ের প্রচলন করেছিলেন। সে সময়কার সরকারী শাসন বিভাগের এবিষয়ে ডিষ্ট্রীক্ট গেজেটিয়ারে প্রকাশিত মন্তব্য কৌতুহলী পাঠক-পাঠিকাকে উপহার দিলাম:—

EXTRACT FROM "BENGAL DISTRICT GAZETTEERS, RAJSHAHI"

By Mr. L. S. S. O'Malley (1916).

It must not be imagined that a powerful landlord is always oppressive and uncharitable. A striking instance to the contrary is given in the Settlement Officer's account of the estate of Rabindranath Tagore, the Bengal poet, whose fame is world-wide It is clear that to poetical genius he adds practical and beneficial ideas of estate management, which should be an example to the local Zemindars

"A very favourable example of estate government is shown in the property of the poet, Sri Rabindranath Tagore. The proprietors brook no rivals. Sub-infeudation within the estate is forbidden, raiyats are not allowed to sublet on pain of ejectment. There are three divisions of the estate, each under a Sub-manager with a staff of tahsildars, whose accounts are strictly supervised Half of the Dakhilas are checked by an officer of the head office. Employees are expected to deal fairly with the raiyats and unpopularity earns dismissal. Registration of transfer is granted on a fixed fee, but is refused in the case of an undesirable transferee Remissions of rent are granted, when inability to pay is proved In 1312 it is said that the amount remitted was Rs. 57,595. There are Lower Primary School in each division, and at Patisar, the centre of management, there is a High English School with 250 students and a Charitable dispensary. These are maintained out of a fund to which the Estate contributes annually Rs. 1,250|- and the raiyats 6 pies to rupee in their rent. There is an annual grant of Rs. 240|- for the relief of cripples and the blind. An agricultural bank advances loans to raiyats at 12 per cent per annum. The depositors are chiefly Calcutta-friends of the poet, who get interest at 7 per cent. The bank has about Rs. 90,000|- invested in loans."

জীবিত ও মৃত

রবীন্দ্রনাথের সুবিখ্যাত বহুপঠিত "জীবিত ও মৃত" গল্পটি তাঁর "গল্পগুচ্ছ" পড়বার বহু পূর্বে (যখন আমার দশ এগারো বছর বয়স) এই রকমের একটি গল্প শুনেছিলাম আমার জ্যাঠামশাইএর কাছে। আমার জ্যেঠামশাই স্বর্গীয় তারকনাথ অধিকারী ছিলেন তখন পাবনার বিখ্যাত উকীল এবং ঠাকুরবাবুদের ঘরের উকীল বা আমমোক্তার। তিনি বাড়ির মেয়েদের আসরে রবীন্দ্রনাথের সেসময়কার "হিতবাদী" সংস্করণের গ্রন্থাবলী থেকে "জীবিত ও মৃত" গল্পটি পড়ে আমাদের শুনিয়েছিলেন। তাঁর অনুপম পঠনভঙ্গী ও আবৃত্তি তাঁর জমকালো বিরাট চেহারার সঙ্গে মিলে এই গল্পটি আমাদের মনে এমন ভয়ঙ্কর ও করুণভাবের সৃষ্টি করেছিল যে, সে সময় কতদিন স্বপ্নে কাকিমার (কাদম্বিনীর) করুণ চেহারাখানা দেখে আমাদের কিশোরচিত্ত কেঁদে আকুল হয়ে উঠতো। গল্পটি আমরা "কাকিমার গল্প" বলে অনেককে মুগ্ধ করেছি।

জ্যাঠামশাই গল্পটি পড়েই বলেছিলেন অবিকল এমনি একটি সত্যকাহিনী তিনি বাবুমশাইকে বছর দুই তিন আগে শুনিয়েছিলেন এবং কাহিনীটি রবীন্দ্রনাথ খুব মনোযোগ দিয়ে শুনেছিলেন। তিনি রবীন্দ্রনাথের চেয়ে ৪।৫ বছরের বড় ছিলেন এবং জমিদারীর কাজের অবসরে রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাছে গল্প শুনতে বড় ভালবাসতেন। তাঁর গল্প বলবার ভঙ্গীটি ছিল অপূর্ব ও জীবন্ত, কারণ তিনি একজন ভালো অভিনেতা ছিলেন। তাঁর কাছে শোনা সত্যকাহিনীটিই যে রবীন্দ্রনাথের 'জীবিত ও মৃত' গল্পের আসল উপাদান, তা অনুমান করবার যথেষ্ট কারণ আছে। সে সময়ে রবীন্দ্রনাথ (১২৯৭—৯৮) 'হিতবাদী' পত্রিকার জন্যে অনেক ছোটগল্প লিখেছিলেন শিলাইদহে বোটে বসে। বাংলা সাহিত্যে ছোটগল্পের যে রূপ আজ বিশ্ব-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কথাসাহিত্যের সমপর্য্যায়ে উন্নত স্থানের দাবী করছে— রবীন্দ্রনাথই সেই ছোটগল্পের আবিষ্কার কর্তা, আজ সবাই সে কথা স্বীকার করছেন। রবীন্দ্রনাথের কলমে বাংলাভাষার যে অনুপম কথাসাহিত্যের সৃষ্টি, তার অধিকাংশ উপাদানই যে তিনি পল্লীজীবনের বাস্তব ঘটনা থেকে পেয়েছিলেন, তার কারণ বিশেষ অনুসন্ধান করলেই পাওয়া যায়। তিনি

নিজেও তাঁর অনেক কাহিনীর বাস্তব উপাদানের কথা উল্লেখ করেছেন (প্রভাত-বাবুর রবীন্দ্রজীবনী ১ম সংস্করণ ১ম খণ্ড, পৃঃ ২২২)।

আমার জ্যেঠামশাইএর কথিত কাহিনী থেকেই বোঝা যাবে যে তাঁর কাহিনী রবীন্দ্রমানসের অপূর্ব কল্পনায় কি অনুপম মননশীলতায় একটি সুন্দর সার্থক পল্লীচিত্রে রূপায়িত হয়েছে। তিনি যেন স্বয়ং পল্লীর নদীতীরে মৃতদাহের কাজেও অভিজ্ঞ। গল্পের অপূর্ব ভয়াবহ পটভূমিকা এবং ভীষণ শ্মশানে দুর্যোগময়ী গভীর নিশীথে করুণ শবদাহের বাস্তবচিত্র তাঁর গল্পের মধ্যে যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তিনি বলেছেন যে তাঁর গল্পের উপাদানই যে রবীন্দ্রনাথের "জীবিত ও মৃতের" সৃষ্টি করেছিল—তাতে তাঁর অনুমাত্র সন্দেহ ছিল না। জ্যেঠামশাই যেভাবে কাহিনীটি বলেছেন আমি হুবহু সেইভাবেই গল্পটি বলছি—

তিনি বলেছিলেন—"তখন আমরা পাশ করে পাবনায় উকীল হয়ে বসেছি, পয়সাও বেশ পাচ্ছি। আমাদের তরুণ উকীলদের একটা দল ছিল। তাতে উকীল গিরিশ রায়, প্রকাশ রায় ডাক্তার জগৎ রায় গৌরীবাবু আর আমি ছিলাম বিশেষ উৎসাহী ও সাহসী। পাবনার তাঁতিবন্দ জমিদার পরিবারের সঙ্গে আমরা অতি ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাবে মেলামেশা করতাম।

সেই সময় ঐ জমিদারবাবুদের বাড়িতে এক বর্ষণমুখরিত সন্ধ্যায় বন্ধুদের সঙ্গে তাস খেলছি। রাত্রি বাড়ছে, হঠাৎ বাবুদের অন্দর থেকে কান্না শোনা গেল। খবর এলো হঠাৎ সন্ন্যাসরোগে তাঁদের বাড়ির এক বালবিধবার মৃত্যু হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে বাবুদের এক ছেলে "কাকিমা কোথায় গেলি—" বলে কেঁদে অস্থির হয়ে পড়ছে। সদ্যমৃত বিধবাটির নয়নের মনি ছিল তাঁর শিশু দেবরপুত্রটি। আবার সেও ছিল কাকিমা-অন্ত প্রাণ, কারণ তার মা ছিলেন চিররুগ্না।

শ্রাবণ মাস। সকাল থেকেই আকাশ ঘনঘটাচ্ছন্ন—সেদিন যেন কিসের ছুটিতে আদালত বন্ধ, তাই তাসের আড্ডা বেশ জমকালো। জমিদারবাবু খুব মুসড়ে পড়লেন। আর যাই হোক, তাঁর বিশেষ ভাবনা হ'ল এই ভীষণ দুর্যোগে শবদাহ হবে কেমন করে। মৃত্যুটাও এত আকস্মিক যে দাহকার্যের উপযুক্ত কাঠ সংগ্রহ করাও সময়সাপেক্ষ। জমিদারবাবু তাঁর আমলাদের বললেন। কিন্তু শুকনো কাঠ ঐ ঘন বর্ষায় কোথায়ও সংগ্রহ করতে না পেরে বাগানের আমগাছ কেটে কাঠের ব্যবস্থা হল। রাত্রিও বাড়ছে,—আকাশ ক্রমেই বেশীরকম মেঘাচ্ছন্ন হয়ে পড়লো। এদিকে অন্তঃপুরে ছেলেটি "কাকিমারে—কাকিমা—" ব'লে কেঁদে গড়াচ্ছে; মেয়েরা সবাই কাঁদছে। একে দুর্যোগের

রাত তার ওপর শোকের দুঃসহ আঘাতে মনটা যেন ভেঙেচুরে চৌচির হয়ে গেল।

কাঠ তৈরী হচ্ছে দেখে আমরা চার পাঁচজন উকীল ও ডাক্তার বন্ধুরা শব নিয়ে শ্মশানযাত্রা করলুম। আকাশে মেঘের গর্জন; আমরা 'হরিবোল' বলে বেদনাভরা মনে শবকাঁধে রওনা হলুম--আর ছেলেটি "ওরে কাকিমারে—কোথা গেলিরে—" বলে কেঁদে গড়াতে লাগ্‌লো। কী ভয়ঙ্কর সে রাত।

শিঙের শ্মশান পাবনা টাউন থেকে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে। নিকটে আর শ্মশান ছিল না তখন। শিঙের শ্মশানকে লোকে মহাশ্মশান বলে জানে। প্রবাদ,—সেখানে নাকি রাত্রি হলেই মাকালী জিভ্‌ বের করে চুল এলিয়ে দিয়ে দৈত্যদানা, প্রেতিনী যোগিনীদের নিয়ে ভীষণ নৃত্য শুরু করেন। সারারাত নেচেগেয়ে রক্ত খেয়ে খলখল হেসে শেষ রাত্রে ইছামতীর কালো জলে শেওলার মধ্যে শুয়ে থাকেন আর প্রেতিনী যোগিনীরা মড়ার হাড় চিবিয়ে শ্মশানের বড় বড় তেঁতুল আর বট অশ্বত্থ গাছের পাতার মধ্যে শুয়ে থাকে। আমরা দলবেঁধে একটা লণ্ঠন আর হুঁকোকল্‌কে নিয়ে রওনা হলাম।

মেঘের গর্জন বেড়ে উঠ্‌লো, বিদ্যুৎ চম্‌কিয়ে চোখ ধাঁধিয়ে দিতে লাগ্‌লো। আমরা বহুকষ্টে শ্মশানে পেঁছে ইছামতী নদীর একেবারে জলের কিনারায় মড়ার খাটিয়া রেখে সবাই তামাক খেয়ে একটু চাঙ্গা হয়ে নিলুম। তার পর খাটিয়া থেকে শব নাবিয়ে ছুঁয়ে কাঠের জন্য তীরের দিকে হাঁক্‌ ছাড়লুম। কাঠের গাড়ীর কোন সাড়া পেলুম না। এদিকে সঙ্গে সঙ্গে হুড়মুড় করে এলো ভয়ানক বৃষ্টি। মুশলধারে বৃষ্টি, সঙ্গে সঙ্গে মেঘের গুরু গর্জন আর বিদ্যুতের চম্‌কানি আমাদের যেন কোন্‌ ভয়াবহ প্রেতপুরীতে নিয়ে গেল। লণ্ঠন গেছে নিবে, গভীর অন্ধকার। আমরা আর কোন উপায় না দেখে সেই অবিশ্রান্ত বৃষ্টি মাথায় করে তীরের দিকে ছুট্‌লুম এবং একটা ভাঙা বাড়ির বারান্দায় গিয়ে হিহি ক'রে কাঁপ্‌তে লাগ্‌লুম,—থাক্‌লো মড়া ঐখানে—ইছামতীর তীরে।

ঝাড়া দুঘণ্টা মুশলধারে বৃষ্টি, তার পর শুরু হল ঝড়। মড়মড় ক'রে কতকগুলো তেঁতুলের ডাল ভেঙে পড়লো আমাদের সামনেই। এই দুর্যোগে কাঠের গাড়ী এই শিঙের মহাশ্মশানে আসবে কিনা কে জানে। ঝড়বৃষ্টি থেমে গেলে সবাই কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে শ্মশানে জলের কিনারে এসে দেখি, কী সর্বনাশ! মড়া নেই; মড়ার খাটিয়াটার খানিক ইছামতীর জলে দোল খাচ্ছে।

এখন উপায়? শীতে কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে মড়া খুঁজতে লাগ্‌লুম, জলের

মধ্যে নেবেও খংজতে লাগলম, কিন্তু হায়, মড়া কোথাও খংজে পাওয়া গেল না। তখন আমাদের শোচনীয় অবস্থা, এখন কী করা যাবে,—কাঠের গাড়ী বৃষ্টি বন্ধ হলেই এসে পড়বে, কিন্তু মড়া কোথায় যে পোড়াবো! কয়জনে মিলে পরামর্শ করা গেল, আমরা ক'জন ছিলাম উকীল,—স্থির করলম, গিয়ে বলবো শবদাহ করা হয়ে গেছে। কিন্তু যদি মড়া ভেসে গিয়ে কোনো গাঁয়ে গিয়ে ওঠে—তবে তো সেকথা তাঁদের কানে যাবে। মহা ভাবনা হল· কাঠের গাড়ীর কোন খোঁজ নেই। সোঁ সোঁ বাতাস,—বোধ হলো ভোর হবার বেশি দেরী নাই। বৃষ্টির জলের তোড়ে ইছামতীর স্রোতে কোথায় গেল মড়া - এই গভীর অন্ধকারময়ী নিশীথে কে তার সন্ধান দেবে!

তবু খংজছি কাদার মধ্যে, শেওলার মধ্যে। মেঘাচ্ছন্ন আকাশে এমন সময় ভোর হ'ল। একটুখানি আলোর সন্ধান পেলাম। খংজতে খংজতে দেখি ইছামতীর প্রায় এক মাইল উজানে একটা জীর্ণশীর্ণ বিধবা মেয়ে নদীর মধ্যকার একটা শকনো গাছের ডালে ঠেস্ দিয়ে বসে রয়েছে। তার ছেঁড়া কাদামাখা কাপড় বাতাসে উড়ছে। মেয়েটিও দিব্যি ডালে বসে আরাম করে দোল খাচ্ছে। ওবে বাপরে! সে কী দেখলম। ওদের বৌ নিশ্চয়ই মরে নাই, সন্ন্যাস বোগে হয়তো অজ্ঞান হয়েছিল, শ্মশানে এসে বৃষ্টিব ঠাণ্ডা জলে আর হাওয়ায় বেঁচে উঠেছে। কী তাজ্জব ব্যাপাব।

আমরা দূরে দাঁড়িয়ে বহক্ষণ জল্পনা কল্পনা করতে লাগলম। বৌটিব কাছে যেতেও সাহস হচ্চে না; আব না গেলেও তো উপায় নেই। এখন এই জ্যান্ত বৌকে নিয়ে কী করা যাবে! মহা মস্কিল। আমরা শধই ভাবছি। এমন সময় ঘাটে একটা লোক নাইতে এলো। সে বললে—"মশাইরা বোধ হয় মড়া পোড়াতে এসেছেন। ঐ তো আপনাদের মড়া, জলঝড়ে ভেসে এসে গাছের ডালে আটকে আছে। লোকে দেখে যে ভয়ে মরে যাবে। শিগগীর আপনারা দাহ ক'রে ফেলন গে।" অবিশ্রান্ত বৃষ্টিতে নদীর জলস্রোত তীব্র-বেগে ছটেছে আর নদীমধ্যস্থ একটা শকনো তেঁতুলগাছের ডালে আটকে গিয়ে শবদেহটি স্রোতের বেগে কাঁপছে।

এতক্ষণে আমাদের বদ্ধির গোড়ায় জল এলো। কাছে গিয়ে দেখি,—কে বলবে মড়া,—বৌটি দিব্যি আরামে ডালে বসে দোল খাচ্ছে আর দটো পা নাড়াচ্ছে। তৎক্ষণাৎ সেখান থেকে মড়া শ্মশানে আনা হল। ইতিমধ্যে কাঠের গাড়ী এসে পড়েছে, তারাও আমাদের খংজছে। ভিজে সবই, কাঁচা কাঠ—বহকষ্টে চিতেয় তুলে শবদাহ শেষ করতে প্রায় সন্ধ্যা হয়ে এলো।

শবদাহ সেরে বাড়ি ফেরবার পথে জমিদার বাড়ির পাশ দিয়ে আস্‌তেই শুন্‌তে পেলাম—সেই ছেলেটি আকুল হ'য়ে কাঁদছে—"ওরে কাকিমা রে—কোথায় গেলিরে।"

রবীন্দ্রনাথ এই বাস্তব ঘটনাকে নিয়ে যে করুণ চিত্র এঁকেছেন—তার গভীর বেদনার আবেদন মনকে অনেকক্ষণ ভারাক্রান্ত ক'রে রাখে। তাঁর 'কাকিমা' জীবন্ত ফিরে গিয়ে ম'রে প্রমাণ করে গেলেন—তিনি "জীবিত না মৃত।"*

*শ্রীপুলিনবিহারী সেন সংকলিত "রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প, তথ্যপঞ্জী" (শ্রীপ্রমনাথ বিশী প্রণীত)………পৃঃ ৭২।

তোমার ধূলির তিলক পরেছি ভালে

দেবী মৃণালিনী

রবীন্দ্রনাথের সহধর্মিণী দেবী মৃণালিনীকে খুব ছোট বেলায় দেখেছি। তাঁর সম্বন্ধে সত্যকাহিনী সংগ্রহ করাও কষ্টকর, কেউ কিছু সংগ্রহ করেছেন কিনা জানি না। দেবী মৃণালিনীর আসল নাম ছিলো ভবতারিণী। তিনি ছিলেন খুলনা জেলার মেয়ে, দক্ষিণডিহীর স্বর্গীয় বেণীমাধব চৌধুরীর কন্যা। জোড়াসাঁকো ঠাকুর বংশের সেকালের ঘরণীরা অনেকেই ছিলেন যশোর ও খুলনা জেলার মেয়ে। ঠাকুর বংশের আদি নিবাসও যশোর জেলায়।

১৩০২ কি ১৩০৩ সাল হবে। সে সময়ে কয়েক বছর ধ'রে রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে শিলাইদহে বাস করতেন। তখনকার শিলাইদহ কুঠিবাড়ি তাঁর ছেলেমেয়ে আত্মীয় বন্ধুবান্ধবদের সমাগমে গম্‌গম্‌ করতো। সে যেন একটা সোনার যুগ ছিলো। সারা ভারতের কত বিখ্যাত মনীষী ঐ সময়ে শিলাইদহে পদার্পণ করতেন। বাংলার অধিকাংশ অভিজাত জমিদারই শহরবাসী, পল্লীর জমিদারী তাঁদের পায়ের ধুলা বড় একটা পায় না; কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সে রকমের ভূস্বামী ছিলেন না। পল্লী প্রকৃতিতে ভালবেসে সাহিত্য-সাধনার জন্যেই হোক্ বা জমিদারীর কাজকর্মের দায়িত্ববোধেই হোক্, তিনি ছায়াঘেরা পাখীডাকা পল্লীতে বহুদিন বাস করতেন,—এমন কি সপরিবারে,—অনেকটা স্থায়িভাবে বল্লেও চলে।

সে সময়ে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে যে কয়েকজন দারোয়ান আর বরকন্দাজ থাকতো, তাদের মধ্যে দু'জন ছিলো শিখ। তাদের নাম শরণ সিং আর গণপৎ সিং। তারা স্থানীয় হিন্দু মুসলমান বরকন্দাজের চেয়ে বেশি মাইনে পেতো। সেকালের বরকন্দাজদের মাইনেও কম ছিলো, তবু তাদের খাওয়া-পরার কোন কষ্ট ছিলো না।

শরণ সিং আর গণপৎ সিং অনেক দিন থেকে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে চাক্‌রী ক'রেছিলো—তাদের মাইনে ছিলো মাসে ২০৲ কুড়ি টাকা ক'রে। তারা প্রথমে ১৪৲ টাকায় বাহাল হয়েছিলো। সেই সময়ে গণপৎ সিংএর একজন আত্মীয় দারুণ অভাবের জ্বালায় দেশ ছেড়ে নানা জায়গায় চাক্‌রীর চেষ্টা করছিলো। কোথায়ও কোন সুবিধা করতে না পেরে সে শেষে শিলাইদহে এসে চাক্‌রীর প্রার্থনা জানালো। এ পাঞ্জাবীটার নাম ছিলো মুলা সিং। মুলা সিং যেমন লম্বা তেম্‌নি চওড়া। তার ছিলো বীরের মত বিরাট দেহ,

তেম্‌নি জম্‌কালো চেহারা। শিলাইদহ কুঠির হাটের মধ্যে যখন সে দাঁড়াতো, তখন লোকের ভিড়ের মাথার উপরেও একহাত উঁচুতে তার মাথা দেখা যেতো। তার যেমন বিরাট দেহ,—তার আহার ছিলো তদনুরূপ,—এমন কি রাক্ষসের মত।

মুলা সিং যেদিন নিযুক্ত হলো, সেদিন রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে উপস্থিত ছিলেন না। গণপৎ সিং তার দুর্দশা দেখে এস্টেটের ম্যানেজারবাবুর কাছেও না নিয়ে গিয়ে একেবারে তাকে কুঠিবাড়ির দোতালায় তাদের 'ছোট মাইজীর' কাছে নিয়ে হাজির করলো। মুলা সিং কেঁদে কেটে তার দুঃখদুর্দশার বর্ণনা ক'রে প্রার্থনা জানালো, তাকে যেমন ক'রেই হোক্‌ পালন না করলে তাকে সপরিবারে ধরাপৃষ্ঠ থেকে চলে যেতে হবে। করুণাময়ী মৃণালিনী দেবী নিজেই তাকে দারোয়ানের কাজে বাহাল ক'রে দিলেন। সেইদিনই তা'র পনেরো টাকা মাসিক মাইনে ধার্য হলো। জমিদারগৃহিণী বল্‌লেন, "বাবু এলে তাঁকে ধরে পরে মাইনের বিষয় বিবেচনা করা যাবে।"

মুলা সিং অকূল সাগরে কূল পেলো,—বেশ হাসিখুশি হ'য়ে কাজে লেগে গেলো। কিন্তু বেচারী যে মাইনে পেতো তার প্রায় সবই খরচ ক'রে ফেল্‌তো— আটা, ড়হরের ডাইল আর 'ঘেউ' খেয়ে। তার ঐ অমানুষিক বিরাট দেহ-খানাকে চালু রাখবার জন্য তা'র খোরাক ছিলো সে যুগের বৃকোদরের মত। সবাই মুলা সিংকে 'ভীম সিং' ব'লে ডাক্‌তো আর তার তৈরী চাপাটীর দিকে অবাক হ'য়ে চেয়ে থাক্‌তো।

বেচারা মুলা সিং বেশ ফুর্তির সঙ্গেই কাজকর্ম ক'রে যাচ্ছে, কিন্তু মাসের শেষে তা'র মুখখানা বড়ই মলিন হয়ে গেলো, কাজের উৎসাহও যেন নিবে যাবার মত হলো; রাত্রে দেউড়ীতে ব'সে গালে হাত দিয়ে ভাব্‌তো। তার এই বিমর্ষভাব কি কারণে সকলেই জান্‌তো,—তা দেবী মৃণালিনীর দৃষ্টিও এড়ায় নি।

একদিন ছোটমা মুলা সিংকে ডেকে তার বাড়িঘরের অবস্থা সব জিগ্‌গেস যাবার মত হলো; রাত্রে দেউড়ীতে ব'সে গালে হাত দিয়ে ভাব্‌তো। তার প্রশ্নকর্ত্রীর চোখও সে ভিজিয়ে দিলো। শরণ সিং ছোটমাকে জানালো,— "মাইজী, মুলা সিংএর রোজ তিন সের ক'রে আটা লাগে দু'বেলায়। ও খেয়েই সব শেষ করে। বাড়িতে টাকা পাঠাতে পারে না।" দেবী মৃণালিনীও শুনে জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন।

ঠাকুর এস্টেটে চিরকালই নিয়ম-কানুনের বড় কড়াকড়ি। ছোটমা তো হঠাৎ এস্টেটের ধরাবাঁধা আইনের ব্যতিক্রম করতে পারেন না। মুলা সিংএর

কাজ দু'মাসও হয় নি। তার মাইনে বাড়াবার কী উপায় হবে,—বিশেষ রবীন্দ্রনাথ তখনও শিলাইদহে আসেন নি। তার পরদিন ভোরে ছোটমা তাঁর সংসার থেকে তিন সের আটা মুলা সিংকে পাঠিয়ে দিলেন।

মুলা সিং ছোট মাইজীর চাকর বিপিনের হাতে তিন সের আটা পেয়ে অবাক্ হয়ে গেলো। বিপিন তাকে জানিয়ে দিলো—এখন থেকে রোজ সকাল বেলা তিন সের ক'রে আটা দারোয়ানজীকে দেবার বরাদ্দ হয়ে গেছ।

মুলা সিং তিন-চার মাস বেশ ফুর্তিতে কাজ ক'রে যাচ্ছে। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে এলেই মৃণালিনী দেবী তা'র মাইনে বাড়াবার জন্যে বিশেষভাবে অনুরোধ করলেন। ম্যানেজারবাবুর মন্তব্যাদি শুন্‌বারও সময় হলো না,—মুলা সিংএর মাইনে বেড়ে কুড়ি টাকা হলো। মুলা সিংএর আনন্দ-উৎসাহ আর ধরে না!

সবাই ভাবলো এইবারে মুলা সিংএর দৈনিক বরাদ্দ তিন সের আটা বন্ধ হবে। বিপিন গিয়ে ছোটমাকে পরামর্শ দিলো যে, এখন সংসার-খরচ থেকে তাকে আটা দেওয়া বন্ধ করা হোক্। কিন্তু তাতে কোন ফল হলো না; পাচক ঠাকুরও ঐরকম প্রস্তাব করতে গিয়ে উপর থেকে তাড়া খেয়ে এলো। এত ক'রেও দৈনিক আটার বরাদ্দ বহাল তো রইলোই, উপরন্তু ছোটমা প্রায়ই তাকে ডেকে জিজ্ঞেস করতেন,—"খাওয়ার তো কষ্ট হচ্চে না?—বাড়িতে ছেলেমেয়েরা ভাল আছে তো?" মুলা সিংএর মত দর্শনধারী দারোয়ান শিলাইদহে বড় একটা দেখা যায়নি।

সেই সময় মৃণালিনী দেবী শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে একটি সুন্দর শাক-সব্‌জীর বাগান করেছিলেন। নিজে ঐ বাগানে কাজকর্ম দেখ্‌তেনই, অনেক সময় ছেলেমেয়েদের সঙ্গে নিয়ে বাগানের কাজকর্ম করতেন। তিনি নিজে উদ্যোগ ক'রে ঐ বাগানের শাকসব্‌জী ও তরকারী কর্মচারীদের বাড়ি পাঠিয়ে দিতেন। যে সময়ে যে সমস্ত আমলা সপরিবারে বাস কর্‌বার সুবিধা পেতেন না, তাঁদের জন্য একটা মেস্ খুল্‌বার প্রস্তাব হয়; এস্টেট্ থেকে মেসের ঘরদোর ক'রে দেওয়া হলো; আবার অল্প বেতনভোগী কর্মচারীদের জন্য যাতে মেসে এস্টেট্ থেকে একজন পাচক দেওয়া হয়, মৃণালিনী দেবীই তার ব্যবস্থা ক'রে দেন; পরে একটী চাকরও এস্টেটের খরচে মেসে রাখ্‌বার ব্যবস্থা করেছিলেন। শুধু তাই নয়, কুঠিবাড়ির বাগানের তরিতরকারী সপ্তাহে দু'দিন ক'রে মেসে পাঠাবার ব্যবস্থা ক'রে দেন।

বিদেশী আমলাদের প্রায়ই কুঠিবাড়িতে নিমন্ত্রণ থাকতো। ছোটমা প্রায়ই নিজে উদ্যোগ ক'রে নানারকমের পিঠে পরমান্ন তৈরী করতেন এবং আমলাদের

ডেকে এনে নিজে দাঁড়িয়ে থেকে 'এটা দাও, ওটা দাও' ক'রে সবাইকে পরিতোষ ক'রে খাওয়াতেন। সে সময়কার লোকেরা বলে যে তিনি খুব ভাল গৃহিণী ছিলেন এবং গৃহস্থঘরের খুঁটিনাটি সমস্ত গৃহস্থালী নিজে হাতে করবার জন্য সব সময় আগ্রহ প্রকাশ করতেন।

কিছুদিন পরে যখন দেবী মৃণালিনী তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে শিলাইদহ ছেড়ে চ'লে যান, তখন কুঠিবাড়ির চাকর দারোয়ানদের মন একেবারে ভেঙে গেলো। শরণ সিং, গণপৎ সিং, বিশেষ ক'রে মুলা সিংএর সে কী কান্না! বিজয়া দশমীর দিনে যেন মায়ের বিসর্জন হবে! বিদায়ের আয়োজনের সোরগোলের মধ্যে যেন বিরাট হাহাকার ডুক্‌রে কেঁদেছিলো—ছোট বড় কোন আমলা চাকরদের মনে আর আনন্দ ছিলো না। মুলা সিংএর কান্না দেখে ছোটমা তাদের সবাইকে ডাকালেন নিজের কাছে, তাদের বল্লেন, "আবার তোদের কাছে ফিরে আসবো। তোদের কথা আমি কখনো ভুল্‌তে পারবো না।" তাদের অশ্রুসজল মুখের সেই বিদায়; সেই বিদায়েই শিলাইদহ থেকে মায়ের বিসর্জন হয়েছিলো। দেবী মৃণালিনী স্বামী পুত্রকন্যা রেখে ১৩০৯ সালে ৭ই অগ্রহায়ণ তারিখে সবাইকে শোকসাগরে ভাসিয়ে স্বর্গে চলে গেলেন। সে দুঃসংবাদ শিলাইদহ পৌঁছিলে শিলাইদহ কাছারী আর কুঠিবাড়ির ছোট বড় সকল কর্মচারীই অশ্রুজল ফেলেছিলো।

শিলাইদহের অনেকেই বলেন যে, স্ত্রী-বিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথকে এখানকার সবাই সন্ন্যাসীর বেশেই দেখ্‌তেন। রবীন্দ্রনাথের অন্তরের শোক কোন দিনই বাইরে প্রকাশ পায় নি। সেকালকার পুরানো কর্মচারীরা বলেন যে, রবীন্দ্রনাথ স্ত্রী-বিয়োগের পর থেকে শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে থাক্‌তেন না, —তাঁর বোটেই বাস করতেন, নিতান্ত কোন উপলক্ষ্য না হলে কুঠিবাড়িতে যেতেন না।

মুলা সিংএর কথা আর একটু ব'লে গল্প শেষ করবো। মৃণালিনী দেবী শিলাইদহ ছেড়ে যাবার দিন মুলা সিংএর মাইনে বেড়ে পাঁচিশ টাকা হয়েছিলো, —সেই নজীরে শরণ সং আর গণপৎ সিংও বেতন বৃদ্ধি পেয়েছিলো। দেবী মৃণালিনী চারদিকে করুণ ছলছল চোখে চেয়ে যেন শিলাইদহের কাছ থেকে সেদিন চিরবিদায় নিয়ে কাঁদতে কাঁদতে পাল্কীতে উঠেছিলেন।

সেই করুণ দেবী-বিসর্জনের দৃশ্য স্বচক্ষে দেখেছে, এমন লোক আজও আছে।

দেবী মৃণালিনী এত বড় অভিজাত বড় ঘরের ঘরণী হয়েও বাংলাদেশের নিষ্ঠাবান গৃহস্থ বধূর মত ছিলেন। তাঁর ব্যবহারে ছিল সুন্দর সারল্য,

মধুর সামাজিকতা আর শ্বশুর কুলের উপর অবিচলিত নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা। তাঁর শ্বশুর ছিলেন মহর্ষি, তাঁকে রাজর্ষিও বলা যেতে পারে। শ্বশুরের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তিতে তাঁর মন ভ'রে থাক্‌তো, মহর্ষিদেবেরও কনিষ্ঠ পুত্র-বধূটির উপর স্নেহের অন্ত ছিল না। শ্বশুর যেটা পছন্দ করতেন না তা তিনি সযত্নে পরিহার ক'রে চল্‌তেন। "বাবা মশাইএর এটা মত নয়। এটা তাঁর পছন্দ নয়; এটা আমি ক'রবো না।" সত্যিকার হিন্দু কুল-বধূর মত. সেবাপরায়ণা গৃহিণীর মত তিনি নিজ হাতে সংসারের কাজ করতে ভাল বাসতেন। রান্নাতে তিনি অসাধারণ পটু ছলেন। তাঁর গার্হস্থ্য জীবনে রবীন্দ্রনাথের চরিত্রের প্রভাব পড়ে অপূর্ব হ'য়ে উঠেছিলো। সংসারের কর্তৃত্ব ও দায়িত্ব সমস্তই তাঁর হাতে সঁপে দিয়ে রবীন্দ্রনাথ নিরুদ্বিগ্ন মনে সাহিত্য ও দেশ সেবার সুযোগ ষোল আনা পেয়েছিলেন।

অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিশাল সাহিত্যসাধনায় সুযোগ্য সহধর্মিনীই পেয়েছিলেন। হয়তো তাঁর সমকক্ষা যথেষ্ট প্রতিভা-শালিনী কোন মহিলাকে তিনি তাঁর উপযুক্ত সহকর্মিনীরূপে পেলেও সার্থক সহধর্মিনীরূপে জীবনসঙ্গিনী করে নিতে পারতেন না। দীপ্ত রবির খরতাপের সঙ্গে বনের শ্যামল স্নিগ্ধচ্ছায়ার মিলন ও বিকাশই স্বাভাবিক, শোভন ও ফলপ্রসু হয়ে থাকে। সহধর্মিনীর অকালমৃত্যুশোকে কবি "স্মরণ" কবিতাগুচ্ছ রচনা করেছিলেন, কিন্তু শোকের ব্যাকুলতা বা সামান্য হতাশা কোন রচনাতেই প্রকাশ করেন নাই। তাঁর প্রিয়বন্ধু দীনেশচন্দ্র সেনকে লিখেছিলেন:—

"ঈশ্বর আমাকে যে শোক দিয়াছেন, তাহা যদি নিরর্থক হয়, তবে এমন বিড়ম্বনা আর কি হইতে পারে। ইহা আমি মাথা নীচু করিয়া গ্রহণ করিলাম। যিনি আপনার জীবনের দ্বারা আমাকে নিয়ত সহায়বান করিয়া রাখিয়াছিলেন তিনি মৃত্যুর দ্বারাও আমার জীবনের অবশিষ্ট কালকে সার্থক করিবেন। তাঁহার কল্যাণী স্মৃতি আমার সমস্ত কল্যাণকর্মের নিত্য সহায় হইয়া বলদান করিবে। ১৮ অগ্রহায়ণ. ১৩০৯ সাল।" অলোকসামান্য কবিজীবনের বিরাট ইতিহাসে কবিপ্রিয়ার নগণ্য উল্লেখের কারণ উপনিষদের ঋষির মতই কবি দুইটী কথায় প্রকাশ করে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথ চাইতেন তাঁর গৃহিণী ও পুত্র কন্যারা পল্লীর সরল আবেষ্টনের মধ্যে, জীবন-ধারণের আড়ম্বর-শূন্য স্বল্প উপকরণের মধ্যে নিঃস্বার্থ কল্যাণময় জীবন গড়ে তুল্‌বেন। তাই তিনি পত্নীকে লিখেছিলেন—"সেইজন্যেই আমি কলকাতার স্বার্থদেবতার পাষাণ মন্দির থেকে তোমাদের দূরে নিভৃতে পল্লী-গ্রামের মধ্যে নিয়ে আস্‌তে এত উৎসুক হয়েছি। এখানে অল্পকেই যথেষ্ট

মনে হয় এবং মিথ্যাকে সত্য বলে ভ্রম হয় না।" স্ত্রী পুত্র পরিবার নিয়ে শিলাইদহের নিভৃত পল্লী-নিকতনে সংসার বাঁধবার জন্য তাঁর অন্তরের আকাঙ্ক্ষা ছিল গভীর।*

শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে কবিগৃহিণী তাঁর ছেলেমেয়েদের নিয়ে অতি সুন্দর একটী ফুলের ও সব্জীর বাগান করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ একখানা চিঠিতে তাঁর সযত্নে গড়া বাগানের গাছগাছালির কুশল সংবাদ জানাচ্ছেন অপরূপ ভাষায়। শাক, ডাঁটা, বেগুন, কুমড়া, গোলাপ, রজনীগন্ধ, গন্ধরাজ, মালতী, ঝুম্‌কো, মেদি, হাস্‌নুহানা প্রভৃতি তাঁর মানসপুত্রকন্যারা কে কেমন আছে তা খুঁটিয়ে লিখে শেষে জানিয়েছেন, "সবাই জিজ্ঞাসা করছে মা কবে আস্‌বেন? আমরা আসবো না শুনে এখানকার আমলারা সব দমে গিয়েছিল।" তাতো হবারই কথা, কারণ আমলা বরকন্দাজদের কোন না কোন ছুতোয় প্রতি সপ্তাহেই কুঠিবাড়িতে নিমন্ত্রণ ফ'স্‌কে যায় যে!

দেবী মৃণালিনী পাকা গৃহিণী ছিলেন। সংসারের ব্যবহারের জন্য তাঁর ঘি-এর ফরমাইজ পেয়ে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠিখানিতে জমিদারীর গোয়ালাদের কাছ থেকে "ঘেরতো" সংগ্রহ ক'রে পাঠাবার খবর লিখেছেন সে চিঠিখানি পড়লেই কবির রহস্যপ্রিয়তায় অপরিসীম আনন্দে মন ভ'রে ওঠে। শান্তি-নিকেতনের সেকালের ছাত্রেরা তাঁর কাছে সত্যিকারের মাতৃস্নেহ পেয়ে যেন আশ্রম-লক্ষ্মীর কোলে মানুষ হ'য়ে উঠ্‌ত। শান্তিনিকেতনের প্রতিষ্ঠা ও চালাবার জন্য কবিগৃহিণীর নানাভাবে অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার ও হাসিমুখে দুঃখবরণও রবীন্দ্রনাথের যোগ্য সহধর্মিনীর পরিচয় দিচ্ছে। সেই গৃহলক্ষ্মীর বিচ্ছেদে বিরহী কবিগুরুর প্রাণেও প্রশ্ন জেগেছিল—

> "আজ শুধু এক প্রশ্ন মোর মনে জাগে,—
> হে কল্যাণী! গেলে যদি, গেলে মোর আগে;
> মোর লাগি কোথাও কি দু'টী স্নিগ্ধ করে
> পাতিয়া রাখিবে শয্যা চিরসন্ধ্যা তরে?"

* চিঠিপত্র—প্রথম ভাগ—রবীন্দ্রনাথ।

লরেন্স সাহেব

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘকাল শিলাইদহ বাসের সুযোগে আমরা দেশ-বিদেশের অনেক মহাপ্রাণ মানুষের অন্তরের পরিচয় পাবার সৌভাগ্য লাভ করেছি। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে সেকালে অনেক সাহেব, জাপানী ও চীনবাসী শিলাইদহে আস্‌তেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অনেকদিন শিলাইদহে বাস ক'রে গেছেন।

রবীন্দ্রনাথের পুত্র রথীন্দ্রনাথের ইংরাজীর গৃহশিক্ষক লরেন্স সাহেবের কথা আমি একটু বলেছি আমার "সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথে।" লরেন্স সাহেব কিছুকাল শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়েও ইংরাজী ভাষার শিক্ষকতা করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথ এই মহাপ্রাণ সাহেবের কথা তাঁর অনেকগুলো চিঠিতে বিশেষ ক'রে উল্লেখ করেছেন। ত্রিশ পঁয়ত্রিশ বছরের পুরানো প্রবাসীর পৃষ্ঠা খুঁজলে সেই সুন্দর চিঠিগুলো পাওয়া যাবে।* শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়ের সৃষ্টির ইতিহাসে এই মহাপ্রাণ সাহেবের নাম সোনার অক্ষরে লিখে রাখ্‌বার যোগ্য।

লরেন্স সাহেবকে সাক্ষাৎভাবে দেখেছেন এমন লোক এখনও শিলাইদহে আছেন। একজন সুসভ্য ইংরাজের সেই প্রাণখোলা সহৃদয়তা আজও কেউ ভুল্‌তে পারেননি। লরেন্স সাহেব যেমনভাবে সাধারণ লোকের সাথে নিঃসঙ্কোচে ও সরলভাবে মিশ্‌তেন, তেমন আমি তো শুনিনি। সাহেবের সম্বন্ধে যে কাহিনী বল্‌ছি তা একটুও অতিরঞ্জিত নয়। এই রকমের সুন্দর কাহিনী দু'দশ বছর পরে হয়তো মহাকালের গায়ে বিলীন হয়ে যাবে।

লরেন্স সাহেবের বাসের জন্য শিলাইদহ কুঠিবাড়ির প্রাঙ্গণের দক্ষিণপ্রান্তে একটা বাংলো ছিল। তার চিহ্ন আজও আছে। সাহেব সেইখানেই থাকতেন। তাঁর দুইটী প্রচন্ড সখ ছিল,—একটি হচ্ছে ছিপ দিয়ে মাছ ধরা, আর একটি পাইপে তামাক খাওয়া। নানান রকমের হুইল, ছিপ ফাৎনা, সুতো ইত্যাদি ভরা ব্যাগটী তাঁর একটা বড় সম্পত্তি ছিল।

তিনি গোপীনাথের পুকুরে (শিলাইদহের গোপীনাথ দিঘী) প্রায় প্রত্যহই একটা চাকর সঙ্গে নিয়ে মাছ ধরতে আস্‌তেন। সে সময়কার অনেক গ্রাম্য যুবক ও বালক তাঁর বেশ অন্তরঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর মাছ ধরার সঙ্গী

*প্রবাসী ১৩৩৩ মাঘ, পৃঃ ৪৬২।

ছিলেন তিনজন ইস্কুল-পালানো ছেলে—অনন্ত রায়, সতীশ সরকার আর জ্যোতিষ মজুমদার (জটা মজুমদার)। এ'রা সবাই আজ পরলোকে।

সাহেব গোপীনাথ দিঘীর দক্ষিণপাড়ে এক টুল পেতে ব'সে ছিপে মাছ ধরেন, আর ঐ বালকের দল ছিপ, বড়শী টোপ, চার ইত্যাদির তদ্বির ক'রে দেন। সাহেব মাছ ধরেন আর হরদম পাইপে ক'রে বিলিতি তামাক টানেন।

ঐ তিনটী প্রিয়পাত্র একদিন সাহেবকে বললেন—"স্যার আপনি আলা তামাকের কড়া পাইপ টানেন। আমাদের দেশী তামাক খেয়ে দেখুন,—কি আরাম আর কি সুন্দর।" সাহেব পল্লীজীবনের বড় ভক্ত হয়ে পড়েছিলেন; তিনি বল্লেন—"খুব ভাল কথা, একটা ভাল হুঁকোও চাইতো।"

সাহেব কুষ্টে থেকে বেশ বড় একটা ডাবা হুঁকো আনালেন। খোরসেদ-পুর বাজার থেকে গ্রাম্য দা'কাটা তামাকও যোগাড় হ'ল। মাছ ধরবার সময় ঐ হুঁকো, কল্‌কে, তামাক ইত্যাদিও ঘাটে উপস্থিত হ'ল।

মাছ ধরা চলেছে। অনন্ত রায় বেশ যত্ন করে তামাক সেজে হুঁকোয় লাগিয়ে সাহেবকে খেতে দিলেন। সাহেব সশব্দে হুঁকো টেনে আনন্দে হাস্‌তে লাগ্‌লেন, হুঁকোর মধ্যেকার জলের গড়গড় শব্দ তাঁকে বেশি ক'রে মুগ্ধ করল। সাহেব বললেন—"বাঃ, তামাক খেতে তো বেশ।" হুঁকোর মধ্যে জল থাকায় গলা ধ'রে যায় না, আবার তামাকটাও বেশ মিষ্টি লাগে দেখে সাহেব হুঁকো আর তামাকের সুখ্যাতিতে একেবারে পঞ্চমুখ হলেন।

সাহেব একদিন তাঁর অন্তরঙ্গ অনুচর অনন্ত রায়কে জিজ্ঞাসা করলেন—"শুক্‌নো পাতা থেকে এই রকম কালো কুচ্‌কুচে তামাক তৈরী করে কেমন ক'রে?"

অনন্ত রায় সাহেবকে ইংরাজী বাংলায় খিঁচুড়ী পাকিয়ে তামাক তৈরীর যে কাহিনী বল্‌লেন, তা সাহেব ভাল বুঝতে পারলেন না। সতীশ সরকার ছিলেন একটু বেশি রসিক। তিনি সাহেবকে ইংরাজী বাংলা হিন্দী আর অঙ্গভঙ্গী সহকারে বুঝিয়ে দিলেন—"দেখুন স্যর এই টোবাকো গার্ডেনে জন্মে। তা কেটে ড্রাই ক'রে মচ্‌মচে হ'লে দা দিয়ে কাট্‌ ক'রে, এই এ্যায়সা স্মল্‌ টুক্‌রো ক'রে নিতে হয়। ফিন্‌ তার সঙ্গে চিটেগুড় অর্থাৎ মোলাসেস্‌ মিক্স্‌ ক'রে চটের উপর ফেলে রাইট হ্যাণ্ড দিয়ে এই এম্‌নি এম্‌নি ভেরী ভেরী জোর্‌সে টোবাকো মেকুইং করতে হয়, আবার বিষ্ণুপুরী বা বালাখানা দিয়ে মিক্স্‌ ক'রে আবার এম্‌নি ক'রে—টোবাকো মেকুইং করতে হয়।" সাহেব তামাক তৈরীর কায়দাটা খাসা বুঝ্‌লেন এবং এমন ভয়ানক হাস্‌লেন যে তাঁর হাসি আর থামে না,—বাঁরে বারেই সতীশ সরকারকে "টোবাকো মেকুইং"

নামেই ডাক্তেন। বালকে বৃদ্ধে, বাঙ্গালী আর ইংরেজে এই রকম সরল প্রাণখোলা আমোদ চলতো।

স্বর্গীয় তারকনাথ অধিকারীর (লেখকের জ্যাঠামশাই) বড় ছেলেটী ছিলেন পাগল, কিন্তু সাহেবের সঙ্গে তাঁর খুব ভাব; কারণ যুবক পাঁচুবাবু পাগল হলেও লেখাপড়া কিছু করেছিলেন আর বেশ ইংরাজী বলতে পারতেন।

পাঁচু পাগলের পাগলামী বাড়লে তাঁকে লোহাব বেড়ী দিয়ে রাখা হ'ত। একবার পাঁচু ক্ষিদেয় অস্থির হয়ে গভীর রাত্রে বেড়ী ভেঙে দিলেন ছুট্। হাজির একেবারে কুঠিবাড়িতে সাহেবের বাংলোয় গিয়ে; সাহেব ধড়মড়িয়ে উঠলেন।

তখন অনেক বাত; পাগল সাহেবের কাছে গিয়েই বললেন "সাহেব বড্ড ক্ষিদে, খেতে দাও।" সাহেবের শোবার ঘরে অত রাত্রে খাবার কোথা থেকে আস্‌বে! ঘরে ছিল একছড়া মর্তমান কলা, তাই পাগলকে খেতে দিলেন। তাই দেখে পাগল চোটে লাল হয়ে বললে—"অ্যাম আই এ মংকী?" সাহেব যত বুঝান, পাগল ক্ষিদের জ্বালায় ততই চটে ওঠে। শেষে কলা খেয়ে পাঁচুপাগল সাহেবের একটা জামা নিয়ে বাংলোর দক্ষিণদিকের শার্শি পাল্লা-ওয়ালা একটা জানালার শিক ভেঙে উধাও।

গোলমাল শুনে লোকজন এসে পড়লে সাহেব আমোদে হাসতে হাস্‌তে বল্‌লেন—"পাঁচু ইজ এ গুড চ্যাপ। দো ম্যাড, ভেরী স্ট্রং।"

এর পরে সাহেব প্রায়ই পাঁচুপাগলেব খোঁজ করতেন—"হাউ ইজ পাঁচু? হোয়ার ইজ পাঁচু?"

এব পব লরেন্স সাহেবকে শান্তিনিকেতন বিদ্যালয়েরই অধ্যাপকরূপে গ্রহণ করা হয়।

(১) আচার্য জগদীশচন্দ্রকে শিলাইদহের কুঠীবাড়ির গুটীপোকার চাষ সম্বন্ধে চিঠি লিখছেন—"লরেন্স স্নান আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীটসেবায় নিযুক্ত। আমাকে সে দিনেব মধ্যে দশবার করিয়া টানাটানি করে—প্রায় পাগল করিয়া তুলিল। ইংরেজ জাতি কেন যে সকল বিষয়ে কৃতকার্য হয় তাহার প্রত্যক্ষ কারণ দেখিতেছি। উহাদের শক্তি চালনা করিবার জন্য বিধাতা ঊনপঞ্চাশ বায়ু নিযুক্ত করিয়াছেন, অথচ উহাদের মধ্যে বোঝাই এত আছে যে কাৎ করিতে পারে না।"

লরেন্স সাহেব সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথে আর একখানা চিঠি—

(২) * * আমাদের শান্তিনিকেতনের বোর্ডিং বিদ্যালয়ে রথীকে পড়াইব, সেইজন্য লরেন্সকে অত্যন্ত দুঃখের সহিত বিদায় দিতে হইতেছে। যদি

তোমাদের আগরতলায় ঠাকুরদের স্কুলে তাহাকে ইংরাজী অধ্যাপক নিযুক্ত কর তবে তোমাদেরও উপকার, তাহারও উপকার। এরূপ সুযোগ আর পাইবে না। লরেন্স পড়াইবার বিদ্যা যেমন জানে, এমন লোক অল্পই দেখিয়াছি। ও আমাকে এখনও ছাড়িতে চায় না, কিন্তু উপায় দেখি না। * * (ত্রিপুরার *মহিম ঠাকুর মহাশয়কে লিখিত)

জাপানী মিস্ত্রীর বৌ

"হে পদ্মা আমার,
তোমায় আমায় দেখা শত শত বার!"

এই কবিতাটী পড়েই বুঝতে পারা যায়, পদ্মানদী ছিল রবীন্দ্রনাথের কাব্য-প্রবাহের উৎস, আর "পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ ছিল তাঁর যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্য-রস-সাধনার তীর্থস্থান"। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে প্রথম প্রথম যে বজরাখানাতে থাকতেন তার নাম ছিল "চিত্রা"।

চিত্রা ছিল ছোট। তাই রবীন্দ্রনাথ নিজের পছন্দমত বড় ক'রে বিখ্যাত "পদ্মা" বোটখানি তৈরী করিয়েছিলেন অনেক টাকা খরচ ক'রে। এই বোট তৈরীর জন্যে তিনি শিলাইদহে জাপানী মিস্ত্রী আনিয়েছিলেন। সে বোধ হয় আজ থেকে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগেকার কথা। তখন ঐ কাজের জন্য একজন জাপানী মিস্ত্রী সপরিবারে শিলাইদহ কুঠিবাড়িব কাছে বাস করত। তা'রা অনেকদিন ছিল। আমরা তখন সেই বেঁটে জাপানী মিস্ত্রী-দম্পতিকে দেখে অবাক হতুম, আর ভাবতুম এই বেঁটে অদ্ভুত লোকেরা এমন সুন্দর কারিকর হয় কেমন ক'রে, আর এত কঠিন পরিশ্রম করেই বা কী ক'রে।

"পদ্মা" বোট তৈরি হচ্চে শিলাইদহের পুরানো হাটেব কাছে, যেখানে অনেকদিন আগে নীলকর শেলি সাহেবদের সেকালের প্রাচীন কুঠির ভগ্নাবশেষ ছিল। সেই লুপ্তপ্রায় নীলকুঠির ইঁটের স্তুপের উপর দিয়ে কীর্তিনাশা পদ্মা কলকল ক'রে গান গেয়ে নেচে নেচে চলেছে। বোটের সবই তৈরি হয়ে গিয়েছে; তখন কামরাগুলো তৈরি হচ্চে।

জাপানী মিস্ত্রী আর তার বৌ সারাদিন ঠুক ঠুক ক'রে হাতুড়ী পেটে, ঘ্রোস্ ঘ্রোস্ ক'রে করাত চালায়, পদ্মার ধারে সেই নূতন বোটে। বাসায় গিয়ে খায় দায়, ছেলেপিলে নিয়ে আমোদ করে, চুংচুং ক'রে গান গায়। স্বামী স্ত্রী মিলে, হাটে বাজারে শিলাইদহেব প্রসিদ্ধ মর্তমান কলা কিনে খায়, আর সবার সঙ্গে বেশ মিলেমিশে থাকে।

একদিন রবীন্দ্রনাথ নদীর ধারে এলেন সেই নূতন বোটের কাজ দেখতে। এসে দেখেন যে জাপানী মিস্ত্রী বা তা'ব বৌ সেখানে নেই। তিনি বোটের কামরা তৈরি সম্বন্ধে নূতন কিছু ফরমাশ করবার জন্য মিস্ত্রীবৌকে খোঁজ করলেন। তাকে না পেয়ে ফিরে যাবার বেলায় বোটের পাহারায় মোতায়েন

জামাল বরকন্দাজকে ব'লে গেলেন, "কাল সকালে এই সময়ে মিস্ত্রীবৌ যেন এইখানে উপস্থিত থাকে, তাকে আমি কাজের সম্বন্ধে কিছু উপদেশ দেবো। তাকে আজই এই কথা ব'লে রেখো।"

জামাল বরকন্দাজ সেকালের একজন জবরদস্ত বরকন্দাজ ছিল, বেশ জোয়ান-মর্দ চালাক চতুর লোক ব'লে পশার-প্রতিপত্তিও ছিল খুব। সে প্রায়ই জলকর মহালে মোতায়েন থাকতো। তাই জেলে আর নিকারীরা তাকে খুব ভয় ক'রে চলতো। কিন্তু দুঃখের বিষয়, জামাল বরকন্দাজ নানান কাজের তালে রবীন্দ্রনাথের ঐ হুকুম মিস্ত্রীবৌকে বলতে একেবারেই ভুলে গেল।

তার পরদিন ভোরে যথাসময়ে রবিবাবু বোটের কাছে এসে দেখেন মিস্ত্রীবৌ তখনও আসেনি। তিনি কিছুক্ষণ সেখানে অপেক্ষা ক'রে কুঠিবাড়িতে খুব বিরক্ত হয়ে ফিরে গেলেন। মিস্ত্রীবৌর একটী ছেলের অসুখ হওয়ায় সে ম্যানেজারবাবুকে ব'লে দুই-তিন দিনের ছুটী নিয়েছিল, তা'র স্বামীও কী যেন কিনবার জন্যে কলকাতায় গিয়েছিল। এদিকে জামাল বরকন্দাজ এমন ভুলই ক'রে বসলো যে তাতে ব্যাপার গড়ালো অনেক দূর।

রবীন্দ্রনাথ কুঠিবাড়িতে মিস্ত্রীবৌকে রান্না করতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, জামাল বরকন্দাজ কি তাকে কোন খবরই দেয়নি? মিস্ত্রীবৌ এই কথা শুনে খুব দুঃখিত হ'ল। সে জানালো "বাবু, আমি এই খবরটুকু পেলেই আজ সকালে বোটের কাছে হাজির থাকতুম। তা আমি মোটেই জানতে পাই নি।"

রবীন্দ্রনাথ কুঠিবাড়ির মধ্যে চ'লে গেলেন। তৎক্ষণাৎ মিস্ত্রীবৌ ক্ষ্যাপা বাঘিনীর মত ছুটলো কাছারীতে জামাল বরকন্দাজের কাছে। জামাল বরকন্দাজ তখন কাছারীর মেসের পেছনে জামগাছ তলায় ব'সে তামাক খাচ্ছে আর তা'র সহকর্মীদের সঙ্গে গল্প করছে।

জামাল বরকন্দাজের কাঁধে ছিল গামছা। ঝড়ের বেগে মিস্ত্রীবৌ এসে তা'র গলার গামছা ধ'রে পেঁচিয়ে টান মেরে বললে—"তুমি আমায় জানাওনি কেন? বাবু মশায়ের হুকুম আমায় বলোনি কেন? বোকা কোথাকার!" জামাল সত্যিই বড় লজ্জিত ও ব্যাকুল হয়ে পড়লো।

জামাল যতই বলে "ওরে আমার ভুল হয়েছিল"—মিস্ত্রীবৌ ততই রেগে একেবারে ক্ষেপে ওঠে। জামালের গলায় গামছার প্যাঁচ ক'সে টেনে জামালের মত জোয়ান মর্দকে একেবারে কাবু ক'রে ফেলল। জামাল বলে—"আমার ভুল হয়েছিল, আমায় ছাড়্‌রে—ছাড়্‌।" মিস্ত্রীবৌএর রাগ পড়ে না—সে শুধু চীৎকার করে—"মুনিবের কাজে এত বড় ভুল? ফাঁকি দিয়ে মাইনে খাও?" মিস্ত্রীবৌ জামালের গলায় গামছা দিয়ে এমন নাস্তানাবুদ করলো যে, জাপানী-

বাঘিনীর হাত থেকে তাকে বাঁচায় কার সাধ্য? যারা সেখানে ছিল তা'রা তো হতভম্ব হয়ে গেল জাপানী মেয়ের শক্তি ও সাহস দেখে। মিস্ত্রীবৌ এম্‌নি ক'রে জামাল বরকন্দাজকে নাস্তানাবুদ ক'রে বকতে বকতে হন্‌-হন্‌ ক'রে তা'র বাসায় ফিরে গেল।

জামাল খুব লজ্জিত হয়েছিল। সে বলতো—"বাঘিনী বেটী আমায় খুব জব্দ করেছে।" সকলেই বলাবলি করতো,—'স্বাধীন জাপানের মেয়ে! ওর তেজ, ওর শক্তি, আমরা কী ক'রে পাবো!'

তুষ্টুলাল

শিলাইদহ বেড়পাড়ার জঙ্গলী প্রামাণিকের বেটা তুষ্ট প্রামাণিক শিলাইদহ অধিকারীবাবুদের বাড়িতে (বড়বাড়িতে) গরুর রাখালী করতো। তখন মাত্র দশ-এগারো বছরের চ্যাংড়া ছেলে তুষ্টু। ফুটফুটে চেহারা, লম্বা একহারা গড়ন,—ভারী চালাক আর পেটুক। কিসে খাওয়ার তরিজুৎ হবে, কিসে অল্প পরিশ্রমে কাজ হাসিল হবে,—সেই মতলবেই সে ঘুরতো।

অধিকারীবাবুদের গরুর রাখালী কাজটা তা'র আদৌ পছন্দ হলো না। দুধ, চিড়ে, মুড়ি, মাছ, পায়েসাদি খাওয়া-দাওয়ার বেশ জুৎ ছিল; কিন্তু রামবাবুর তামাক সাজা আর এক পাল দুষ্টু বেয়াদব গরু নিয়ে তুষ্টু বড়ই মুস্কিলে পড়লো। বারো-তেরোটা গরু আর তিন-চারটে নাল্‌কী বাছুর মাঠে চরছে, আর মনের আনন্দে তুষ্টু এক গাছে উঠে আম খাচ্ছে, বা কারো ক্ষেতের মটরের ফল বা শাক তুলছে, অথবা অন্য রাখালদের সঙ্গে ডাংগুলি খেলছে,—অম্‌নি দুই-তিনটী বেয়াড়া গরু চাষীদের ক্ষেতে লাগছে,—ধরতে গেলেই লেজ মাথায় ক'রে দৌড়, আর তাদের পেছনে ছুটতে ছুটতে চষা মাঠের ঢিলে হোঁচট খেয়ে খেয়ে হাতে-পায়ে জখম হওয়া;—তুষ্টুলালের গোচারণের লীলা ছিল এই প্রকার। বাড়িতে এলেই তুষ্টুর বিরুদ্ধে চাষীদের নালিশের পর নালিশ। তুষ্টু দেখলো, বাবুদের কাছে মার-ধোর খাওয়ার আগে মানে মানে চম্পট দেওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ।

বলা নেই কওয়া নেই, সত্যিই একদিন তুষ্টুর আর টিকি দেখা গেল না। তুষ্টু বাঁচলো; ঐ রকম ঠ্যাঁটা বেয়াদব গরুর পাল আর রামবাবুর হরদম্‌ তামাক সাজার আর গাল খাওয়ার ঝামেলা থেকে তা'র হাড় জুড়ালো। কিন্তু চাষার ছেলে, তা'র বাবার হাতে সে রেহাই পেলো না। তখন রবীন্দ্রনাথ সপরিবারে দীর্ঘকাল শিলাইদহ কুঠিবাড়িতে বাস করতেন। তুষ্টুর বাড়িও কাছারীপাড়া ও কুঠিবাড়ির কাছে। তা'র বাপ কুঠিবাড়ির সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অনেক খোসামোদ ক'রে কুঠিবাড়িতে তুষ্টুর মনের মত একটা চাকরী ঠিক ক'রে দিল।

তুষ্টু কুঠিবাড়িতে ছেলেবাবুদের চাকর হয়ে গেল। ভারী মজা, আহারের খুব জুৎ! তুষ্টু চা খায়, তখনকার দিনের আজগুবী খাদ্য সেই পাউরুটী বিস্‌কুট ইত্যাদি কত কী খায়। ফুর্তির আর সীমা নেই। কিন্তু বড় কষ্ট হ'ল তার, যখন-তখন বাড়ি যাবার ছুটী সে পায় না—গুল্‌লীড়ি খেলতে পায়

না; কুঠিবাড়ির কলমের আমগাছে উঠতে পায় না। উঃ! সে যেন জেলখানা। হঠাৎ একদিন এখান থেকেও তুষ্টু দিল চম্পট।

আর তুষ্টুর দেখা নেই,, নিজের বাড়িতেও সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। দুবেলা দুটো খায় মাত্র। জঙ্গলী তা'র এই বেয়াড়া ছেলের টিকিটিও দেখতে পায় না।

রবিবাবু, দেবী মৃণালিনী তুষ্টুকে খুব ভালবাসতেন। রবিবাবু বিশেষ ক'রে ওর দুষ্টুমী ও লম্ফঝম্ফ পছন্দ করতেন, বলতেন—"ও মিট্‌মিটে শয়তান।" একদিন রবিবাবু বড় বড় আমলাদের সঙ্গে সদর রাস্তা দিয়ে নদীর দিকে বেড়াতে যাচ্ছেন। ফেরার হয়ে তুষ্টু রাস্তার বাঁদিকের মাঠে তা'র দলবল নিয়ে হাডু-ডু খেলছে—"চোল্ মারি ডুগ্-ডুগ্-ডুগ্!" রবিবাবু দূরে থেকেই তা দেখছেন। তিনি এক বরকন্দাজকে জিজ্ঞেস করলেন—"ঐ না তুষ্টু,—সে নাকি পলায়ন করেছে?" সত্যি তাই,—তুষ্টু বাবুমশাইকে দেখেই দৌড়,—একেবারে ভোঁ—দৌড়। কোথায় যে পালালো—তার ঠিক নেই। বাবুমশাই হেসে অস্থির।

তার পরের দিন জঙ্গলী কুঠিবাড়িতে তুষ্টুকে ধরে এনে হাজির ক'রে বহাল ক'রে দিয়ে গেল। তখন কুঠিবাড়িতে তা'র নামডাক পড়ে গেল—"দুষ্টু তুষ্টু!" বাবুমশাই তুষ্টুকে সপ্তাহে তিনদিন রাত্রে বাড়ি যাবার ছুটীর হুকুম দিলেন।

কিছুদিন যায়। এবারে তুষ্টু ভাল হয়েছে। বড় হয়েছে,—বুদ্ধি হয়েছে তো! বেশ মনোযোগ দিয়ে কাজকর্ম করছে। আর সে চ্যাংড়া মানুষ নয়,—ভারিক্কি চালে বড় বড় চাকর দারোয়নদের মত কাজ করে যাচ্ছে।

কি কারণে যেন হঠাৎ মৃণালিনী দেবী কলকাতা যাবেন। তুষ্টু তাঁকে ধ'রে বসলো—'আমিও মায়ের সঙ্গে যাবো,—ওরা তো যেয়েই থাকে। এবারে আমি যাবো।' মহা মুস্কিল! ছেলেমানুষ, জানে না শোনে না—যাবে কলকাতা! দেবী মৃণালিনী, রবিবাবু নিজে অনেক বুঝালেন। তুষ্টু গোপনে গোপনে কাঁদে,—মনমরা হয়ে ব'সে থাকে। তুষ্টুর বড্ডই মন খারাপ—কলকাতার যাদুঘর, চিড়িয়াখানা, হাইকোর্ট, থিয়েটার, ট্রামগাড়ির গল্প শুনেছে সে। এত সব দেখার ভাগ্য তা'র হবে না! সে কি বোকা? শেষকালে "আমি কহিলাম আরে রাম রাম, নিবারণ সাথে যাবে" রকমখানা ক'রে বাবুমশাই তুষ্টুকেই সঙ্গে দিয়ে দিলেন। বললেন—"ও মিট্‌মিটে শয়তান,—ও সব পারবে, কোন ভয় নেই।" এইবার তুষ্টুর প্রথম কলকাতা দর্শন হ'ল!

তুষ্টু ফিরে এসে গল্পের বাহার খুলে দিল,—জোড়াসাঁকো বাড়ির কাণ্ড-

কারখানা,—কলকাতা সহরের আজগুবী ব্যাপার,—খানাপিনার বহর,—গল্পে একেবারে আসর মাৎ ক'রে দিল। শুধু তাই নয়, ছোট-মা ব'লে দিয়েছেন,—"কলকাতা আসতে হলে তুষ্টুই যেন সঙ্গে আসে,—সে খুব চালাক চতুর,—অন্য চাকর-বাকরের মত ভ্যাবা গঙ্গারাম নয়।" আর তুষ্টুকে পায় কে? এমন সেরা সার্টিফিকেট পেয়েছে সে!

মৃণালিনী দেবী আবার শিলাইদহে এলেন। তুষ্টুর প্রবল বাসনা সে প্রমোশন নেবে,—খানসামাগিরি থেকে বরকন্দাজগিরিতে। সে এই মতলব ক'রেই মস্ত চোখতোলা তেলকুচকুচে লাঠি বানিয়েছে,—সুন্দর লাঠি। এখন খাকী কোট, পট্টি, চাপরাস, পাগড়ী ইত্যাদি পেলেই ব্যস্!

মৃণালিনী দেবী বললেন—"তুই বড্ড ছেলেমানুষ, আর একটু বড় হ'। দেবো তোকে বরকন্দাজ ক'রে। ভাবনা কি?"

তুষ্টু ছিল ঢ্যাঙ্গালম্বা—ছেলেমানুষ হ'লে কি হয়। আর তখনকার ঠাকুর বাবুদের একজন শ্রেষ্ঠ লেঠেল্ বরকন্দাজ হয়ধর ছিল অত্যন্ত বেঁটে, মেছেরও তাই। তুষ্টু অমনি জবাব দিল—"হয়ধর, মেছের—এদের চেয়েও আমি লম্বা, তবেই তো বড় হয়েছি।"

মৃণালিনী দেবী খুব হাসলেন। তুষ্টু খুব গম্ভীর চালে বললো—"ওদের চেয়েও আমি ভাল কাজ পারবো। ওরা এ্যাত এ্যাত খাবে আর লাঠি খেলাবে,—ফাইফরমাজ খাটতে আমার সঙ্গে পারতে হচ্চে না।"

সত্যিই তাই। তুষ্টুর চালাকি ফন্দিফিকিরের সঙ্গে সঙ্গে আর একটী গুণ ছিল, সে খুব হুঁসিয়ার আর বিশ্বাসী। যাই হোক, তুষ্টুর কান্নাকাটিতে অতিষ্ঠ হয়ে, ছেলেমানুষ হ'লেও মাঠাকরুণ তাকে দিলেন বরকন্দাজ ক'রে। তা'র বড় কাজ হ'ল, দরকারের সময় আমলাবাবুদের সঙ্গে কলকাতা যাওয়া, তাঁদের সঙ্গে চালানের টাকা জোড়াসাঁকো বাড়িতে পৌঁছানো জিনিসপত্র কেনাকাটা—ইত্যাদি।

কলকাতা শহরে কোথায় কোন্ জিনিস কিনতে পাওয়া যায়,—কোথায় কোন ব্যাংক,—কোথায় বাবুদের আত্মীয়-স্বজনের বাড়ি, ঘি, ময়দা, মাছ, শাক-সবজী, আম ইত্যাদি শিলাইদহ থেকে কি ক'রে কলকাতা নিয়ে আসতে হয়, কেমন ক'রে খরচের টাকার হিসাব রাখতে হয়—এসব তুষ্টুলালের নখদর্পণে।

যেবারে মৃণালিনী দেবী শেষবার শিলাইদহ ছেড়ে যান, সেবার তুষ্টু কেঁদেছিল খুব—সঙ্গেও গিয়েছিল কলকাতা অবধি।

লেখাপড়া না জানলেও তুষ্টুর গাঁঠে গাঁঠে বুদ্ধি। জমিজমাও সে কিছু

করলো, ভাল গেরস্থও হলো। কিছুকাল পরে শিলাইদহ সদর কাছারীর জমাদারগিরি (হেড্ বরকন্দাজ) করেছিল। কয়েকটা মেয়ে রেখে তা'র বৌটিও মারা গেছে।

ফরসা, লম্বা, মাথায় মস্ত টাক্—তুষ্টুলাল আজও বেঁচে আছে—আজও সে গল্পে আসর মাৎ করে। সেকালের লোক সে,—দীর্ঘজীবী হোক্।

পদ্মা প্রবাহ চুম্বিত শিলাইদহ

কল্যাণ রায়

(কিংবদন্তী)

অনেকদিনের প্রাচীন কাহিনী—যখন বাংলার শেষ স্বাধীন হিন্দুবীর রাজা সীতারাম রায় বাংলাদেশে স্বাধীন রাজ্য গড়েছিলেন, যখন বাংলামায়ের দুই যমজ ছেলে হিন্দু মুসলমান তাদের স্বাধীন রাজ্যে পরমসুখে বাস ক'রত; মোগল শাসনের ভাঙনের মুখে বাংলার সেই অতীত গৌরবময় অধ্যায়ের একটী লুপ্তপ্রায় কাহিনী।

রাজা ও রাজ্য-ভাঙাগড়ার যুগের এই রকম অনেক কাহিনী ইতিহাসের পাতায় স্থান পায়নি। কারণ বাংলার প্রাচীন সংস্কৃতিকে ইতিহাসের মন্দিরে সংগ্রহ করে রাখবার রেওয়াজ সেকালে ছিল না। তাই সেকালের অনেক অজ্ঞাত ইতিহাস মহাকাল বেমালুম উদরস্থ ক'রে নিয়েছেন। তবু যে সকল ঘটনার টুক্‌রো ভাঙা মন্দিরের তলায় বা প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষের মধ্যে গভীর জঙ্গলে লুকিয়ে ছিল, সেগুলো আমাদের পূর্বপুরুষেরা মুখে মুখে গল্পের মত তাঁদের নাতি পরিনাতিদের হাতে তুলে দিয়ে গেছেন। তার কতখানি সত্য, কতখানি বানানো, তা বলা মুস্কিল। তবু তার প্রমাণগুলো এখনো বাংলার বুক থেকে একেবারে মুছে যায়নি। আমরা সেই মৌন-মূক বাণীহীন অতীতকে ডেকে ঘুম ভাঙাচ্ছি—

"কথা কও, কথা কও,
স্তব্ধ অতীত, হে গোপনচারী
অচেতন তুমি নও
কথা কেন নাহি কও?
হে অতীত, তুমি গোপন হৃদয়ে
কথা কও, কথা কও।"

সেই রাজা সীতারাম রায়ের আমলে নদীয়া জেলার উত্তর সীমানায় কীর্তিনাশা পদ্মার তীরবর্তী একখানা গ্রাম, নাম কল্যাণপুর। তার পাশাপাশি শিলাইদহ। তখন শিলাইদহ নামে কোন গ্রাম ছিল না, ছিল খোরসেদপুর গ্রাম। খোরসেদ ফকির বলে একজন সুবিখ্যাত মুসলমান ফকিরের নামে এ গ্রামের নাম-করণ হয়েছিল। কীর্তিনাশা পদ্মার কোন এক ছোট প্রত্যঙ্গের অর্থাৎ "দহ"র নাম পরবর্তীকালে হয়েছিল "শিলাইদহ", কারণ এই "দহ" বা

নদীর খাদের উপরেই ছিল নীলকর সাহেবদের পুরানো কুঠি, যার বর্ণনা নিজে রবীন্দ্রনাথ করেছেন তাঁর "ছেলেবেলা" নামে বই-এ। ঐ নীলকুঠীর মালিক বা কর্মচারীর নাম ছিল শেলীসাহেব। তাঁর নাম থেকেই শিলাইদহ বা 'শেলিদহ' নামের উৎপত্তি।

রবীন্দ্রনাথ যে দুটী সাহেবের গোর দেখেছিলেন, সে দুটীও দু'তিন বছর হ'ল কীর্তিনাশা পদ্মা হজম ক'রে ফেলেছে।

বাংলাদেশের কোন্ প্রান্তে অখ্যাত-অজ্ঞাত বিশাল পদ্মাতীরবর্তী এই শিলাইদহ গ্রামের প্রাকৃতিক পরিবেশ কবির অনন্যসাধারণ বিশাল সাহিত্য-সৃষ্টির কি অসীম প্রেরণা জুগিয়েছিল তা তাঁর 'ছিন্নপত্রে'র প্রায় প্রতি পৃষ্ঠায় অপরূপভাবে ফুটে উঠেছে। প্রকৃতির এই নির্জন শান্ত পটভূমিকায় কবির মনোরাজ্যের দুয়ার খুলে গিয়েছিল। তাই শিলাইদহের অপরূপ বর্ণনায় তাঁর কবিমানসের যে অপূর্ব পরিচয় পাওয়া যায় তার মূল্য অপরিসীম। ১৮৮৮ সালে এই শিলাইদহ থেকে লিখ্ছেন—

"শিলাইদহের অপর পারে একটা চরের সাম্‌নে আমাদের বোট্ লাগানো আছে। প্রকাণ্ড চর, ধু-ধু করছে। কোথায়ও শেষ দেখা যায় না—কেবল মাঝে মাঝে এক এক জায়গায় নদীর রেখা দেখা যায়—আবার অনেক সময় বালিকে নদী বলে ভ্রম হয়। গ্রাম নেই. লোক নেই, তরু নেই. তৃণ নেই,—বৈচিত্র্যের মধ্যে জায়গায় জায়গায় ফাটল ধরা ভিজে কালো মাটি, জায়গায় জায়গায় শুক্‌নো সাদা বালি। পূর্বদিকে মুখ ফিরিয়ে চেয়ে দেখ্‌লে দেখা যায় উপরে অনন্ত নীলিমা আর নীচে অনন্ত পাণ্ডুরতা। আকাশ শূন্য এবং ধরণীও শূন্য, দরিদ্র শুষ্ক কঠিন শূন্যতা, আর উপরে অশরীরী উদার শূন্যতা।"

আবার তাঁর জমিদারী পতিসরে বসেও সেই তাঁর চিরপরিচিত শিলাইদহ-ই তাঁর সমস্ত হৃদয়খানা জুড়ে বসে থাকতো; তাই লিখ্ছেন ১৮৯৪ সালে:—

"মনে আছে যখন শিলাইদহে কাছারি করে সন্ধ্যাবেলায় নৌকো করে নদী পার হতুম এবং রোজ আকাশে সন্ধ্যাতারা দেখ্‌তে পেতুম. আমার ভারি একটা সান্ত্বনা বোধ হত। ঠিক মনে হত. আমার নদীটি যেন আমার ঘর-সংসার এবং আমার সন্ধ্যাতারাটি আমার এই ঘরের গৃহলক্ষ্মী,—আমি কখন কাছারি থেকে ফিরে আসব সেইজন্য সে উজ্জ্বল হয়ে সেজে বসে আছে। তার কাছ থেকে এমন একটি স্নেহস্পর্শ পেতুম। তখন নদীটি নিস্তব্ধ হয়ে থাকতো, বাতাসটি ঠাণ্ডা, কোথাও কিছু শব্দ নেই, ভারি যেন একটা ঘনিষ্ঠতার ভাবে

আমার সেই প্রশস্ত সংসারটি পরিপূর্ণ হয়ে থাক্‌তো। আমার সেই শিলাইদহে প্রতি সন্ধ্যায় নিস্তব্ধ অন্ধকারে নদী পার হওয়াটা খুব স্পষ্টভাবে প্রায়ই মনে পড়ে।"

আবার আর এক চিঠিতে লিখ্‌ছেন—

"আমি প্রায় রোজই মনে করি, এই তারাময় আকাশের নিচে আবার কি কখনো জন্মগ্রহণ করব! আর কি কখনো এমন প্রশান্ত সন্ধ্যাবেলায় এই নিস্তব্ধ গোরাই নদীর উপর বাংলাদেশের এই সুন্দর একটি কোণে এমন নিশ্চিন্ত মুগ্ধ মনে জালিবোটের উপর বিছানা পেতে পড়ে থাক্‌তে পাবো?"

রবীন্দ্রনাথের অপূর্ব পত্রসাহিত্যের প্রতি পৃষ্ঠা তাঁর "চিরপরিচিত শিলাইদহের" এই গোপন অভিসারের ও মানসলীলার ছবিতে ভরপুর।

আমার বাবা বল্‌তেন—আমাদের শিলাইদহে দুই 'ঠাকুর' আছেন। একজন গ্রামের উত্তরে পদ্মার তীরে রবি ঠাকুর। আর একজন দক্ষিণে গোপীনাথ ঠাকুর। তাই আমাদের গোপীনাথ ঠাকুরের কাহিনীটাই বল্‌ছি।

পদ্মাতীরের কল্যাণপুর গ্রামে কলাণ রায় ছিলেন জমিদার অথবা খুব একজন প্রাতঃস্মরণীয় ব্যক্তি; যাঁর পুণ্যনামে ঐ গ্রামের নামকরণ হয়েছিল। কল্যানপুর গ্রাম এই লেখকের পৈত্রিক সম্পত্তি (তালুক) ছিল। সে সব ইতিহাস পুরাণো কাগজপত্র বেঁধে রেখে আমরা আসল কাহিনী শুরু করি।

কল্যাণ রায় জাতিতে ছিলেন তন্তুবায়। এজন্য তিনি তাঁতী কল্যাণ রায় নামে আজো ঐ অঞ্চলে সুবিখ্যাত হয়ে রয়েছেন। তাঁর ছিল অগাধ টাকা, প্রকাণ্ড পাকাবাড়ী, পদ্মারই তীরের উপর। তাঁর সে অট্টালিকা আজ পদ্মা তার নিজের অঙ্গে মিশিয়ে নিয়েছেন। তার ভগ্নাবশেষ এখনো কিছু কিছু দেখা যায় মাটির নিচে।

কল্যাণ রায় ছিলেন পরম ভক্তিমান বৈষ্ণব। দেব দ্বিজে তাঁর অচলা ভক্তি। তিনি সস্ত্রীক পরম নিষ্ঠার সঙ্গে আজীবন "তৃণাদপি সুনীচেন" বৈষ্ণবের মত ধর্মাচরণ করেছেন।

এত ধন সম্পত্তি থেকেও তাঁদের কোল জুড়ে গোপালের আবির্ভাব হ'ল না। কিন্তু তাঁদের প্রাণের সুগভীর বাৎসল্যের নবনী গ্রহণ করবার জন্য নারায়ণের আসন টলেছিল।

নিঃসন্তান কল্যাণ রায় সংসারে বীতরাগ হয়ে সস্ত্রীক বেরুলেন তীর্থ ভ্রমণে। পদ্মায় তাঁদের বজরা ভাসলো। নদী পথে তাঁরা সস্ত্রীক চলে এলেন কাশীধামে।

কাশীতে এসে তাঁরা একজন ভাস্করের বাড়িতে অতিথি হলেন। ঐ ভাস্কর অনেক দেবদেবীর মূর্তি গড়িয়ে খ্যাতিলাভ করেছিলেন। একদিন তাঁর বাড়িতেই কল্যাণরায় গভীর রাত্রে স্বপ্ন দেখ্‌লেন। সুন্দর এক কৃষ্ণ মূর্তি, হাতে মুরলী, মাথায় চুড়া, পায়ে নূপুর, গলায় বনমালা, বৃন্দাবনের গোপাল যেন তাঁর কাছে বাঁশী বাজাচ্ছেন। আর ঘুমোতে পারলেন না, রোমাঞ্চিত দেহে স্ত্রীকে জাগিয়ে স্বপ্ন বৃত্তান্ত বল্‌লেন। তাঁর স্ত্রী বল্‌লেন, তিনিও ঠিক ঐ রকম স্বপ্ন দেখেছেন।

প্রভাত হবামাত্র তাঁরা ভাস্করকে তাঁদের স্বপ্নে-দেখা গোপালের রূপ বর্ণনা করে বললেন ঐ রকম "গোপবেশ বেণুকর" কৃষ্ণের ও রাধার মূর্তি গড়িয়ে দিতে হবে। ভাস্কর রাজী হলেন। তাঁরা মূর্তি তৈরীর জন্য ভাস্করকে আগাম টাকা দিয়ে পরের দিন শ্রীক্ষেত্রে অর্থাৎ পুরীধামে জগন্নাথের শ্রীমুখ দর্শনের জন্য যাত্রা করলেন।

ভাস্কর কল্যাণরায়ের বর্ণনার অনুরূপ অতি সুন্দর রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি গড়ে ফেললেন। সস্ত্রীক কল্যাণ রায় তখন শ্রীক্ষেত্রে। এমন সময় কাশীর কোন রাজার হঠাৎ রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহ মূর্তি প্রতিষ্ঠার দরকার হয়ে পড়লো। তাঁর সময় আদৌ নাই। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠার দিনক্ষণ এতই আকস্মিক ভাবে আসন্ন হয়ে পড়েছে যে ঐ সামান্য সময়ের মধ্যে কোনও ভাস্করের পক্ষেই ঐ রকম দুইটী বিগ্রহ মূর্তি তৈরী করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়লো। রাজা ভাস্করকে প্রথমে অনুরোধ করলেন, পরে ভয় দেখালেন। ভাস্কর ভয়ে ভাবনায় একেবারে বিহ্বল হয়ে পড়লেন। শেষে ভেবে চিন্তে নিতান্ত নিরুপায় হয়ে কল্যানরায়ের জন্য তিনি যে যুগল মূর্তি বহু পরিশ্রমে গড়েছিলেন তাই রাজাকে দিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। ঐ বিগ্রহ রাজা তাঁর মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করলেন।

এদিকে নির্দিষ্ট দিনে কল্যাণ রায় শ্রীক্ষেত্র থেকে কাশীতে সস্ত্রীক ভাস্করের বাড়িতে উপস্থিত হলেন। ভাস্কর আগে থেকেই বুঝতে পেরে একদিন একরাত্রি পরিশ্রম করে তাঁদের জন্য এক যুগল মূর্তি তৈরী করে রাখ্‌লেন। তাড়াতাড়িতে এ মূর্তি দুটী আগেকার আসল মূর্তির চেয়ে কিছু আকারে ছোট হ'ল। কল্যাণ রায় দম্পতি কিছুই টের পেলেন না। মূর্তি ছোট দেখে একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেও ঐ যুগল মূর্তি নিয়েই তাঁরা আবার নৌকা পথে গ্রামে ফির্‌লেন।

কল্যাণপুরে ফিরে তাঁরা এই রাধানাথ ও শ্রীরাধামূর্তি প্রতিষ্ঠা করে মহানন্দে বিগ্রহের পূজার্চনা করতে লাগ্‌লেন, ঠিক শ্রীক্ষেত্রের জগন্নাথদেবের

পূজা পার্বনের বিধি অনুসারে রাস, দোল, রথযাত্রা স্নানযাত্রা সমস্ত পার্বনোৎসবই করতে লাগলেন।

এদিকে কাশীতে ভয়ংকর ব্যাপার ঘটে গেল। কাশীর রাজা ঐ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবার পরেই একরাত্রে স্বপ্ন দেখ্লেন। স্বপ্নে যেন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে তিরস্কার করছেন, "তুই আমার পরমভক্ত কল্যাণ রায় দম্পতিকে প্রতারণা ক'রে আমাকে তোর মন্দিরে এনেছিস্। সেই তো তার মনোমত ক'রে আমায় গড়েছিল। ভাল চাস্ তো ভক্ত দম্পতির কাছে শীগ্গীর আমায় রেখে আয়।"

কাশীর রাজা রাত্রি প্রভাতেই তাঁর মন্দিরের যুগল মূর্তি নৌকাতে ক'রে জলপথে কল্যাণ রায়ের কল্যাণপুরে রেখে এলেন, আর অপরাধ স্বীকার করে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। কল্যানরায় দেখ্লেন, এই যুগল মূর্তিই যেন তাঁদের মনোমন্দিরের সেই রাধাকৃষ্ণ। এই যুগল বিগ্রহের নাম রাখলেন গোপীনাথ গোপীরাণী আর তাঁদের পূর্ব প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ যুগলের নাম রাখ্লেন রাধানাথ রাধারাণী। পূজাপদ্ধতি ঠিক আগের মতই রইলো। দুইটী যুগল মূর্তি তাঁদের দুইটী মন্দির আলো ক'রে দাঁড়ালো। তাঁরা বিগ্রহের পূজা অর্চনায় সমস্ত মন ঢেলে দিলেন। তাঁদের সারা জীবনের অতৃপ্ত সন্তান বাৎসল্য এই দুই যুগল মূর্তিকে আশ্রয় ক'বে পরিতৃপ্ত হ'ল।

বছর কয়েক পরেই হঠাৎ কীর্তিনাশা প্রলয়ংকরী পদ্মা তাঁদের বিগ্রহ-মন্দির অট্টালিকা সব গ্রাস করতে ধেয়ে এলো। গ্রামকে গ্রাম রাক্ষসী পদ্মা হাঁ ক'রে গিলে ফেললো। কল্যাণ রায়-দম্পতি তাঁদের অট্টালিকা. ধন দৌলত রত্নালংকার সব ছেড়ে পাগলের মত দুই যুগল বিগ্রহ কোলে ক'রে ছুট্লেন আশ্রয়ের জন্য। কোথায় আশ্রয়! কে তাঁদের ভক্তবৎসলকে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করবে।

ছুট্তে ছুট্তে ঘর্মাক্তদেহে বাহ্যজ্ঞান হারিয়ে তাঁরা এসে উপস্থিত হলেন পার্শ্ববর্তী খোরসেদপুুর গ্রামে এক প্রকাণ্ড বটগাছের তলায়। চারিদিকে রৌদ্র খাঁ খাঁ করছে। তাঁরা শ্রান্ত ক্লান্তদেহে ঐ বটগাছের ছায়ায় কল্যাণরায়ের বহির্বাসের উপর দুই যুগল বিগ্রহ রাখ্লেন। কল্যাণরায়ের গৃহিণী যেন দেখ্তে পেলেন ঐ ভীষণ রৌদ্রে তাঁদের দুই যুগল বিগ্রহের গা দিয়ে ঘাম ঝরছে মুক্তার মত টপ্ টপ্ ক'রে। তাই তিনি নিজের শাড়ীর আঁচলে তাঁদের মুখ মুছিয়ে আঁচল দিয়ে হাওয়া করতে লাগ্লেন। আঁচলের হাওয়ায় বুঝি ভক্ত দম্পতি ও তাঁদের ভক্ত বৎসল জুড়িয়ে শান্ত হলেন।

ঐ জায়গায় খড়ের ঘর তুলে তাঁরা বিগ্রহের পূজার্চনা করতে লাগলেন।

ঠিক এমনি সময়ে জমিদারী পরিদর্শন করবার জন্য রাজা সীতারাম রায় ঐ গ্রামের ঐখানে এসে উপস্থিত হলেন।

রাজা সীতারাম কল্যাণ রায়ের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ দেখে মুগ্ধ হলেন। আরও বেশী অবাক হলেন বিগ্রহের কাহিনী শুনে আর ঐ বৈষ্ণব দম্পতির ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে। তিনি ঐ বট গাছের কাছেই প্রকাণ্ড এক দীঘি খনন ক'রে দিলেন আর দেব পূজার জন্য দুইটী মঠ, রন্ধনশালা, অতিথিশালা, পুরোহিত ও সেবক-নিবাস তৈরী ক'রে দিলেন বহু টাকা খরচ করে। ঐ দীঘি এখনও আছে; ঐ সুন্দর ও প্রকাণ্ড দীঘিটী "গোপীনাথ-দীঘি" নামে আজও সুবিখ্যাত। সুধু তাই নয়। রাজা সীতারাম গোপীনাথ দেবের সেবা পূজা নির্বাহের জন্য বাৎসরিক এক হাজার টাকার আয়ের দেবোত্তর সম্পত্তি উৎসর্গ ক'রে দিলেন আর তৈরী করে দিলেন কাঠের সুন্দর প্রকাণ্ড রথ। ঐ কারুকার্য-খচিত সুন্দর রথখানা আর নাই, তবে রথের কয়েকটা সুন্দর কাঠের মূর্তি এখনো সেকালের প্রাচীন হিন্দু শিল্পের নিদর্শনরূপে দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

কালে কল্যাণ রায়-দম্পতি বৃদ্ধ হ'য়ে পড়লেন। এই সময়ে গোপীনাথ-দেবের সম্পত্তি এবং এই পরগণা (-পরগণা বিরাহিমপুর ও মহম্মসাহীর কিছু অংশ) নাটোরের প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী রাণী ভবানীর রাজ্যভুক্ত হয়ে গেল। রাণী ভবানী একদিন স্বপ্নে গোপীনাথ ও রাধানাথের দর্শন পেয়ে আদেশ পেয়েছিলেন "আমরা একই বিগ্রহ, কিন্তু এখানে দুইটী যুগল মূর্তিতে দুইটি মঠে আছি। আমরা আর পৃথকভাবে দুই মন্দিরে থাক্‌তে চাই না। তুমি আমাদের নিয়ে একটী মন্দিরে প্রতিষ্ঠা কর।"

রাণী ভবানী তাই নূতন শ্রীমন্দির তৈরী করলেন অতি সুন্দর কারুকার্যে শোভিত করে। দুই যুগল মূর্তি গোপীনাথ ও রাধানাথ সেই থেকে একত্রে তাঁর তৈরী নূতন শ্রীমন্দিরে থাক্‌তে লাগলেন। রাজা সীতারামের তৈরী দুটী মঠ সেই থেকে পরিত্যক্ত হ'ল। ঐ দুটী মঠ এখনও হাড়-পাঁজর নিয়ে বিদীর্ণ বক্ষে নীরবে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে যেন বল্‌ছে—

—"তব মন্দির স্থির গম্ভীর, ভাঙা দেউলের দেবতা।"

রাণী ভবানীর তৈরী নূতন শ্রীমন্দির কোন্‌ সালে কোন্‌ তারিখে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা এখনো ঐ মন্দিরের গায়ে খোদিত আছে। এর কিছুকাল পরে বৃদ্ধ কল্যাণ রায়-দম্পতি তাঁদের প্রাণের ঠাকুরের পদে লীন হয়ে গেলেন। তখন রাণী ভবানীর পুত্র রাজা রামজীবন সেবাইতরূপে গোপীনাথের সেবা পূজা উৎসবাদি চালাতে লাগলেন।

ক্রমে রাজা রামজীবনের জমিদারী নিলামে উঠ্‌লে বিরাহিমপুর পরগণা

আর গোপীনাথদেবের দেবোত্তর সম্পত্তি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর খরিদ ক'রে সেবাইত সূত্রে কল্যাণ রায়ের প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহদ্বয়ের পূজার্চনা চালাতে থাকেন। গোপীনাথের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে বহু কিম্বদন্তী ঐ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। রবীন্দ্রনাথের সময়েই এই প্রসিদ্ধ দেবমন্দির ও ভবনের সংস্কার করা হয়েছিল।

নদীয়া, ফরিদপুর, যশোর আর পাবনা জেলার অনেক অংশে আজও খোরসেদপুরের গোপীনাথ প্রসিদ্ধ হয়ে রয়েছেন। আজও গোপীনাথের স্নানযাত্রার উৎসবে ঐ সব জেলার হাজার হাজার নর-নারী প্রতি বৎসর সমবেত হয়ে থাকেন। কিন্তু যিনি নিজের সর্বস্ব দিয়ে, সমস্ত জীবনের সাধনা দিয়ে প্রায় চারশো বছর পূর্বে এই শান্ত সুন্দর দেবমন্দির গড়ে গেছেন, সেই অতীত বাংলার সরল সহজ ভক্ত বৈষ্ণব কল্যাণ রায়ের কাহিনী কোন্ যুগান্তরের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।*

*পাবনা শহরে শালগাড়িয়া গ্রামে তাঁতী কল্যাণ রায়ের বংশধর এখনো কেউ আছেন বলে স্থানীয় লোকেরা অনুমান করেন। সেখানে তাঁতী কল্যাণ রায়ের সামান্য একটু দেবোত্তর সম্পত্তি অবশিষ্ট আছে শোনা যায়। এই সম্পত্তিটুকু বর্তমানে শালগাড়িয়ার জমিদার শ্রীতারকনাথ প্রামানিকের তত্ত্বাবধানে।

যুগল সা
(কিংবদন্তী)

যুগল সা বিখ্যাত ধনী সওদাগর ছিলেন অনেক দিন আগে। কতদিন আগে, তা কেউ বল্‌তে পারে না। ইনি পল্লীর বুকে যে কীর্তি রেখে গেছেন, তা এখনও বিলুপ্ত হয়নি। এঁর যে কাহিনী প্রচলিত আছে তার ঐতিহাসিক ভিত্তি অতি সামান্যই; শুধু প্রবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত রূপকথার গল্পের মত।

সেকালের সওদাগরদের মত তিনি ছিলেন বহু ধনরত্ন দাস দাসীর মালিক। সপ্তডিঙা মধুকরের মত অনেক ছিল তাঁর বাণিজ্যতরী। সে সব বাণিজ্য তরণী সারা বাংলার নদ নদী খাল বেয়ে নানা নগরে শহরে বন্দরে ঘুরে ভারে ভারে ধনরত্ন আহরণ ক'রে আন্‌তো। আমাদের পুরাণের চাঁদ সদাগর, ধনপতি সদাগর, সায়বেনের মতই তিনি ছিলেন "বণিকজাতি" বা বেনে।

যুগল সা ছিলেন নিষ্ঠাবান কালী সাধক। মা কালীর পুজো ক'রে তাঁর আশীর্বাদ না নিয়ে কখনো বাণিজ্যে বেরোতেন না বা কোন বড় কাজে হাত দিতেন না। সংসারের তাঁর একমাত্র মায়াবন্ধন ছিলেন তাঁর মা। তিনি ছিলেন পরম মাতৃভক্ত ছেলে। মায়ের আদেশ তিনি মা কালীর আদেশের মতই পালন করতেন। তাঁর শিলাময়ী মা থাক্‌তেন মন্দিরে; আর রক্ত মাংসের শরীর নিয়ে মা থাক্‌তেন তাঁর প্রাসাদে সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী হয়ে। সেই মায়ের আদেশ ভাল হোক আর মন্দ হোক, তিনি সব সময়ে নির্বিচারে পালন করতেন। পরম মাতৃভক্ত সন্তান বলে সকলে তাঁকে খুব শ্রদ্ধাভক্তি করতো।

সেকালের পদ্মার তীরে তাঁর প্রকাণ্ড রাজবাড়ির মত অট্টালিকা, কালী-মন্দির, অতিথিশালা, নহবৎখানা ইত্যাদি নীল আকাশে মাথা উঁচু করে থাক্‌তো। গ্রামটীর নাম ছিল কোট্‌পাড়া। সে গ্রামটীর চিহ্ন মাত্রও নাই। কীর্তিনাশা রাক্ষসী পদ্মা তাঁর সমস্ত কীর্তি সমেত গ্রামখানাকে তাঁর লক্‌লকে জিভ দিয়ে একেবারে পেটের মধ্যে পুরে নিয়েছেন। মাঝে মাঝে ঐখানে প্রকাণ্ড চর প'ড়ে সেই নিশ্চিহ্ন সুদূর অতীতের সৌধকিরীটিনী গ্রামের স্মৃতিটী জাগিয়ে দেয়। সে কালের অনেক বৃদ্ধ ঐ চরে ঝড়ো বাতাসের মধ্যে যুগলসার প্রেতমূর্তিকে অনেক সময়ে পায়চারী করতে দেখেছেন বলে গল্প করতেন।

মায়ের নিষেধ ছিল ব'লে যুগল সা বিবাহ করেন নাই। ব্যবসা বাণিজ্যে যা উপার্জন করতেন সবই মা কালীর পূজায় আর মায়ের ব্রত-পার্বন দান ধ্যানে ব্যয় করতেন। তবু তাঁর ধনরত্ন বেড়েই চল্‌তো দিনের পর দিন, যেন তিনি মায়ের বরে অক্ষয় ধনাগারের অধিকারী ছিলেন।

তখন যুগল সার মা বুড়ী হয়েছেন। তিনি একদিন ছেলেকে বল্‌লেন "বাবা, শুন্‌তে পাই ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য তোর অগুন্‌তি নাও আছে। তোর কত নাও আছে বল্‌।"

যুগল বল্‌লেন, মা, আমার যে কত নাও (নৌকা) আছে তার হিসেব নাই। আমার অগুন্‌তি নাও।"

যুগলের মা কপালে চোখ তুলে বল্‌লেন, "বটে! আচ্ছা একবার আমায় দেখা তো তোর কত নাও আছে।"

মাতৃভক্ত যুগল "আচ্ছা মা, তোমাকে দেখাবো" বলে হুকুম দিলেন, তাঁর প্রত্যেক নৌকার একজন ক'রে মাল্লা এসে তাঁর মাকে একটী করে টাকা প্রণামী আর একখানি করে নৌকার বৈঠা সিংদরজার সাম্‌নে রেখে দেবে। হুকুম পেয়ে মাঝি মাল্লারা এক এক নৌকা থেকে এসে হাজির হ'ল।

যুগলের মা বৈঠকখানায় এসে খাটে বস্‌লেন আর প্রত্যেক নৌকার একজন ক'রে মাল্লা এসে তাঁকে প্রণাম করে একটী ক'রে টাকা তাঁর খাটের সাম্‌নে আর একখানা করে বৈঠা সিংদরজার সাম্‌নে রেখে চলে গেল। সেদিন ভোর থেকে রাত প্রায় একটা পর্যন্ত এই রকম প্রণামী-পর্ব চল্‌তে থাক্‌লো। যুগলের মা চারি পাশে ছোট পাহাড়ের মত টাকার স্তূপে আড়াল হয়ে রইলেন আর সিংদরজার সাম্‌নে বৈঠার একটা পাহাড় গজিয়ে উঠ্‌লো। যুগল মাকে হাত ধরে বাড়ির ছাদের উপর এনে বল্‌লেন "দেখ্‌লেতো মা। ঐ দেখ বৈঠার পাহাড়, আমার এত বড় বাড়ির চিলে-কোঠা ছাড়িয়ে উঠেছে।"

যুগলের মা এতই আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন যে তিনি বেশি কথা বল্‌তে পারলেন না, শুধু বল্‌লেন—"এ্যাতো?"

যেম্‌নি ঐ কথাটুকু বলা, অম্‌নি পদ্মার বুকে বিরাট গর্জন শোনা গেল। কেমন যেন ভোজ-বাজীর মত এক মুহূর্তে পদ্মার জল সমুদ্রের মত ফুলে উঠে যুগল সার অভ্রভেদী প্রাসাদ খানা গ্রাস কর্তে ছুটে এলো। একসঙ্গে শত বজ্রগর্জনের মত পদ্মার পাহাড়ের মত তরংগ আর কালো আকাশে মেঘ গর্জে উঠ্‌লো, বিদ্যুৎ চম্‌কিয়ে কালো আকাশের বুক চৌচির করে দিল। বাড়ির সিংদরজায় বজ্রপাত হ'ল, আর সঙ্গে সঙ্গে কালী মন্দিরে যুগলের রাজ-সংসারের অধিষ্ঠাত্রী মা কালী বিকট রবে অট্টহাস্য করে উঠ্‌লেন। নিমেষের মধ্যে যেন

মহাপ্রলয় এসে যুগলসার অভ্রভেদী প্রাসাদ গ্রাস করে ফেল্‌লো। যুগল মাকে কাঁধে ক'রে নিয়ে ঐ প্রলয় অন্ধকারে প্রাসাদ ছেড়ে গ্রামের দিকে ছুট্‌লেন। অম্‌নি পদ্মা ভীষণা রাক্ষসীর মত ধেয়ে এসে যুগলসার প্রকাণ্ড প্রাসাদ উদরস্থ ক'রে ফেল্‌লে, কোন চিহ্ন মাত্র রাখ্‌লে না।

খানিক পরে আবার শান্ত পদ্মা বুকে জ্যোৎস্নার ঝিকিমিকি নিয়ে কলগান গেয়ে বইতে লাগ্‌লো। যেখানে যুগল সার পাহাড়ের মত অট্টালিকা সগর্বে দাঁড়িয়ে ছিলো সেখানে শুধু জল আর জল—অথৈ জল।

তারপরে যুগল সা কাঁদতে কাঁদতে সর্বস্ব হারিয়ে চলে এলেন (শিলাইদহ) কশবা গাঁয়ে। এসে এক আত্মীয়ের বাড়িতে আশ্রয় নিয়ে তাঁর বাণিজ্যতরীর লোক লস্করদের ডাকলেন। তারা যুগল সাকে হাজার হাজার টাকা এনে দিল গ্রামের মধ্যে নূতন বাড়ি, নূতন কালী মন্দির গড়বার জন্য। আবার যুগল সা প্রকাণ্ড এক অট্টালিকা গড়লেন, কালী-মন্দির প্রতিষ্ঠা করলেন, আর এক প্রকাণ্ড দিঘী খনন করলেন অট্টালিকার সাম্‌নে। আবার দু তিন বছরের মধ্যে তাঁর প্রাসাদ দাস দাসী, ধনরত্নে, মণিমুক্তায় পরিপূর্ণ হয়ে উঠলো।

এইবারে যুগল সা হয়ে উঠ্‌লেন ভয়ানক কৃপণ। তাঁর মন কেবল ধনরত্ন সঞ্চয়ের দিকেই মেতে উঠ্‌লো। মা কালীর পূজা করেন আর দেশ বিদেশে বাণিজ্য ক'রে ধনরত্ন আহরণ করে কোষাগার পরিপূর্ণ করেন। একদিন কৃষ্ণ-পক্ষের অমাবস্যার গভীর রাত্রে যখন যুগল সা কালী পূজা করছিলেন, তখন তাঁর বুড়ী মা মারা গেলেন।

মাতৃভক্ত যুগল সা মাকে হারিয়ে ব্যবসা বাণিজ্য একেবারে বন্ধ করে দিয়ে সর্বত্যাগী উদাসীনের মত দিনরাত কালী মন্দিরে পড়ে থাক্‌তেন। ঘর সংসার, বিষয় আসয় সব ছাড়লেন, ব্যবসা বাণিজ্য সব নষ্ট হয়ে গেল। তিনি কেবল দিনরাত কালী মন্দিরের মধ্যে থাক্‌তেন আর গভীর রাত্রে ঘুমন্ত গ্রামখানাকে সচকিত করে 'মা মা' বলে চীৎকার করতেন।

খরচ না করে ধনরত্ন অন্ধকার ঘরে বহুদিন একভাবে মজুৎ থাক্‌লে সে ধনরত্ন "দেউদে" হয়ে যায় অর্থাৎ যখ এসে সে ধন আগ্‌লে থাকে। তখন সে ধন "যখের ধনে" পরিণত হয়। প্রকাণ্ড গোখ্‌রা সাপেরা যখের অনুচর রূপে সে ধনরত্ন পাহারা দেয়। সে ধনের গায়ে আর কেউ হাত দিতে পারে না। সর্বত্যাগী যুগলের কাছে তাঁর দেওয়ান এসে বল্‌লেন, "আপনার ধনাগারে ধনরত্ন সব যখ হয়ে যাচ্ছে। এখন কি করব হুকুম দিন।"

যুগল নিজের প্রকাণ্ড দিঘী দেখিয়ে বল্‌লেন "বড় বড় পিতলের কলসীতে ধনরত্ন সব পুরে মুখ বেশ ক'রে এঁটে ঐ দিঘীর ঠিক মাঝখানে কলসী গুলোর

গলায় শিকল বেঁধে রেখে দাও। টাকা পয়সা কিছু খরচ কোরো না।" এই বলে আবার তিনি মা কালীর সামনে ধ্যানস্থ হয়ে বসলেন।

দেওয়ানজী তাই করলেন। ঐ দিঘীর ঠিক কেন্দ্রস্থলে একটা লোহার স্তম্ভ পুঁতে তার সঙ্গে লোহার শিকল দিয়ে ধনরত্ন-পূর্ণ পেতলের ঘড়াগুলো বেঁধে রাখলেন। ধনাগার খুলে তিনি মা মনসার পূজা দিতেই চার পাঁচটা ভয়ংকর অজগর সাপ ঐ অন্ধকার ঘর ছেড়ে দিঘীর চারি পাশে ভীষণ শব্দে ফোঁস্ ফোঁস্ করে গজ্রাতে লাগ্লো। ঐ সব অজগর সাপেরা দিঘীর চারি পাশে বাসা বাঁধলো আর ভয়ংকর ফণা তুলে ঘুরে বেড়াতে লাগ্লো। কার সাধ্য ঐ দিঘীর কাছে যায়।

তারপরে একদিন ঘোর অমাবস্যা রাত্রে যুগল সা মহাকালীর পূজার বিরাট আয়োজন করলেন। একশো ছাগ আর পঁচিশটি মহিষ মায়ের সামনে বলি দেওয়া হ'ল। বলি শেষ হ'লে যুগল সা ঐ বলিদানের রক্ত সারা গায়ে মেখে পাগলের মত নাচ্তে লাগ্লেন। ঐ ছাগ আর মহিষের মুণ্ডগুলো মন্দিরের মধ্যে মা কালীর পায়ের কাছে স্তূপীকৃত করে রাখবার জন্য হুকুম দিলেন, আর ভীষণ রবে মা মা বলে চীৎকার করতে লাগলেন। তাঁর চেহারা তখন রণোন্মত্ত দৈত্যের মত ভয়ংকর।

তারপর তাঁর লোকজন দাসদাসী, সবাইকে বল্লেন "তোমরা সব চলে যাও এখান থেকে। মায়ের মন্দির থেকে চারিদিকে এক রশির মধ্যে যেন একটিও জীবন্ত প্রাণী না থাকে। আমি এবারে মহা-পূজোয় বস্বো।"

তাঁর আদেশ প্রতিপালিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘোর কৃষ্ণপক্ষের কালীবর্ণ আকাশ প্রকম্পিত করে প্রচণ্ড ভূমিকম্পে পৃথিবীর বুক চৌচির হয়ে ফেটে গেল। সবাই লুকিয়ে প্রাণ বাঁচালো।

তার পরদিন গ্রামের লোকসব এসে দেখে—যুগল সার প্রকাণ্ড অট্টালিকা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। কালীমন্দিরের ধ্বংসস্তূপের মধ্যে কালীর ভগ্ন প্রতিমার পাশেই রাশি রাশি ফুলবেলপাতার মধ্যে কালীভক্ত যুগল সার মৃতদেহ পড়ে রয়েছে।

কোথায় সেই কালীভক্ত সদাগর যুগল সা; কোথায় সেই তাঁর বিরাট কীর্তি! এখনও তাঁর বিরাট দীঘি আর কালীমন্দিরের ধ্বংসস্তূপ গ্রামের বুকে বিরাট শ্মশানশয্যা তৈরী করে রেখেছে। সেখানে—

"কত উৎসব হইল নীরব,
কত পূজা-নিশি বিগতা।
—শুধু চিরদিন বিরামবিহীন ভাঙা দেউলের দেবতা।"

খোরসেদ ফকির

(কিংবদন্তী)

এপার ওপারে কূল দেখা যায় না। বিরাট জলরাশি নিয়ে ভীমা ভয়ংকরী পদ্মা চলেছেন কলগান গেয়ে আকাশ বাতাস প্রতিধ্বনিত করে। তাঁর বুকে লক্ষ লক্ষ ঢেউএর উপর দিয়ে নক্ষত্র গতিতে সাঁ সাঁ করে চলেছে একটি খেয়া নৌকা।

খেয়া নৌকার হাল শক্ত ক'রে ধ'রে রেখেছে মাঝি। নৌকাভর্তি বহু দূর গ্রামের লোক খেয়া পার হচ্ছে। খেয়া নৌকার মালিক যাত্রীদের কাছ থেকে খেয়ার কড়ি আদায় করছে। একজন দীর্ঘশ্মশ্রু জটাজুটধারী ফকির রয়েছেন ঐ খেয়া নৌকার যাত্রী।

ঐ ফকিরের কাছে খেয়ার কড়ি চাইলে তিনি বললেন "বাবা আমি ফকির; খোদা-তালার আদেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াই। আমার কাছে তো কড়িটড়ি কিছু নেই।" খেয়ার মালিক উঠলো রেগে। সে বললো—"ফকির হও আর যাই হও, খেয়ার কড়ি দিতেই হবে।"

বুড়ো ফকির শান্তভাবে বললেন, "আমি ফকির, আমার তো কড়িটড়ি কিছু নেই বাবা।"

"ফকির টকির বুঝি না,—কড়ি না থাকে তো উঠলে কেন? নেমে যাও।"

ফকির আবার শান্তমুখে হাসলেন। অতলস্পর্শী মাঝপদ্মার বুকের উপর নৌকা থেকে নেবে যাবার কথায় একটু ভীত না হয়ে বললেন—"আচ্ছা বাবা, নেবে যাচ্ছি।"

অমনি সেই সাগরের মত মাঝপদ্মায় জেগে উঠলো প্রকান্ড এক চর। খেয়া নৌকাখানা ঐ চরে একেবারে আটকে গেল। কোথায় গেল চলে সাগর প্রমাণ জলরাশি! তার বদলে বালির চড়ায় নৌকা আটকে একেবারে যেন ডাঙায় উঠে পড়ল। জটাজুটধারী ফকির সেই রকম হাসিমুখে নৌকা থেকে ঐ হঠাৎ গজিয়ে-উঠা চরে নেবে পড়লেন। নৌকাসুদ্ধ মানুষ, নৌকার মালিক, মাঝি, সবাই অবাক—হঠাৎ সবাই যেন ভোজবাজী দেখে স্তম্ভিত!

নৌকার মালিক এসে ফকিরের পায়ে ধরলেন, "জনাব, দয়া কর, আমায় মাফ্ কর। আমার এতবড় খেয়া নৌকা চড়ায় আটকিয়ে গেল। আমায় ক্ষমা কর, রক্ষা কর।"

ফকিরের মুখে সেই হাসি। তিনি বললেন, "বাবা, তোমার নৌকা চলবেই, এতগুলো লোককে তুমি পারাপার করছ।" এই ব'লে তিনি একটু এগিয়ে গিয়ে চরের উপর তাঁর আশাসোটা" প্রতিষ্ঠা করে বসলেন। "এইখানেই আমার আস্তানা হ'ল। এই চরটা আমার বড় ভাল লেগেছে। এই ব'লে তিনি মাথার উপর হাতখানা তুলে শান্ত পদ্মার তরঙ্গকে যেন একবার ইসারা করে ডাকলেন, আর খেয়া নৌকার গোলোই-এ হাত দিয়ে নৌকাখানাকে ঠেলা দিলেন। অমনি পদ্মার জল হুহু করে দৌড়ে এসে খেয়া নৌকাখানা মাথায় করে নিয়ে গেল। ফকির নীরবে নির্লিপ্তভাবে ঐ চরে দাঁড়িয়ে রইলেন।

ইতিমধ্যে নৌকার যাত্রীরা ফকিরের এই অলৌকিক কীর্তি দেখে ভয়ে ভক্তিতে অবাক হয়ে ঐ চরেই রয়ে গেল। নৌকাতে আর উঠলো না। তারা সকলে ফকিরকে ভক্তি ভরে সেলাম করে বললো, "তুমি খোদার প্রিয় পাত্র। তোমার কথা খোদাতালা ফেলতে পারেন না। আমরা তোমার শিষ্য হব। আমাদের তোমার নফর করে নাও।"

ঐ অজ্ঞাত ফকিরের নাম খোরসেদ ফকির।

তিনি বললেন, "তোমাদের মঙ্গল হোক্। এইখানে আমি আমার আস্তানা বানাবো। এই সুন্দর জায়গাটা আমার বড় ভালো লেগেছে। তোমরা তৈরী হয়ে এসো, আমি তোমাদের দীক্ষা দেবো।"

তারা বাড়ি থেকে স্নান ক'রে পবিত্র হয়ে এলো ফকিরের কাছে দীক্ষা নিতে। ফকির নমাজ পড়ে দেখেন, তাঁর পায়ের কাছে একটি বটের চারা, একটি দেবদারুর চারা আর একটি অশ্বত্থের চারা পড়ে রয়েছে। তিনি হাত দিয়ে মাটি খুঁড়ে ঐ জনহীন চরের মধ্যে ঐ তিনটি চারা বুনলেন. যত্ন করে জল দিলেন। ঐ লোকগুলোকে দীক্ষা দিয়ে তিনি বললেন, "পদ্মার কূলে এইখানে আমার "দরগা" হবে। এখানে সুন্দর একখানা গ্রামের পত্তন করব। তোমরা আমার শিষ্য হ'লে। আমি মক্কা থেকে একবার তীর্থপর্যটন করে আসি। আমার তীর্থপর্যটন শেষ হ'তে দশ বছর লাগবে। এইখানে আমার দরগা প্রতিষ্ঠিত করে গেলাম। তোমরা একে রক্ষা কোরো। আমি দশবছর পরে আবার এইখানে এসে তোমাদের নিয়ে বাস করবো। খোদা তোমাদের মঙ্গল করবেন।" এই বলে ফকির তীর্থভ্রমণে বেরুলেন।

ঠিক দশ বছর পরে খোরসেদ ফকির ঐ পদ্মাতীরস্থ দরগায় এসে দরগার চমৎকার দৃশ্য দেখে মুগ্ধ হয়ে গেলেন। দলে দলে তাঁর শিষ্য এলো। তারা বললো, এই সুন্দর গ্রাম আপনারই প্রতিষ্ঠিত ব'লে "খোরসেদপুর" নামে পরিচিত হয়েছে।

ফকির দেখলেন সত্যিই তাঁর বোনা বট, অশ্বত্থ আর দেবদারু গাছ বেশ বড় হয়েছে। আরো অনেক গাছ ঐ দরগাটা শ্যাম শোভায় শোভিত করেছে; শিষ্যেরা দরগার জন্য একটা খড়ের ঘর বানিয়েছে, নিজেরাও ঐ নূতন গ্রামে কয়েকখানা সুন্দর বাড়ি বেঁধেছে। কলনাদিনী পদ্মার তীরেই ছবির মত একখানা সুন্দর গ্রামের পত্তন হয়েছে দেখে ফকির অত্যন্ত প্রীত হ'য়ে বললেন 'আমি এইখানে এখন থেকে বাস করবো। এই শান্ত সুন্দর গ্রামখানির ঐ দরগাতে ব'সে আল্লাকে ডাকবো।'

শিষেরা ফকিরের জন্য একখানি কুটির বেঁধে দিল। কুটিরের পাশে একটা সুন্দর বাগান করে তাতে আম, কাঁঠাল নারকেল, সুপারী গাছ বসিয়ে দিল; কুটিরের সাম্‌নে একটা ফুলের বাগান করে দিল আর পাশেই একাট প্রকাণ্ড পুকুর খনন করে দিল। এমনি করে খেরসেদপুর গ্রামটি জন্ম নিলো। কতকাল পূর্বে তা কেউ বল্‌তে পারে না। সেই প্রকাণ্ড পুকুরটি এখন 'পদ্মপুকুর' নামে সুপরিচিত।

ফকির তাঁর দরগাতে বসে মনের আনন্দে শিষ্যদের নিয়ে ধর্মালোচনা, নমাজ ইত্যাদি ক'রতে লাগলেন। ক্রমে হিন্দু মুসলমান অনেক লোক এসে ঐ খোরসেদপুরে তাদের বাড়িঘর তৈরী করে বাস করতে লাগল। বহুদিন কাটলো।

একবার খুব ভয়ানক প্লাবন এলো। বর্ষায় পদ্মার জল খোরসেদপুর গ্রামখানাকে যেন ধুয়ে পরিস্কার করে দিয়ে গেল। কারো বিশেষ কোন ক্ষতি হ'ল না। ফকির সারা দিনরাত তাঁর সাধন ভজন নিয়ে দরগায় থাকেন। একজন মুসলমান শিষ্যকে তিনি তাঁর প্রধান সেবক মনোনীত ক'রে তাঁকে দরগায় "খাদেম"ক'রে দিলেন। বছরের পর বছর কেটে গেল, ফকির অত্যন্ত বৃদ্ধ হ'য়ে পড়লেন।

একদিন অতি সুন্দর চাঁদনী রাত্রে বৃদ্ধ ফকির পরিপূর্ণ চন্দ্রালোকে কলনাদিনী পদ্মার শোভা আর শ্যামলশ্রী গ্রামখানার রূপ দেখে মুগ্ধ হ'য়ে কোরান্ থেকে ঈশ্বরের মহিমাগান ক'রে জ্যোৎস্নাময়ী রাত্রিটা কাটিয়ে দিলেন। পরের দিন ভোরে তাঁর শিষ্যেরা দরগায় এসে দেখলেন ফকির সেখানে নেই। সকলে বহু অনুসন্ধানেও তাঁকে খুঁজে পেল না।

শিষ্যেরা কেউ বল্‌লো, তিনি পদ্মার স্রোতের সঙ্গে মিশে কোথায় অন্তর্ধান করেছেন; কেউ বল্‌লো তিনি পূর্ণিমার চন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ করেছেন। তাঁর শূন্য দরগা পড়ে রইলো, যেন সেকালের কোনো ঋষির তপোবন। প্রকাণ্ড বট, অশ্বত্থ, দেবদারু, তেঁতুল, নিম প্রভৃতি বনস্পতিদের ছায়ায় শান্ত

স্নিগ্ধ নির্জন সুন্দর ঋষির তপোবন বহুদূর থেকে পদ্মাপারের লোকদের আকর্ষণ করে আন্‌লো। ক্রমে খোরসেদপুর বহু হিন্দু মুসলমানের বসতিতে পরিপূর্ণ একখানা সমৃদ্ধ গ্রামে পরিণত হ'ল—খোরসেদ ফকিরের দরগা'কে কেন্দ্র করে।

ফকির হিন্দু মুসলমান সবাইকে শিষ্য করতেন। একথা শুন্‌লে অনেকেই একটা গালগল্প মনে করবেন, কিন্তু একথা অতিরঞ্জিত নয়। হিন্দু মুসলমান সবাই নিজ নিজ ধর্মানুসারে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করত তাঁর উদার ধর্মমতে আকৃষ্ট হয়ে।

বহুকাল ধরেই তাঁর দরগায় গ্রামের হিন্দু মুসলমান অধিবাসীরা মিলে তাঁর জন্মোৎসব অনুষ্ঠান করত, মানত্‌ করতো শিরনি দিতো। হিন্দু মুসলমান সবাই তাদের গাছের প্রথম ফলটি, গাইএর প্রথম দোয়া দুধটি, স্নান করে পবিত্র ভাবে এনে তাঁর দরগায় উপহার দিত। তারা বিশ্বাস ক'রত ফকিরের দয়ায় তাঁদের গাছ প্রচুর ফলবান হবে, গাই দগ্ধবতী হবে।

১৩১৪ সালে রবীন্দ্রনাথ ফকিরের দরগার শান্ত স্নিগ্ধ সৌন্দর্য দেখে মুগ্ধ হ'য়ে গিয়েছিলেন। তিনি ঐ দরগার উপরে একটি সুন্দর পাকা বেদী তৈরী করে খোরসেদ ফকিরের স্মৃতি রক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন।

অতি প্রাচীন পাঁচালীতে পড়েছি:—

"খোরসেদপুর, গ্রাম অতি সুর
যেথায় বসতি গোপীকানাথ,
রাণী ভবানী ও সীতারাম রাজা,
পূত মহর্ষি চরণপাত।"

শিলাইদহ কুঠীবাড়ি

শিলাইদহ কুঠীবাড়ি সেকালের রবীন্দ্রভবন হিসাবে শুধু বাংলার কেন সারা ভারতের রবীন্দ্রসংস্কৃতিসেবীদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছে। পাকিস্তান সরকার বহু বিলম্বে বহু পুণ্যস্মৃতিপূত এই ঐতিহাসিক ভবনটিকে রবীন্দ্র-মিউজিয়মে পরিণত করতে ইচ্ছা করেছেন, কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের বাংলা সাহিত্যসেবী ও অনুরাগিগণ এতদিন এদিকে আদৌ মনোযোগ দেন নাই,—এইটেই আশ্চর্যের বিষয়।

শিলাইদহ কুঠীবাড়ির ইতিহাস সাহিত্যসেবিগণের কৌতূহল উদ্রেক করবে, কারণ এই মনোরম পরিবেশের মধ্যেই কবিগুরুর সাহিত্য-সাধনার মূল উৎসের সন্ধান পাওয়া যাবে। ভীমা ভয়ঙ্করী বিশাল কল্লোলময়ী পদ্মার তীরে সুন্দরী রহস্যময়ী এই বিচিত্র পল্লী পটভূমিকায় রবীন্দ্রমানসের বিশ্বপ্রকৃতির সহিত প্রথম শুভদৃষ্টি বিনিময় হয়েছিল।

নদীয়া জেলার (আধুনিক কুষ্ঠিয়া জেলার) কুষ্ঠিয়া মহকুমার কুমারখালি থানার অধীন শিলাইদহ প্রাচীন সমৃদ্ধ গ্রাম হিসাবে এককালে সুপরিচিত ছিল। রাজা সীতারাম রায় এবং পরবর্তীকালে নাটোরের রাণী ভবানীর অধিকারভুক্ত জনপদ হিসাবে গ্রামটি সমুন্নত ছিল; তারপর নীলকর সাহেবদের অধিকারে ও অত্যাচারে গ্রামটি শ্রীহীন হয়ে পড়ে। দ্বারকানাথ ঠাকুর এই জমিদারী নাটোর রাজবংশ থেকে (সম্ভবতঃ নীলামে) খরিদ করেন বেনামীতে। পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এই সম্পত্তি অধিকার করেন ও জমিদারী পরিচালনার ব্যবস্থা করেন।

মহর্ষিদেবের কনিষ্ঠ পুত্র রবীন্দ্রনাথ ১২৯৮ সালে (৩০ বৎসর বয়স) প্রকৃতপক্ষে জমিদারীর (ঠাকুর বংশের তৎকালীন সমগ্র জমিদারীর) ভার গ্রহণ করেন। তিনি ১২৯৪ সালেও কিছুদিন শিলাইদহে বাস করেছিলেন। তারও বহু পূর্বে বাল্যকালে জ্যোতিরিন্দ্রনাথের সঙ্গে ১৯/২০ বৎসর বয়সে তিনি শিলাইদহে বাস করেছিলেন। তাঁর নিজের বর্ণনায় পাওয়া যায় "পুরোনো নীলকর সাহেবের কুঠী," টাট্টু ঘোড়ায় রথতলার মাঠে বেড়ান, বিশ্বনাথ শিকারীর সঙ্গে শিলাইদহের জঙ্গলে বাঘ শিকার, শিলাইদহের মালীর তোলা ফুলের রসে কবিতা লেখা প্রভৃতি শিলাইদহের প্রাচীন স্মৃতিকাহিনী। (ছেলেবেলা ৬১-৬৭ পৃষ্ঠা) সে সময়ে যে বাড়িতে তাঁরা থাকতেন সে

ভবনটি বর্তমান শিলাইদহ কুঠীবাড়ি নয়—সেটি "পুরোনো নীলকর সাহেবদের কুঠী।" এই কুঠীর বর্ণনা রবীন্দ্রনাথ করেছেন :—

"পুরোনো নীলকুঠী তখনো খাড়া ছিল। পদ্মা ছিল দূরে। নীচের তলায় কাছারি, উপরের তলায় আমাদের থাকবার জায়গা। সামনে খুব মস্ত একটা ছাদ। ছাদের বাইরে বড় বড় ঝাউগাছ, এরা একদিন নীলকর সাহেবের ব্যবসার সঙ্গে বেড়ে উঠেছিল। আজ কুঠীয়াল্ সাহেবের দরবার একেবারে থম্‌থম্ করছে। * * * সেদিনকার আর যা কিছু সব মিথ্যে হয়ে গেছে, কেবল সত্য হয়ে আছে দুই সাহেবের দুটি গোর। লম্বা লম্বা ঝাউগাছগুলি দোলাদুলি করে বাতাসে, আর সেদিনকার রায়তদের নাতি-নাত্‌নিরা কখনো কখনো দুপুররাত্রে দেখতে পায় সাহেবের ভূত বেড়াচ্ছে কুঠীবাড়ির পোড়ো বাগানে।"

ঐ গোর দুটি শেলীসাহেব ও তাঁর স্ত্রীর বলে অনুমান করা যায়। শিলাইদহ নামটি প্রকৃতপক্ষে উক্ত নীলকর পুঙ্গব 'শেলী' সাহেবের নাম থেকে প্রচলিত। একখানা পুরাতন পুস্তকে (Memoir of Prince Dwarka-nath Tagore) এই তথ্যটি পাওয়া যায়। অনুমান ১২৯০ সালে এই বৃহৎ নীলকুঠী বাগানসহ পদ্মাগর্ভে বিলীন হয়ে যায়। উক্ত সাহেব-মেমের গোর দুটিও ১৩৪৩ সালের ভাঙ্গনে শিলাইদহ "কুঠীর হাট" বুনাপাড়াসহ পদ্মার গর্ভে অন্তর্হিত হয়। ঐ কুঠীর হাট বটগাছ ও গোর দুটির পার্শ্বস্থ বেলগাছ-এর গুঁড়িতে রবীন্দ্রনাথের জলনিবাস বজরা বা বোট (পদ্মা-বোট) বহুদিন বাঁধা থাকত এবং বুনাপাড়ার অধিবাসী-অধিবাসিনীদের সহিত তাঁর নিবিড় পরিচয় ও গল্প জমতো। মৃত্যুর কিছুদিন পূর্বেও কবি এই গাছদুটির কথা বলতেন। এর কিছু পূর্বে "হানিফের ঘাটে"ও তিনি বহুদিন বোটে বাস করেছিলেন। এই সমস্ত স্থানের স্মৃতি কবি কখনো ভোলেন নাই। "হানিফ সেখ" "মাধু বিশ্বাস" (সহজ মানুষ রবীন্দ্রনাথ) প্রভৃতি চাষীর পুরাতন স্মৃতি দরদী কবির পক্ষে ভোলা সম্ভবপর ছিল না।

শিলাইদহ গ্রামখানি পদ্মার দক্ষিণ পারে অবস্থিত, আবার এর তিন মাইল দূরে গোরাই নদী। এককালে শিলাইদহ কুঠীর হাটের সম্মুখেই পদ্মা ও গোরাই-এর সঙ্গমস্থল ছিল। সেদিনকার সেই পদ্মার বিশাল অপরূপ দৃশ্য আজ আর কল্পনা করা যায় না। পদ্মার পরপারেই (বাজিতপুর) পাবনা সহর। কুষ্ঠিয়া সহর বর্তমান গোরাই-নদীর তীরে; শিলাইদহ থেকে পাঁচ মাইল। আবার শিলাইদহের পাঁচ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে কুমারখালী সহর। তিনটি সহরের মধ্যস্থলে, নদীয়া, পাবনা ও ফরিদপুর তিনটি জেলার মিলনস্থানে

পদ্মাতীরবর্তী শিলাইদহ অপরূপ সৌন্দর্যে রবীন্দ্রনাথকে কতখানি গভীর-ভাবে আকৃষ্ট করেছিল, সে বিষয় ১৩৪৬ সালে ১লা চৈত্র তারিখে শিলাইদহ পল্লীসাহিত্য সম্মেলনের সম্পাদককে লিখিত পত্রে জানা যাবে :—

"আমার যৌবন ও প্রৌঢ় বয়সের সাহিত্যরস-সাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মা প্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে। সেখানে আমার যাত্রাপথ আজ সহজগম্য নয়, কিন্তু সেই পল্লীর স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ সরস হয়ে আছে আজও আমার নিভৃত স্মৃতিলোকে, সেই আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর অশ্রুতিগম্য করুণ ধ্বনিতে আজও আমার মনে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে, সেই কথা এই উপলক্ষ্যে পল্লীবাসীদের আজ জানিয়ে রাখলুম।"

শিলাইদহ এককালে কবি-জমিদারের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল। সেই পুরোনো কর্ম ও স্নেহের বন্ধন তিনি প্রকাশ করেছিলেন ১৩৪৫ সালের ৫ই জ্যৈষ্ঠে লিখিত আর একখানি পত্রে :—

"শিলাইদহে দীর্ঘকাল তোমাদের সঙ্গে যে আত্মীয়তাসূত্রে যুক্ত ছিলাম, আজো তোমাদের মন থেকে তা ছিন্ন হয়ে যায়নি, তারই প্রমাণ পাওয়া গেল তোমার সুন্দর চিঠিখানিতে। শ্রদ্ধার দান নানা স্থান থেকেই পেয়েছি; তোমাদের অর্ঘ্য সকলের চেয়ে মনকে স্পর্শ করেছে। অনেকবার শিলাইদহ দর্শন করে আসবার ইচ্ছা করেছি, কিন্তু সেই আমার চিরপরিচিত শিলাইদহ এখন আর সেদিনকার সেই আনন্দরূপে প্রতিষ্ঠিত নেই নিশ্চয় জেনে নিরস্ত হয়েছি।"

রবীন্দ্র সাহিত্যরসিকমাত্রেই কবির এই দুর্নিবার শিলাইদহ-আকর্ষণ প্রত্যক্ষ করেছেন তাঁহার বিশাল সাহিত্যসৃষ্টির মধ্যে।

শিলাইদহ নীলকর সাহেবদের কুঠীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেলে বর্তমান কুঠীবাড়ি নির্মিত হয় ১৮৯২ সালের শেষে এবং "কুঠীবাড়ি" নামেই সুপরিচিত হতে থাকে। এই বাড়ি তৈরীর ভার ছিল কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর (চিঠিপত্র ১ম খণ্ড) পরে পুত্র রথীন্দ্রনাথ বর্তমানরূপে পরিণত করেন এই কবি ভবনকে। এই সুদৃশ্য সুরম্য ভবনে রবীন্দ্রনাথ অনেকবার দীর্ঘকাল স্ত্রী-পুত্র-কন্যা-জামাতাসহ বাস করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ প্রভৃতি ঠাকুর বংশের প্রায় সকলেই এই মনোরম পল্লীভবনে বাস করে পদ্মা-গোরাইবিধৌত পল্লীপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য উপভোগ করেছেন। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র, নাটোররাজ জগদিন্দ্রনাথ, লোকেন্দ্রনাথ পালিত, প্রমথ চৌধুরী প্রমুখ দেশগৌরব মনীষিগণও এই কুঠিবাড়ি ভবনে বহুবার বাস করেছেন।

এই কুঠিবাড়ি ভবনের পাশ দিয়ে প্রায় ৬ মাইল দীর্ঘ রাস্তা গিয়েছে কুষ্ঠিয়া সহরের গোরাই-এর তীর পর্য্যন্ত। এই রাস্তা রবীন্দ্র রোড নামে বিখ্যাত।

শিলাইদহ কুঠিবাড়ি প্রায় তের বিঘা জমির উপরে অবস্থিত। মধ্যস্থলে বাগানের মধ্যে প্রায় ছয় বিঘা জমির উপর প্রাচীর-বেষ্টিত আড়াইতলা ভবন। একপার্শ্বে রথীন্দ্রনাথের বাল্যশিক্ষক লরেন্স সাহেবের বাংলোর বাঁধানো চাতাল এখনো দেখতে পাওয়া যাবে। এই বাঁধানো চাতাল বহুবার বহু সভাসমিতির মণ্ডপরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাচীরের পূর্বদিকে আম, কাঁঠাল, লিচু, নারকেল প্রভৃতি ফলবান বৃক্ষের বৃহৎ বাগান ও পূর্ব-পশ্চিম লম্বা দীঘি। ভবনের পশ্চিমে আর একটি বড় পুকুর, মালী ও চাকরদের গৃহ এবং বৃহৎ তরকারি বাগান। কুঠীবাড়ি থেকে বর্তমান পদ্মার ব্যবধান সিকি মাইলেরও কম। ভবনের তিনপার্শ্বে অবারিত শস্যক্ষেত্র—একপার্শ্বে শিলাইদহ (খোরসেদপুর) পল্লী। গোপীনাথদেবের মন্দির ও তাঁহার স্নান-যাত্রার মেলার জন্য এই পল্লীটি সুবিখ্যাত।

শিলাইদহ কুঠীবাড়ির চিত্রটি কবির পত্রেই অপরূপভাবে চিত্রিত হয়েছে :—

"বোলপুরের সঙ্গে এখানকার চেহারার কিছুমাত্র মিল নেই। সেখানকার রৌদ্র বিরহীর মতো, মাঠের মধ্যে একা বসে দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলচে. সেই তপ্ত নিঃশ্বাসে সেখানকার ঘাসগুলো শুকিয়ে হলদে হয়ে উঠেছে। এখানে সেই রৌদ্র তার সহচরী ছায়ার সঙ্গে মিশেচে; তাই চারিদিকে এত সরসতা। আমার বাড়ির সামনে শিশু-বীথিকায় তাই দিনরাত মর্মর ধ্বনি শুনচি, আর কনক-চাঁপার গন্ধে বাতাস বিহ্বল, কয়েৎবেলের শাখায়-প্রশাখায় নতুন চিকণ পাতাগুলি ঝিল্‌মিল্‌ করচে, আর ঐ বেনুবণের মধ্যে চঞ্চলতার বিরাম নেই। * * * এখন চৈত্রমাসের ফসল সমস্ত উঠে গিয়েচে, ছাদ থেকে দেখতে পাচ্ছি, চষামাঠ দিকপ্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছে কিছু বৃষ্টির জন্যে। মাঠের যে অংশ বাবলাবনের নীচে চাষ পড়েনি, সেখানে ঘাসে ঘাসে একটু স্নিগ্ধ প্রলেপ, আর সেইখানে গ্রামের গরুগুলো চরচে। * * * আগে পদ্মা কাছে ছিল,—এখন নদী বহু দূরে সরে গেছে। * * * একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যখন আসতুম, তখন দিন-রাত্তির ঐ নদীর সঙ্গেই আমার আলাপ চলতো। * * * ছাদের উপর দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি,—মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল, সবশেষে উত্তর দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতর পাড়ের মতো ঐ যে একটি ঝাপসা

বাষ্পরেখাটির মত দেখতে পাচ্ছি, জানি ঐ আমার সেই পদ্মা।" (২২ চৈত্র, ১৩২৮ ভানুসিংহের পত্রাবলী)

শিলাইদহ কুঠীবাড়ির দুইরকমের রূপ আমরা দেখেছি। প্রথম যুগের কুঠীবাড়ি ছিল দোতলা, প্রাচীরবেষ্টিত একটি বৃহৎ পুষ্পবাটিকা। প্রাচীরের মধ্যে প্রকাণ্ড গোলাপ বাগান, অন্যান্য বহুপ্রকার ফুলে পাতায় সুসজ্জিত অপরূপ কুঞ্জকানন। প্রাচীরের পার্শ্বে শ্রেণীবদ্ধ শিশুগাছগুলি পূর্ব ও উত্তর দিকে রবীন্দ্র রোডে মিশেছে। এর মধ্যে ছিল গুটীপোকা পালনের লতা-বিতান, আঙ্গুর ও তুতপোকার কুঞ্জ-ঘেরা সরু পথ। এইখানে লরেন্সসাহেব 'গুটিপোকার' চাষ করতেন। রথীন্দ্রনাথ তখন পড়তেন. গৃহশিক্ষক ছিলেন তিন-জন,—লরেন্সসাহেব, শিবধন বিদ্যার্ণব আর আমার পিতা সুরেন্দ্রনাথ অধিকারী। এর পরে রবীন্দ্রনাথের জামাতা নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় আমেরিকা থেকে কৃষিবিদ্যা শিখে এলে কুঠীবাড়ির উত্তরে ও পশ্চিমে ৮০ বিঘা জমি খাস খামারে এনে সেই জমিতে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কৃষিগবেষণা, চাষ, সার উৎপাদন, নূতন ফসলের ফলন ইত্যাদির পরীক্ষা হত। দুইটি পুকুর থেকে পাম্পের সাহয্যে ক্ষেত্রে জলনিকাশের ব্যবস্থা ছিল; নানাপ্রকারের লাঙ্গল ও কৃষিযন্ত্রপাতিও আনা হয়েছিল। একটি বালিকা বিদ্যালয় কবির পুত্রবধূ শ্রীযুক্তা প্রতিমা দেবী চালাতেন। পল্লীসংগঠনের দপ্তরখানাও এই ভবনের একতলায় ছিল। প্রজাদের আনাগোনাও চল্‌তো প্রচুর। এই ভবনে কিছুকাল সপরিবারে বাস করবার ফলে রবীন্দ্রনাথের নিজের গৃহস্থালী গুছিয়ে উঠেছিল। কবির সহধর্মিণীর তৈরী সব্জীবাগান, ফলের বাগান, সংসার ধর্মের নানা অনুষ্ঠানের স্মৃতিভারে আজও এই কুঠীবাড়ি ভারাক্রান্ত।

এর কিছু পরে যখন স্ত্রীবিয়োগের পর রবীন্দ্রনাথ কুঠীবাড়ি পরিত্যাগ করে তাঁহার প্রিয় জলনিবাস বোটে (বজরায়) বাসা বাঁধলেন, তখন কুঠীবাড়ির রূপ বদ্‌লে গেল। পুত্র রথীন্দ্রনাথ ফুলের বাগান একেবারে তুলে দিয়ে অনেকখানি জমি পাকা করে সান বাঁধিয়ে Lawn-এ পরিণত করলেন, কিছু কলকব্জাও প্রাঙ্গণে সন্নিবেশিত হল; বাইরের রাস্তা বড় ও চওড়া করে মাঠে নেওয়া হল।

কুঠীবাড়ির ভবনের একতলার হলঘরটিতে আমলাবর্গ ও প্রজাদের দরবার বসত। সম্মুখের পূর্বধারী ঘরটিতে কবি-জমিদার নিজে আপিস করতেন, পশ্চিমের ঘরটিতে অতিথিবর্গের থাকবার ব্যবস্থা ছিল। অন্যান্য প্রকোষ্ঠ-গুলিতে খাবার ঘর (Dinning room), পল্লীসংগঠনের দপ্তরখানা, ভাঁড়ার ঘর ইত্যাদি ছিল। একখানা ঘরে এণ্ড্রুজ সাহেব থাকতেন। দোতলায়

পূর্বদিকের বড় কামরায় রবীন্দ্রনাথ নিজে শয়ন করতেন। স্ত্রীবিয়োগের পর তেতলায় একখানা প্রকোষ্ঠ ও স্নানের ঘর তৈরী হল। রবীন্দ্রনাথ ঐ ঘরটিতেই পরবর্তীকালে সাহিত্যসাধনা করতেন এবং ঐখানেই ইংরাজী গীতাঞ্জলির জন্ম হয়। এই নিভৃত তেতলার ঘরখানি থেকে তরঙ্গভঙ্গময়ী পদ্মা, দিগন্তবিস্তৃত শস্যক্ষেত্র, পল্লীর কুটীরশ্রেণী, পদ্মার চর, ঝাউবীথিকার অপরূপ শোভা দেখা যেত। কবি এই ছাদের উপর সূর্যোদয় সূর্যাস্ত ও জ্যোৎস্নাপ্লাবিত প্রকৃতির শোভায় মুগ্ধ হতেন। এইখানে কবির চক্ষু যে সমস্ত দৃশ্যে তন্ময় হত তা তিনি নিজেই বর্ণনা করেছেন—

"দিগন্তের শেষপ্রান্ত পর্যন্ত বালির চর ধূ ধূ করছে—তাতে না আছে ঘাস, না আছে বাড়িঘর, না আছে কিছু। * * * ঠিক পাশ দিয়ে পদ্মা চলে যাচ্ছে, ওপারে ঘাট, বাঁধা নৌকা, স্নানরত লোকজন, নারকেল ও আমের বাগান;—অপরাহ্নে নদীর হাটের কলধ্বনি,—দূরে পাবনার পারে তরুশ্রেণীর ঘন নীলরেখা,—কোথাও গাঢ় নীল, কোথাও পাণ্ডু নীল, কোথাও সবুজ, কোথাও কোথাও মাটির ধূসরতা—আর তারই মাঝখানে—রক্তশূন্য মৃত্যুর মত ফ্যাকাসে সাদা।"

রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যসৃষ্টির সম্ভবত অর্ধাংশেরও বেশি জন্মলাভ করে শিলাইদহের বোটে পদ্মাবক্ষে, এই কুঠীবাড়িতে, গোরাই-এর বক্ষে ও পদ্মার চরে। তাঁর প্রথম যৌবনের ছোটগল্পের জন্মস্থান শিলাইদহে। তাঁর প্রৌঢ়কাল পর্যন্ত প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাই শিলাইদহের প্রাকৃতিক পটভূমিকায় রচিত। তাঁর কর্মযজ্ঞের নানা পরীক্ষার উৎপত্তিস্থানও শিলাইদহে। শিলাইদহের মত নিভৃত পল্লীনিকেতন কবি আরও পেয়েছিলেন তাঁর অপর জমিদারী সাহাজাদপুরে ও পতিসরে। কিন্তু রীতিমত সুরুচিপূর্ণ ঘর বেঁধে একজন অভিজাত ভদ্র গৃহস্থের বাস করবার মত উপযুক্ত করেই শিলাইদহ কুঠীবাড়ি, বাগান পুকুর ইত্যাদি চমৎকার প্রাচীরবেষ্টিত করে তৈরী করা হয়েছিল। এইরকম সুরম্য সুন্দর বাসভবন কবির আর কোন জমিদারীতে ছিল না। কারণ রবীন্দ্রনাথ এই শিলাইদহ কুঠীবাড়িতেই সেকালে সপরিবারে নিজ গৃহস্থালী গড়ে তুলবার আয়োজন করেছিলেন। এবিষয়ে 'চিঠিপত্র' প্রথম খণ্ডে কবির ইচ্ছা চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে।

রবীন্দ্রজীবনী পাঠ করলেই কবির বিশাল বিচিত্র সাহিত্য সৃষ্টিতে "পদ্মা প্রবাহচুম্বিত শিলাইদহের" স্থান কত উচ্চে তা বুঝা যাবে। ১৩১১ সালে শান্তিনিকেতনে কবি সতীশচন্দ্র রায়ের মৃত্যুর পর মাঘ মাস থেকে গ্রীষ্মাবকাশ পর্যন্ত শান্তিনিকেতন বিদ্যালয় শিলাইদহে স্থানান্তরিত হয়। অনেকের ধারণা

শান্তিনিকেতনের একটি বিশিষ্ট অংশ শিলাইদহে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য কবির পরিকল্পনা ছিল।

রবীন্দ্রনাথের জন্মনগরী কলিকাতা ও কর্মক্ষেত্র শান্তিনিকেতনের পরেই তাঁহার সাহিত্য সাধনপীঠ শিলাইদহের স্থান। শিলাইদহ ও পদ্মানদী তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির উৎস,—বিশ্বপ্রকৃতি ও বিশ্বমানবের অন্তরের মণিকোঠায় তিনি প্রবেশ পথ পেয়েছিলেন এই স্থানেই। "ছিন্নপত্র" ও অন্যান্য পত্রসাহিত্য রবীন্দ্রমানসের বিভিন্ন গতি-প্রকৃতির যে সাক্ষ্য দিচ্ছে—তার প্রধানতম পটভূমিকা শিলাইদহ। এই শিলাইদহেই তিনি বাংলার বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বাউলদের সহিত ও বৈষ্ণব সাধকদের সহিত আলাপ-আলোচনার সুযোগ পেয়েছিলেন, যৌবনের প্রারম্ভে প্রাচীন গ্রামীন বাংলার মর্মকথা গভীরভাবে অনুধাবনের সুযোগ পেয়েছিলেন।

এই শিলাইদহের স্মৃতি কবির পরিণত বয়সে ১৯৩০ সালে যখন রাশিয়ায় বসে চিরক্রন্দিত ঊর্মিনিনাদ প্রত্যক্ষ করছেন, তখনও তাঁহার মনকে আলোড়িত করেছিলঃ—"কেবলি ভাবছি, আমাদের দেশজোড়া চাষীদের দুঃখের কথা। আমার যৌবনের আরম্ভকাল থেকেই বাংলাদেশের পল্লীগ্রামের সঙ্গে আমার নিকট পরিচয় হয়েছে। তখন চাষীদের সঙ্গে আমার প্রত্যহ ছিল দেখাশুনা—ওদের সব নালিশ উঠেছে আমার কানে।"

ঠাকুর পরিবারের বাংলাদেশের তিনটি জমিদারী,—শিলাইদহ, পতিসর ও সাহাজাদপুর—তিনটি গ্রামেই কবির যৌবনের স্বপ্ন বাস্তবে রূপায়িত করবার প্রাণপণ চেষ্টা হয়েছিল। কোথাও কবি নীড় বাঁধতে পারেন নাই,—শিলাইদহের পল্লীকুঞ্জেই বাসযোগ্য সুরম্য-ভবন নির্মিত হয়েছিল তাঁর "ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া-আসার" স্থায়ী পটভূমিকারূপে। এরন একটি অনুপম কবি-ভবন যদি আজও অনাদৃত থাকে, তবে বুঝতে হবে বাঙালী জাতির রবীন্দ্র-অনুরাগ শুধু কথার কথা মাত্র।

শিলাইদহ কুঠীবাড়ি ভবনটিতে একটি জাতিগঠনমূলক প্রতিষ্ঠান অতি অনায়াসে অল্প ব্যয়েই সংগঠিত করা যেতে পারে। বঙ্গবিভাগ না হলে এই বহু স্মৃতিমণ্ডিত ভবনটির এমন দুর্দশা হয়ত হত না। সেক্‌সপিয়রের পল্লীভবনে ইংরাজ জাতি মহাকবির স্মৃতির প্রতি যে শ্রদ্ধা ও কর্তব্যবোধের পরিচয় দিয়েছে পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ কুঠীবাড়িও জাতির কর্তব্যবুদ্ধিকে সেইভাবে জাগ্রত করবে। ভারতের জাতীয় সরকারের এইদিকে অবিলম্বে মনোযোগ দেওয়া কর্তব্য।

শিলাইদহে শেষবার

সম্ভবতঃ ১৩৩০ সালের শেষে রবীন্দ্রনাথ শেষবার তাঁর সাধের জমিদারী ও সাহিত্য রসসাধনার তীর্থস্থান পদ্মাপ্রবাহচুম্বিত শিলাইদহে যান তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশেষ আমন্ত্রণে। ঠাকুর পরিবারের বৈষয়িক পার্টিসন অনুসারে সেসময় সুরেন্দ্রনাথই শিলাইদহের জমিদার। রবীন্দ্রনাথ তার মালিক ছিলেন না। তাঁর জমিদারী পৃথক হয়েছিল কালীগ্রামে উত্তরবঙ্গে রাজসাহী জেলায়। কঠিন বাস্তবতার ভূমিতে তিনি রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তাঁর উদ্দেশ্য ছিল শিলাইদহে বিস্তীর্ণ চর অঞ্চলে প্রজাবিদ্রোহের অবসান করা। জমিদারীর ভাবনা চিন্তা তখন কবি একেবারেই ছেড়ে দিয়েছিলেন। তখন তিনি বিশ্বকবি. দেশবিদেশের সম্মান ও শ্রদ্ধার মুকুট তাঁর মাথায়, ভারতবর্ষের বহু গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যভার তাঁর উপরে। কবির সঙ্গে গিয়েছিলেন দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ এবং ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ।

শিলাইদহ চরের প্রজা ইস্‌মাইল্ মোল্লা (মালিখা) বিদ্রোহী প্রজাদের নায়ক। চরঅঞ্চলের প্রায় দু'শোঘর প্রজা ইস্‌মাইলের নেতৃত্বে ঠাকুর জমিদারের ম্যানেজারের সঙ্গে তাদের স্বার্থ নিয়ে লড়ছিল, কয়েকটা ছোটখাটো মোকদ্দমাও হয়েছিল তার ফলে। তাদের বক্তব্য,—তাদের অনেকদিনের ভোগদখলী চরের জমি যা পদ্মার প্লাবনে শিকস্তী হয়ে যেতো সেই জমি তাদেরই প্রাপ্য। ম্যানেজার তাদের বিরোধী। তাঁর আপত্তি, আইনমতে সে সব জমি জমিদার পক্ষ নতুন করে বন্দোবস্ত করতে পারেন এবং করেছেন। এই বিরোধ ধূমায়িত হয়েছিল ছ'সাত বছর ধরে। জমিদার হিসাবে সুরেন্দ্রনাথ ছিলেন অত্যন্ত জনপ্রিয়। তিনি অনেকবার আপোষ নিষ্পত্তি করে দেন: কিন্তু সে আপোষ নিষ্পত্তি বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না। তখন ইসমাইল্ মোল্লা চরের মুশলমান প্রজাদের দলবদ্ধ করে নানা ছুতোয় জমিদার পক্ষের বিরুদ্ধাচরণ করে। চর মহালের প্রজাদের মধ্যে একটা শক্তিশালী বিদ্রোহী প্রজার দল গ'ড়ে ওঠে। মীমাংসার পথ ক্রমেই জটিল হয়ে পড়ে।

রবীন্দ্রনাথ এইবারে তাঁর বহুকালের পুরোণো জমিদারী পরিচালনার অভিজ্ঞতার নূতন করে পরিচয় দেন। সে যেন এক সেসনের বিচারপর্ব। কুঠীবাড়ীর দরবার কক্ষে প্রজা পক্ষ ও আমলা পক্ষ নিজ নিজ কাগজপত্র নক্‌শার সাহায্যে নিজ নিজ বক্তব্য পেশ করেন। দুইদিনে প্রায় পাঁচ ছয় ঘণ্টা.

উভয় পক্ষের সওয়াল জবাব চলার পর রবীন্দ্রনাথ সরেজমিনে বিরোধের অবস্থাটা পরিদর্শন করে তাঁর শেষ বক্তব্য প্রকাশ করবেন, হুকুম দিলেন। আমি সে সময়ে ঠাকুরবাবুদের চাকরী করি এবং সেই সময়ে এই বিচারের সময় উপস্থিত ছিলাম।

প্রায় সুদীর্ঘ কুড়ি বছর পরে শিলাইদহের প্রজাদের অতিপ্রিয় "বাবু-মশাই" চর দেখ্‌তে আসবেন। এখন তিনি শুধু শিলাইদহের বাবুমশাই নন, তিনি নোবেল পুরস্কার বিজয়ী, সারা বিশ্বে সম্মানিত বিরাট পুরুষ। গর্বে আনন্দে প্রজারা দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুট্‌লো—পদ্মার ধারে, শিলাইদহ খেয়াঘাটে, চরের নানাস্থানে,—কোন্ পথে দীর্ঘ বিশ বছর পরে রবীন্দ্রনাথকে নিজের চোখে দেখবার সৌভাগ্য হবে তারি চেষ্টায়। বিরাট জনতা, কেউ জানে না, কোন্ পথে তিনি চরঘোষপুর আর কোশাখালি চরে পেঁছুবেন,—পাড়ায় পাড়ায় পদ্মার নানান্ ঘাটে বিরাট জনতা ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করছে। হঠাৎ জানা গেল, বাবুমশাই শিলাইদহ খেয়াঘাট পার হয়ে পাল্‌কীতে প্রথমে কোশাখালী, ভৈরবপাড়া ছাড়িয়ে চরঘোষপুর পেঁছুবেন। শিলাইদহে এত বড় বিরাট জনতা আমি তো এর আগে কখনো দেখিনি। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ খেয়াঘাটে পেঁছে দেখ্‌তে পেলেন—গোলমালে হাতঘড়িটা কুঠী-বাড়িতে ফেলে এসেছেন। তৎক্ষণাৎ সাইকেলে বরকন্দাজ ছুট্‌লো কুঠীবাড়িতে। দেখা গেল, এণ্ড্রুজ সাহেব গুরুদেবের ঘড়ি নিয়ে ছুট্‌ছেন শিলাইদহ খেয়াঘাটে,—প্রাণপণে দৌড়োচ্ছেন, শেষে খেয়াঘাটে পেঁছে স্বহস্তে গুরুদেবের হাতে ঘড়িটি বেঁধে নিশ্চিন্ত হয়ে হাস্‌তে লাগলেন। রবীন্দ্রনাথ হেসে উঠ্‌লেন সাহেবের কাণ্ড দেখে। আমরা সবাই আপনভোলা মহাপ্রাণ এণ্ড্রুজ সাহেবের অপূর্ব ব্যবহারে মুগ্ধ হলাম। সাহেব কুঠীবাড়িতে ফিরে গিয়ে লেখাপড়ায় মন দিলেন।

ভোর সাতটা থেকে বেলা ১১টা পর্যন্ত চর পরিদর্শন করে এসে পরের দিন সকালে তাঁর রায় বের হল। তিনি যে রায় দিয়েছিলেন সেই রকমভাবেই পরবর্তীকালে Bengal Tenancy Act এর সংশোধন হয়েছিল। পরপর চার বছরের টানা খাজনা আর জমি সুনির্দিষ্ট করবার জন্য আমিন খরচা দিলে তদন্তে যে জমি প্রকাশ পাবে সেই জমিই প্রজাকে দেওয়া হবে,—এইভাবে শিকস্তী জমিও নক্‌সার সাহায্যে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হবে। তবে কোন জমি নালিশের পর ডিক্রীজারীতে জমিদারের খাসে এলে এবং অন্যের সঙ্গে বন্দোবস্ত হয়ে গেলে আইনের খাতিরে সে জমি দেওয়া হবে না,—অন্য বন্দোবস্তী জমি তার পরিবর্তে প্রচলিত সেলামী ও খাজনা দিলে প্রজারা পাবে,—এইরকম

মীমাংসা করে দিলেন। প্রজারা যথেষ্ট সুবিচার পেয়েছিল, কিন্তু আমলা-চক্রের কেরামতির ফলে এই সমস্যা পরে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল।

সে সময়ে কবি রাশিয়া ঘুরে এসেছেন। সেখানকার চাষীজীবনের অদ্ভুত

শিল্পাচার্য শ্রীনন্দলাল বসু অঙ্কিত

অগ্রগতি কবির অনুভূতিতে আলোড়ন তুলেছে। চাষী আর শ্রমিকের জীবন-মান কতখানি উন্নত হলে তাদের হাতে সারাদেশের রাষ্ট্রশক্তি কী বিপুল সম্ভাবনার পরিচয় দিতে পারে—সে বিষয়ে তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা তাঁকে নূতন করে ভাবিয়ে তুলল সেদিন শিলাইদহের বিস্তীর্ণ চর এলাকার বালি আর পলিমাটি! তাঁর অনেক মন্তব্যই জমিদারের বিপক্ষে গেল। তখনই তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন,—বর্তমান অবস্থায় জমিদারীর রথ আর চল্‌তে পারে না। মামুলী শোষণ, আরামে বিনা পরিশ্রমে হাজার হাজার মেহনতী মানুষের পরিশ্রমের ফলভোগ করার দিন ফুরিয়ে এসেছে। নতুন চিন্তা, নতুন কর্মপদ্ধতি আবিষ্কার করছে এই বহুদিনের অখ্যাত শোষিত জনসাধারণ। সে ঢেউ এদেশেও লাগ্‌বে—এদেশেও উপরতলা নীচেতলার মধ্যে তীব্র অসন্তোষ জেগে উঠ্‌ছে। এদেশেও সেসব চিন্তা জেগেছে। এখনও মধ্যবিত্ত ও ধনীদের সাবধান হবার পথ খোলা আছে। তাঁরা বৃহৎ স্বার্থের জন্য ক্ষুদ্র স্বার্থ বলি না দিলে তাঁদের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে। মানুষের জীবনযাত্রায় বিজ্ঞান নূতন আলো দেখাচ্ছে। যারা অজ্ঞ, ঘৃণ্য শোষিত, তারাও ভাব্‌তে শিখ্‌ছে। তিনি রাশিয়ার কৃষি ও শিক্ষার উন্নতি, যৌথখামার, সমবায় প্রথার প্রচলন প্রভৃতি অনেক নূতন কথা ঐ সংস্রবে নিজস্ব অনুপম ভঙ্গিতে বলেছিলেন।

অনেক অপ্রিয় সত্য তাঁর মুখে আমরা শুনেছি। প্রজাদের দরখাস্তে আজ্ঞাধীন দীনহীন আশ্রিত প্রজা—এইরকম ভাষায় তিনি অসন্তুষ্ট হতেন, মানুষের ভিতরকার নারায়ণ কতখানি সঙ্কুচিত, কতখানি শোচনীয় অবস্থায় নেমে এসেছে—এই কথা ব'লে মনে মনে শিউরে উঠ্‌তেন। কোন প্রজা মাম্‌লা-বাজী ক'রে জমিদারের সঙ্গে লড়েছেন—জান্‌লে তিনি সেই প্রজার উপর অসন্তুষ্ট হতেন না, তিনি ধরে নিতেন এর একটা সঙ্গত কারণ অবশ্যই আছে। যৌবনকালে জমিদাররূপে প্রজাদের সঙ্গে আলাপ করতে করতে অনেক সময়ে তাঁকে বল্‌তে শুনেছি—"তোমাদের কথা ভাব্‌তে ভাব্‌তেই আমার চুলদাড়ি সব সাদা হয়ে গেল—তোমরাই তো আমাদের হাত-পা।"

এই সময়ে জনৈক ভদ্রমহিলার দেনা পরিশোধের ব্যাপারে তাঁর উপরে বিচারের ভার ছিল। ইনি এষ্টেটের দেনা শোধ না করে ক্রমাগতই অনুগ্রহ চাইছেন—সে অনুগ্রহের শেষ কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে—এই প্রসঙ্গে যা বলেছিলেন—সে কথাটা আমার আজও মনে আছে। বলেছিলেন—"তোমরা সবাই কি সুরেনকে কামধেনু পেয়েছ? তাকে ভালমানুষটি পেয়ে আর কত দোহন করবে?" শেষে মহিলাটির পাকা ভদ্রাসন বাড়িটি তাঁকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর

সমস্ত সম্পত্তি এষ্টেটের দেনাশোধে জমা খরচ করবার জন্য হুকুম দিয়েছিলেন, সে ব্যবস্থাতেও এষ্টেট্‌পক্ষের ক্ষতির পরিমাণ কম হয় নাই।

এই সময়ে একদিন বন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেবের সঙ্গে বিকালে গ্রামভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। যে সমস্ত রাস্তাঘাট বিশ পঁচিশ বছর আগে তাঁর অতি পরিচিত ছিল, সেই সমস্ত স্থানের দুর্দশা দেখে থম্‌কে দাঁড়িয়েছিলেন। গ্রামের জঙ্গল, খানাডোবা দেখে তিনি ভ্রাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথকে শ্রীনিকেতন পল্লী-সংগঠনের আদর্শে সংস্কার করবার জন্য আলোচনা করেছিলেন। তাঁরই ব্যবস্থায় শিলাইদহের পাঁচজন যুবক (বৈদ্যনাথ ভৌমিক, বিজয়কুমার সরকার প্রভৃতি) সেই সময়েই শ্রীনিকেতন গিয়ে সেখানকার তাঁত, সতরঞ্চ বোনা প্রভৃতি এবং ব্রতী বালক সংগঠনের সমস্ত কাজ এষ্টেটের খরচায় শিখে আসেন এবং শিলাইদহ কাছারীতে একটি পল্লীসংগঠন বিভাগ খোলার ব্যবস্থা হয়। শ্রীনিকেতন থেকে দুজন বিশেষজ্ঞ শিক্ষকও (শ্রীযতীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমনোমোহন ঘোষ) শিলাইদহে এসে ঐ বিভাগের কাজকর্ম আরম্ভ করেন। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহ থেকে গিয়েই কালীমোহন ঘোষ ও এল. কে এলম্‌হার্ষ্ট সাহেবকে শিলাইদহে পাঠিয়েছিলেন—গ্রামে নানাবিধ সংগঠন কার্যে জনসাধারণকে উৎসাহিত করবার জন্য। তখন পর্যন্ত তিনি যেন শিলাইদহকে নিজের জমিদারী বলেই মনে করতেন। এই প্রসঙ্গে একটা কথা বিশেষ প্রণিধানের যোগ্য। শান্তিনিকেতন ব্রহ্মবিদ্যালয় যে সময় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সে সময়ে শিলাইদহ জমিদারীর একটি করে ছাত্রকে প্রতি বৎসর Free Student হিসাবে শান্তিনিকেতনে পাঠাবার ব্যবস্থা ছিল। দুর্ভাগ্যক্রমে প্রথম বৎসরের পরে এবিষয়ে আর কারো উৎসাহ দেখা যায় নাই—শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে জনসাধারণের বিরূপ মনোভাবের জন্য। শিলাইদহ জমিদারীর অন্তর্গত তরফ্‌ সেরকাঁদি মৌজার সমস্ত উপস্বত্ব প্রায় ২৫০৲ টাকা প্রতি বৎসর সেকালের শান্তিনিকেতনের খরচ নির্বাহের জন্য পাঠাবার জন্য মহর্ষিদেবের লিখিত নির্দেশ ছিল। সে নির্দেশ সেদিন পর্যন্ত অক্ষরে অক্ষরে পালিত হয়েছে। আমরা পূর্বে দেখেছি, শান্তিনিকেতনে ১লা বৈশাখ নববর্ষ উৎসবের সময় প্রতি বৎসর নিয়মিতভাবে শিলাইদহ জমিদারী থেকে তরমুজ, কাঁকুড়, আম ইত্যাদি নানারকম ফল পাঠান হত। পদ্মার উপরে বসে রবীন্দ্রনাথ যে ভাবনা ভাব্‌তেন তাই শান্তিনিকেতনে একটা সৃষ্টির ক্ষেত্র তৈরি করতে সাধনায় ব্রতী হয়েছিলেন—একথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই বলে গেছেন।

সেদিন রবীন্দ্রনাথ ও এণ্ড্রুজ সাহেব গ্রামভ্রমণে বেরিয়ে গোপীনাথ ঠাকুরের মন্দির, দিঘী, বাজার, কাছারীবাড়ি দেখে বাজারের পাশ দিয়ে আস্‌ছিলেন।

তাঁদের পেছনে ম্যানেজার ও আমলাবর্গ বহু লোক অনুগমন করছিল। ঠিক সেই সময়ে গোপীনাথ-দিঘীতে হাত পা ধুয়ে একজন বৃদ্ধ বেঁটে লোক পুকুরপাড়ে তার পানের বোঝা মাথায় চাপাবে, এমন সময় তার সাম্‌নেই রবীন্দ্রনাথের সবন্ধু আবির্ভাব। লোকটি সঙ্গে একটা ঘটি দুধ কেনবার জন্য, একটা ল্যাঠি, কাঁধে গামছা, মাথায় পানের বোঝা। সে একপাশে দাঁড়িয়ে হাঁ করে তাদের অতিপরিচিত 'বাবুমশাইকে' দেখ্‌ছে—এখন আর সে 'বাবুমশাই' নাই, এখন বিশ্বজয়ী, বিশ্বের জয়মাল্য-পরিহিত বিরাট্ পুরুষ—তাদের সেই চিরপরিচিত জমিদার বাবুমশাই। লোকটা দুটী চোখ বিস্ফারিত করে হাঁ করে চেয়ে রয়েছে। এমন সময়ে তার সাম্‌নেই এসে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথ বল্‌লেন—তোমার নাম—তোমার নাম...কেতু ঢালী নয়? লোকটি এবারে একেবারে আনন্দে উত্তেজনায় হাউমাউ করে কেঁদে বল্‌ল—"আজ্ঞে—বাবুমশাই —বাবুমশাই,—আমি সেই কেতু ঢালি! আজ মরবার আগে আমার কী সৌভাগ্য, আমাদের সেই বাবুমশাইকে দেখ্‌লাম। আমি মরিনি হুজুর! বাতে পঙ্গু।"

আশ্চর্য রবীন্দ্রনাথের স্মরণশক্তি! সেই বীর কেতু ঢালীকে তিনি আজও পঁচিশ ত্রিশ বছরেও ভোলেন নাই। বাবুমশাই বল্‌লেন, তোমাকে আমি চিনেছি কেতু ঢালি। বেঁচে আছ? কেমন আছ? তোমাদের দেখ্‌তে পাবো আশাও করতে পারিনি।" তাঁর কণ্ঠস্বরেও আনন্দবেদনা ভেঙ্গে পড়ছে। কেতু ঢালি তার বাতের ব্যাধি, বার্ধক্য ইত্যাদির কথা বল্‌ল। রবীন্দ্রনাথ তখনি জিজ্ঞাসা করলেন—তুমি পেন্‌সন্ পাচ্ছ তো? সে বলল—আজ্ঞে হ্যাঁ হুজুর পাঁচ টাকা।

রবীন্দ্রনাথ তখন ইংরাজিতে সাহেবকে বল্‌তে লাগ্‌লেন—এইসব বীর বিশ্বাসী সরল গ্রাম্য লেঠেল আমার কর্মচারী ছিল—এই বলে কেতু ঢালীর যৌবনের অনেক কথা, অনেক বীরত্ব কাহিনী মহা উৎসাহে সাহেবকে বল্‌লেন। সাহেবও তাঁর কথা শুনে শ্রদ্ধাপ্লুত চোখে কেতু ঢালীর দিকে চেয়ে রইলেন। আমি প্রত্যক্ষদর্শী ঐ দলে ছিলাম। এই কেতু ঢালীর বিস্তারিত বিবরণ আমার "কবিতীর্থের পাঁচালীতে" পাওয়া যাবে। মেছের সর্দার, হায়ধর সর্দার প্রভৃতি সেকালের বিখ্যাত লেঠেল বরকন্দাজের খবরও রবীন্দ্রনাথ জেনে নিলেন।

পরের দিন অতি প্রভাতে কবি ভ্রমণে বের হলেন—শিলাইদহ কুঠীবাড়ির সামনে তরুছায়াসমাচ্ছন্ন রাস্তা ধরে। তাঁর সঙ্গে ছিলাম আমি আর পূর্ণচন্দ্র বাগ্‌ছি (ইনি বহুদিন পূর্বে শান্তিনিকেতনে শিক্ষকতা করেছিলেন এবং পরেও কিছুদিন সেখানকার আপিসে কাজ করেন) তাঁর পিছনে। প্রভাতের সোনালী

আলোয় সামনের ঝোপে আর কাঁঠালগাছের ডালে কতকগুলি পাখী কিঁচির মিচির করে খেলা করছিল। শালগাছের ডালেও কয়েকটা পাখী ডাকছিল। কবি মুগ্ধনেত্রে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে পাখীদের কলগুঞ্জরণ শুনলেন। তার পরে আমাদের বললেন—এই পাখীদের নাম জানো—কী পাখী এরা বলতে পারো? আমরা আন্দাজে পাখীদের কয়েকটা নাম বললাম। কবি হেসে বললেন—ঠিক হল না। কী সুন্দর পাখীগুলো,—এরা যে তোমাদের প্রতিবেশী—এমন সুন্দর প্রতিবেশীদের নাম জানা উচিত। এই বলে কবি পাখীদের নাম বললেন—এইসব পাখী অন্যদেশে দেখতে পাওয়া যায় না—বিশেষভাবে ভারতবর্ষের বাইরে এসব পাখী দেখতেই পাওয়া যায় না। কবি অনন্যসাধারণ ভাষায় পাখীদের কাহিনী বলতে বলতে দেখতে লাগলেন তাদের খেলা। একটুখানি নীরব থেকে মুগ্ধনেত্রে শুনতে লাগলেন তাদের কাকলী।

শিলাইদহ ছেড়ে আসবার আগের দিন আমরা স্থানীয় জনসাধারণের পক্ষ থেকে ও জমিদারীর কর্মচারীদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে এক জনসভায় অভিনন্দন জানাবো বলে প্রস্তাব করলাম। রবীন্দ্রনাথ বললেন—"আমার অতিথি, আমার বন্ধু এণ্ড্রুজ সাহেবকে তোমরা অভিনন্দিত করো, আমি তো বাপু তোমাদের ঘরের লোক। চাষীদের ডেকো সেই সভায়, আমি তাদের চিনিয়ে দেবো এই অপূর্ব মানুষটিকে।" রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন এক দিন পেছিয়ে গেল। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের উদ্দেশ্যে আমাকে একটি কবিতা লিখতে হল সেই রাত্রেই। সে কবিতাটি পরের দিন ভোরে কবিকে দেখালাম, তিনি একটু সংশোধন করবার জন্য হাতে পেন্সিল নিয়ে একটু ভেবে বললেন—"মন্দ হয়নি, এটিই ছাপতে দাও।" তাঁর নিজের জন্যে যে দু'খানা অভিনন্দন পত্র লেখা হয়েছিল, তা একটুও পড়লেন না, ভাঁজ করে ফেরৎ দিলেন।

প্রকাণ্ড সভা হল—বিরাট জনসমাগম হয়েছিল। সভায় স্থানাভাব হওয়ায় এণ্ড্রুজ সাহেব কিছুতেই চেয়ারে বসতে রাজী নন,—কবি তাঁকে জোর করে চেয়ারে বসিয়ে বললেন—"ইনি আমার পরমবন্ধু সি এফ. এণ্ড্রুজ, এঁকে তোমরা চেনো না, ইনি সাহেব ভেবে তোমরা ভয় পেয়ো না, ইনি মাটির মানুষ যীশুখৃষ্টের প্রকৃত ভক্ত।" খৃষ্টধর্ম, হিন্দুধর্ম ও মুসলমান ধর্মের মূল-সত্যটি তিনি খুব সহজ ভাবে বুঝিয়ে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের বিশ্বমানবতা ও নিঃস্বার্থ সাধনার কথা চমৎকার করে বুঝিয়ে দিলেন। "আমার বন্ধু আজ আমার অতিথি," এই বলে বড় ফুলের মালাটি নিজে সাহেবের গলায় পরিয়ে দিলেন। ইংলণ্ডের কৃষিজীবন ও এলমহার্ষ্ট সাহেবের জমিদারীর গল্প বললেন। কুষ্টে, কুমারখালি, খোকসা, জানিপুর, কৃষ্ণনগর, পাবনা থেকে অনেক

ভদ্রলোক সভায় এসেছিলেন। তাঁদের অনেকের সঙ্গে সাহেবের পরিচয় করিয়ে দিলেন। এষ্টেটের উকীল শ্রীযুত চন্দ্রময় সান্যালের পরিচয় দিয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন—"The Zemindars and the Pleaders now sail on the same boat. We suck the lifeblood of our tenants and the Pleaders—their clients—but our Chandrmay is an exception" এই রকম অনেক কথা বলে হাস্যপরিহাস-রসিক কবি-জমিদার বহু কাল পরে প্রজাদের মধ্যে আনন্দের বন্যা এনেছিলেন। পরের দিন তাঁর নিজের অভিনন্দন সম্মেলনে কবি রাশিয়ার Collective firm, রাশিয়ার কৃষি ও শিক্ষার উন্নতি কৃষিজীবন সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা অতি সহজ ভাবে গল্প করে বুঝিয়ে দিলেন এবং আমাদের দেশের জমিদার ও মধ্যস্বত্বাধিকারীদের যে কর্তব্য রয়েছে চাষীদের জন্য, সে বিষয়ে জোর দিয়ে বললেন—

"এক দল শোষক, এক দল দালাল লক্ষ লক্ষ অশিক্ষিত চাষীকে পশুর পদবীতে নামিয়ে দিচ্ছে। আমাদের দেশের আইন পাল্‌টাবে কিনা জানি না, কিন্তু এই অবস্থা ক্রমাগত চল্‌তে থাক্‌লে আমাদের কোনমতেই মঙ্গল হবে না। জমিদার, জোদ্দার আর চাষী,—এই তিন রকমের স্বার্থভোগীদের হাত মেলাতে হবে—চালাকী চল্‌বে না বেশিদিন। পৃথিবীর চেহারা বদ্‌লেছে—আরও বদ্‌লাবে—ফাঁকি বেশীদিন চল্‌বে না। এখনও বাঁচ্‌বার পথ আছে। দেশের সরকার কিছু করবে না—কিন্তু নিজেদের করতেই হবে। বাঁচ্‌বার পথ, উন্নতির পথ এখনো খোলা আছে। নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি বদ্‌লাতে হবে,—মামুলী ছেড়ে ভাব্‌তে শেখো। নতুন আলো সব দেশে এসেছে—এদেশেও আসছে। স্বার্থে যারা অন্ধ তাদেরও চোখ্ মেল্‌তে হবে। বাংলার মত নদীমাতৃক দেশে অন্নাভাব, দুর্ভিক্ষ আস্‌বে কেন? কেন লোকে দুবেলা পেটভরে খেতে পাবে না? দেশের সরকারের এইটে সবচেয়ে বড় কর্তব্য, কিন্তু তার মুখচেয়ে থাক্‌লে তো চল্‌বে না। তারা বিদেশী বণিক—তারা জমিদারীর মুনাফা লুটতে এসেছে। বৈজ্ঞানিক প্রণালী-গুলো সবাই শিখে নাও অন্যদেশে শস্যের ফলন যে উপায়ে বাড়ছে সেই উপায় হাতে কলমে শিখে নাও। এখনও জমিদাররা সাবধান হন্, দেশের দরিদ্র জনসাধারণের পাশে এসে দাঁড়ান। এরা না বাঁচ্‌লে তাঁরাও বাঁচবেন না। সবাই একযোগে কাজ করুন, চাষের কাজে গ্রাম্যশিল্পের কাজে সমবায় প্রথার সাহায্য নিন।

এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটি কথা বলেছিলেন—এই ভাবটি তাঁর কয়েকটি বিখ্যাত কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। নদীর স্রোত ছিল, তাই লোকে

তার জলে তৃষ্ণা দূর করেছে কেন না সে জল বিশুদ্ধ। তার তীরে কত গ্রাম-নগর গড়ে উঠেছে, বাণিজ্যের সহায় হয়েছে। তার জলে স্নান করে সবাই তৃপ্ত, তার বাতাসে সবাই স্বাস্থ্য ফিরে পেয়েছে। কিন্তু সে নদী স্রোত হারিয়ে বদ্ধজলায় পরিণত হল, শেওলা জম্‌ল, পচা পাঁকে ভরে গেল। সেই স্বাস্থ্যকর জীবনদায়িনী নদী হয়ে দাঁড়ালো স্পর্শের অযোগ্য। ঐ বদ্ধ জল খেয়ে হল কলেরা,—তার জল গ্রহণের অযোগ্য। আমাদের ধর্ম ও সমাজ সেই রকম। নতুন চিন্তা নেই, সেই প্রাচীন ঋষিরা হাজার হাজার বছর আগে যা বলে গেছেন তার বহু পরিবর্তন হয়েছে—তাঁদের সেই নদীর খাতে জগতের নতুন চিন্তার স্রোত বয়ে আন্‌তে হবে। তারা বারংবার পথ বাৎলে দিচ্ছে, আর আমরা মরবার পথ খুঁজে ফিরছি। জগতের সঙ্গে মিল্‌তে হবে—গতির সঙ্গে—মানুষের নতুন চিন্তার স্রোতে চল্‌তে হবে।

বিশ্বকবির মুখ থেকে বাংলার কোন্ এক প্রান্তের চাষী ও জনসাধারণ কবির অনন্যসাধারণ ভাষায় কবিজনোচিত ভঙ্গীতে এই বাণী শুনলো। অত বড় বিশাল জনতা স্তব্ধ হয়ে এই বাণী শুন্‌লো—এই বাণী যাঁর কণ্ঠনিসৃত হল, তাঁকেও শেষবারের মত প্রাণ ভরে দেখে নিলো। কবিও খুব আনন্দ পেয়েছিলেন।

সেইবারেই আমি এক অভূতপূর্ব দৃশ্য দেখেছিলাম—সে দৃশ্য জীবনে ভুল্‌তে পারবো না। কবির শিলাইদহ ত্যাগের কয়েকদিন আগে অতি প্রত্যূষে আমাকে কবিকে একটি বিশেষ জরুরী বিষয় জানাবার ছিল।

আমি জানি, কবি ব্রাহ্মমুহূর্তে জেগে উপাসনা করেন। তাই আমি রাত্রি প্রভাতের বহুপূর্বে উঠে নির্জন কুঠীবাড়ির তেতালার ঘরে সিঁড়ি দিয়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লুম্। তখনও সারা জগৎ নিদ্রামগ্ন। কবির শয়নকক্ষ শূন্য. স্নানের ঘরের দরজা খোলা, বাহিরে খোলা ছাদে বেরুবার দরজাও খোলা। সাহস সঞ্চয় করে খোলা ছাদে গুনগুন গানের শব্দে এগিয়ে দেখি জ্যোতির্ময় মূর্তি। খালি গায়ে একটি পাজামামাত্র পরিহিত কবি পায়চারি করছেন, হাত দুখানা বুকের উপর,—উপরে অন্ধকার নীল আকাশ, তেতলার ছাদে পদ্মার উদার হাওয়ায় মাথার চুলগুলি উড়ছে। তখনো সূর্যোদয় হয়নি, পূর্বদিগন্তে একটা জবাকুসুম সঙ্কাশ আভামাত্র,—আর সেই সূর্যোদয়কে আহবান জানাচ্ছেন—দীপ্ত কাঞ্চনবর্ণ সূর্যতুল্য ঋষি! মনে হল—

"ভেঙেছে দুয়ার এসেছ জ্যোতির্ময়!"

"জীবনে আজো যাহা রয়েছে পিছে,
জানি হে জানি তাও হয়নি মিছে।
আমার অনাগত আমার অনাহত
তোমার বীণাতারে বাজিছে তারা,
জানি হে জানি তাও হয়নি হারা॥"

* * * *

এদ্দিন ধরে রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে যা সব পড়ে আসছিলাম. পড়ার পর মনে হয়েছে, এক বিরাট পুরুষ দাঁড়িয়ে আছেন; তাঁর তুষারধবল কেশগুচ্ছ সাদা মেঘের সঙ্গে একীভূত হয়ে গেছে, আর আমরা দূরে, অনেক দূরে থেকে কোয়াশার ভেতর দিয়ে তাঁর অস্পষ্ট উজ্জ্বল মূর্তি দেখ্‌ছি মুগ্ধ হয়ে। * * * আমাদের দেশের যতো মহাপুরুষের জীবনী বেরিয়েছে. অধিকাংশ লেখকগণ মহত্ব দেখাতে দেখাতে এমন এক জায়গায় তাঁদের দাঁড় করান, যেখান থেকে তাঁদের আর নাগাল পাওয়া যায় না। অবশ্য মহানরা সাধারণের নাগালের বাইরে। কিন্তু তৎসত্ত্বেও এমন অনেক ক্ষেত্র আছে যেখানে অসাধারণ সাধারণের সমান হয়েও বৈশিষ্টমণ্ডিত থাকেন। বড় বড় জীবনের এই দিকটার খবর বড় কেউ দিতে চান না। শচীনবাবু রবীন্দ্রনাথের সেই সহজ সাধারণ দিকটার খবর দিয়েছেন। আর তা যে পাঠকবর্গের অত্যন্ত ভালো লেগেছে, এই বই দুখানির পরের পর সংস্করণগুলিই তার সাক্ষ্য দিচ্ছে। * * * কবির কল্পনাময় কাব্যজীবনের সঙ্গে এদের হয়তো কোন যোগ নেই; কিন্তু কবির ব্যক্তিগত ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে এরা জড়িত। এদের বাদ দিয়ে কাব্য আলোচনা চল্‌বে, কিন্তু কবিকে বুঝতে গেলে এরা অপরিহার্য। তাই বাংলা সাহিত্যের এক কোণে বনমালী, ফটিক ফরাস প্রভৃতিকে থাক্‌তে দেখ্‌লে নেহাৎ বেমানান্ ঠেকবে না।

নানাজনের নানারসের গল্পেভরা বই কখানি শিশুদেরও মনোমুগ্ধকর. এ আমি প্রত্যক্ষ দেখেছি। কোন উৎসবের পরদিন বা বড় ছুটির আগের দুদিন আশ্রমে ছোট ছেলেমেয়েদের ক্লাস নেওয়া একটু কষ্টকর হয়ে উঠে। তারা পড়তে নারাজ, মন তাদের চঞ্চল থাকে। কাজেই পাঠ্যপুস্তক সরিয়ে রেখে অন্য কোন গল্প ক্লাসে পড়তে হয়। অনেকসময় তাও ঠিক জমে না। এ ক্ষেত্রে কয়েকবার আমি "সহজমানুষ রবীন্দ্রনাথ" আর "পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ" থেকে গল্প শুনিয়েছি, ফল হয়েছে—"দস্যি ছেলে গল্প শুনে একেবারে চুপ!" * * * গুরুদেবের দীর্ঘ আশী বছরের জীবনে কত কথা, কত ঘটনা নানাস্থলে ও নানাজনমুখে বর্তমান, অথচ কাগজেকলমে সেগুলি ওঠেনি। তাদের অক্ষররূপ শচীনবাবুই দিয়ে আস্‌ছেন। অনেক দুষ্প্রাপ্য ছবিও আমরা তাঁর দৌলতেই দেখ্‌তে পাচ্ছি। তিনি এজন্য বাঙালী রসিক বিশেষত রবীন্দ্রনাথের অনুগতদের ধন্যবাদার্হ।

শ্রীনিতাইবিনোদ গোস্বামী,
অধ্যাপক, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন।

ছাপাখানার তাড়াতাড়িতে কতকগুলি ভুলের জন্য লজ্জিত।
নীচে অশুদ্ধি সংশোধন দেওয়া হল।

পৃষ্ঠা	লাইন	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৬	২	পৃষ্ঠ	পৃষ্ট
৭	৫	ভাষ্বর	ভাস্বর
৯	৭	চিত্ততে	চিত্তকে
১০	৫	পাশ্ববর্তী	পার্শ্ববর্তী
১০	১৩	স্রোতস্তীর	স্রোতস্বতীর
১০	১৮	গিলাইদহ	শিলাইদহ
২২	৩০	তদের	তাদের
২৪	৯	গনা	না
২৫	৩২	গোপীনাথে	গোপীনাথের
২৬	১৯	কুঠীবগাড়ী	কুঠীবাড়ির
৪০	১৭	সন্ত্বনা	সান্ত্বনা
৪৯	৩	নিযক্ত	নিযুক্ত
৫৬	২৭	চেধুরী	চৌধুরী
৭৫	২২	মনোবেদনর	মনোবেদনার
৭৯	১৩	অ'সে	বসে
৭৯	৩১	ভালবাসনে	ভালবাসতেন
৮৭	২৫	Border	Boarder
৯১	২২	অংশিদার	অংশীদার
৯২	২৬	বেটের	বোটের
৯২	২৯	দুঃর্ভিক্ষ	দুর্ভিক্ষ
৯৬	৬	সুসজ্জি	সুসজ্জিত
১০৬	২৬	বাদ যাবে, দুবার ছাপা হয়েছে লাইনটা। যোগ হবে—করলেন ও সে তার আসল দুঃখটা প্রকাশ করল,	
১০৯	৯	অপর্ব	অপূর্ব
১১৬	১৩	এযিকে	এদিকে
১২৬	২৫	খোরসেদুর	খোরসেদপুর
১২৭	১৫	মহম্মসাহী	মহম্মদসাহী
১২৮	২	প্রাতিঠিত	প্রাতিষ্ঠিত
১৩০	২৯	কতে	করতে
১৩৫	৮	শিষেরা	শিষ্যেরা
১৩৫	১১	খেরসেদপুর	খোরসেদপুর
১৪৩	২২	এরন	এমন